ISSN 2229-7537

THE PRISM

A Peer-Reviewed Journal

Vol. 11 May, 2019

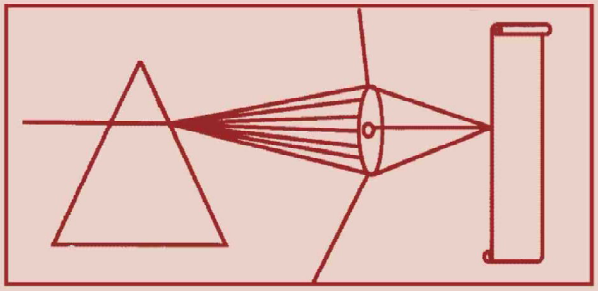

Annual Bilingual Journal

of

Mahatma Gandhi College

Lalpur, Purulia, West Bengal

THE PRISM

ISSN 2229-7537

A Peer-Reviewed Journal

Volume 11 May, 2019

Annual Bilingual (English & Bengali) Journal
of

Mahatma Gandhi College

Lalpur, Purulia

THE PRISM

Vol. 11 May, 2019

Journal of Mahatma Gandhi College
Lalpur, Daldali, Purulia- 723 130
West Bengal, India
Contact : + 91 94342 46198
E-mail : prismmgc@gmail.com

Editors

Sri Thakurdas Mahato Assistant Professor in Bengali
Smt. Soma Lohar Assistant Professor in English
Dr. Sibani De Associate Professor in History
Dr. Bipul Chandra Bepari Assistant Professor in Sanskrit
Dr. Kalyan Senapati Assistant Professor in Chemistry

Cover Design : Proff. Rahul Chakrabarti

Publisher : Teachers' Council
Mahatma Gandhi College, Lalpur, Purulia

Printed at : Kabitika, Midnapore. Mob : +91 98321 30048

Price : 250.00 $ 12

Editorial

On the eve of the eleventh edition of our 'The Prism' coming into being the Editorial Board seeks the opportunity to thank all concerned, especially our Peer Reviewers for the Onus they have taken to review the articles. It is also the occasion to thank all subscribers from outside our institution who have entrusted us with the task of scattering their thoughts to wherever interests would coincide. All of us, after all in this respect, are like the poor soul in Rusdie's 'Outside the whale' who came out of the whales mouth to save his life and faced a dire need to be heard and rescured. Even if we dissociate ourselves from the post colonial implicattions of this metaphorical crisis, we still encounter or urge to be heard. The more wide our eyes are, the more efforts we render to understand things, the more intence our desire is to communicate with one another, the more is the urge. We are really happy to find scholars waiting avidly for the publication of our journal, and a flurry of articles pouring into the inbox of our email id.

We feel happy to feel that our venture has so far out done all concominant troubles to evade an untimelu disiccation and sustained its flow.

We find it the right occasion to thank the college authority for its persistant support towards the college journal. We hope that we shall continue to have this patronage in future.

Thank you all
Members of Editorial Board

May, 2019
Mahatma Gandhi College, Purulia

THE PRISM
Vol. 11 May, 2019

Our Contributors

অনিমেষ ব্যানার্জী	গবেষক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কান্‌হো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
উদয় সরদার	গবেষক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কান্‌হো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রভাত দাস	সহকারী শিক্ষক, ন্যাশনাল এন্ট্রান্স হাইস্কুল, ডোমকল, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ।
ড. ধ্রুবজ্যোতি পাল	অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া।
ড. মিলনকান্তি সৎপথী	সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া।
শুদ্ধসত্ত্ব বর্মণ	সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়।
ড. রামশঙ্কর প্রধান	সহকারী অধ্যাপক, রামানন্দ সেন্টিনারী কলেজ, পুরুলিয়া।
ড. নিবেদিতা দিন্দা	(অংশকালীন শিক্ষিকা) রঘুনাথপুর কলেজ, বাংলা বিভাগ।
সন্দীপ গরাই	সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষক, বাংলা বিভাগ।
ড. বিপুল চন্দ্র বেপারী	অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, মহাত্মা গান্ধী কলেজ, লালপুর, পুরুলিয়া।
শ্রী রঞ্জন মাহাত	সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়।
ড. মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল	সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রঘুনাথপুর কলেজ।

Smritikana Tewari	Assistant Professor, Nistarini College, Purulia.
Dr. Malay Kumar Ghosh	Assistant Professor, Department of Commerce, Sidho-Kanho-Birsha University, Purulia.
KoushikTalukdar	Lecturer, Nazrul Centenary Polytechnic, Rupnarayanpur, W.B.
Dr. Malay Kumar Ghosh	Assistant Professor, Department of Commerce, Sidho-Kanho-Birsha University, Purulia.
Amir Hossain Khan	Assistant Professor in English, Balarampur College, Purulia, W.B.
Srirupa Mahalanabis	Assistant Professor, Department of English, Barabazar B.T.M. College.
Susmita De	Studied B.Ed at Ramkrishna Mahato Memorial Teachers' Training College, Chashroad, Purulia.
Soma Rani Karan	Haldia Government College, Haldia.
Partha Pratim Roy	Assistant Professor in Economics, Mahatma Gandhi College.
Bapi Mondal	Assistant Professor, Department of Philosophy. Mahatma Gandhi College. Lalpur. Purulia.
Susanta Mallick	Department of Zoology, Mahatma Gandhi College, Purulia.
Asif Hossain	Department of Zoology, Sidho -Kanho -Birsha University, Purulia.

THE PRISM

ISSN 2229-7537

A Peer-Reviewed Journal

Volume 11 May, 2019

Contents

হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতা : উৎসের অভিমুখে	মিলনকান্তি সৎপথী	13
সৈকত রক্ষিতের 'সিঁদুরে কাজলে' : প্রেমানলে আত্মাহুতি দেওয়া এক দুঃসাহসিনী নারীর ইতিবৃত্ত	অনিমেষ ব্যানার্জী	26
ঔপন্যাসিক বাণী বসু : সাম্প্রতিক বাংলা কথা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল প্রতিভা	শুদ্ধসত্ত্ব বর্মণ	34
ভারতীয় নবজাগরণের প্রাণপুরুষ বিদ্যাসাগর ২০০তম জন্মবর্ষে— ফিরে দেখা	ড. রামশঙ্কর প্রধান	42
ইতিহাসের ছায়ায় সাহিত্যের কায়া	ড. নিবেদিতা দিন্দা	51
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প : মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্য বিত্তের আত্মদর্পণ	উদয় সরদার	61
নকশাল আন্দোলনের বর্ণমালা : প্রসঙ্গ জয়া মিত্রের ছোটগল্প	সন্দীপ গরাই	69
সাময়িক পত্রে ব্রিটিশ বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক : (১৯০০-১৯৪৭)	প্রভাত দাস	76

মিথ ও পুরাণের আলোকে ভদ্রার্জুন	ধ্রুবজ্যোতি পাল	92
নারীর অধিকার ও বৈদিক সাহিত্য	ড. বিপুল চন্দ্র বেপারী	104
স্মৃতিগ্রন্থে নারীদের সামাজিক অবস্থান	শ্রী রঞ্জন মাহাত	111
পবিত্র প্রেমের অনুসন্ধানে কালিদাসের রচনাক্রম	ড. মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল	117
Birds in Aśokan Pillār Edicts	Smritikana Tewari	127
Twist Ending in O'Henry's Stories (selected) : An Exploration into Aesthetic and Technical Implications	Subham Mallick	136
Train to Pakistan : An Indo-Anglian partition novel	Amir Hossain Khan	150
Fissures in 'Masculinized' memory: British Women in the First World War	Srirupa Mahalanabis	159
Tussle against Stereotype Gender Role: Women in Salman Rushdie's Midnight's Children	Susmita De	164
Sport and Globalization	Soma Rani Karan	172
Disaster Management in India: An Insight Look	Dr. Malay Kumar Ghosh	178
Patterns Of Government Expenditure On Education In West Bengal	Partha Pratim Roy	190

Corporate Social Responsibility in India : A Review	Dr. Malay Kumar Ghosh & Koushik Talukdar	205
The notion of Duty: a critical study in the Vyasa Gita	Bapi Mondal	214
Homing Activity And Roosting Ecology Of The Bats Pteropus Giganteus (Brunnich, 1782) At Purulia And Paschim Medinipur District	Susanta Mallick, Asif Hossain	219

হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতা : উৎসের অভিমুখে

মিলনকান্তি সৎপথী

কবি, প্রাবন্ধিক, ছোটগল্পকার, সংকলক-সম্পাদক, সংগঠক, অধ্যাপক, অনুবাদক, মুক্তিযুদ্ধের ১৬ খন্ডের দলিল প্রকল্পের পরিচালক, সংবাদ পত্রের কর্মী-কলমচীসহ বিবিধ বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩১-১৯৮৩) নামটি। সমস্ত কিছু ছাপিয়ে তাঁর কবিসত্তা। প্রতিক্রিয়াশীলতার বাইরে প্রগতিশীল চিন্তাচেতনা— যার সঙ্গে সমকাল ও জাতিসত্তার স্বপ্নের অপূর্ব সমন্বয়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, 'শেষ মুহূর্তে-১৩৫৫' কবিতা, পরে নলিনী কিশোর গুহ সম্পাদিত 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় 'সোনার বাংলা' কবিতা। ১৯৪৯ থেকে মৃত্যুর কিছু মুহূর্ত পূর্বে (১ এপ্রিল ১৯৮৩, মৃত্যু) পর্যন্ত হাসান এক সৃষ্টিশীল কবি চৈতন্যের বাহক ও ধারক।

১৯৪৯ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতালাভ (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) এই সময়সীমায় তাঁর তিনটি কাব্য ('বিমুখ প্রান্তর'-জুলাই ১৯৬৩, 'আর্ত শব্দাবলী'-সেপ্টেম্বর ১৯৬৮, 'অন্তিম শরের মতো' জুলাই ১৯৬৮) প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ পরবর্তী পর্যায়ে পাঁচটি কাব্য ('যখন উদ্যত সঙ্গিন'-অক্টোবর ১৯৭২, 'বজ্রে চেরা আঁধার আমার'-ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬, 'শোকার্ত তরবারি'-ফেব্রুয়ারি ১৯৮২, 'আমার ভেতরের বাঘ'-জানুয়ারি ১৯৮৩, 'ভবিতব্যের বাণিজ্যতরী'-ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩) প্রকাশিত হয়। তাঁর অপ্রকাশিত কবিতা বইঘর ঢাকা থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর দীর্ঘ ভূমিকা লেখেন কবি শামসুর রাহমান। আশরাফ সিদ্দিকী ও আবদুর রশীদ খান সম্পাদিত 'নতুন কবিতা' (ঢাকা ১৯৫০) সংকলনে যে ১৩জন কবির কবিতা ছাপা হয়— সেখানে হাসানের তিনটি কবিতা 'ক্লান্তির কবিতা', 'শামসুর রাহমানকে অনুসরণ', 'মীমাংসিত'—সংকলিত হয়। এই সংকলনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে আবু হেনা মোস্তাফা কামালের বক্তব্য, "তেরো জন কবির মধ্যে অন্তত দশজন যথার্থই নতুন— বলা চলে নতুন সমাজের প্রতিনিধি। তাঁদের কবিতার ভাষা, আঙ্গিক অথবা বক্তব্য হয়তো নতুন ছিলো না— কিন্তু যে নতুন আবেগে ঐ সমাজ শিহরিত তার আলোড়ন নতুন কবিতার নবীন কবিদের অপরিণত কবি কর্মেও

আভাসিত।...ফলত এঁরা নতুন সমাজের সম্ভাবনায় যেমন আশাবাদী ছিলেন— তেমনি ছিলেন অতীতের গ্লানিমুক্ত" (কথা ও কবিতা/মুক্তধারা, ঢাকা : ১৯৮১/পৃ. ১২৮)। এই নতুন কবিদের মধ্যে হাসান ছাড়া ছিলেন শামসুর, আলাউদ্দিন-আল আজাদ, বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর প্রমুখ।

হাসানের কবি হয়ে ওঠার প্রাথমিক পর্যায়টিতে পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলা কবিতায় রাজনীতি সচেতনতা, ইসলামী ঐতিহ্যে অনুরাগ, রাবীন্দ্রিক আবহের সঙ্গে চিরায়ত অনুভূতি, চল্লিশের দশকের ঐতিহ্য এবং নিরীক্ষাধর্মীতা গুরুত্ব পেয়েছিল। ১৯৪৭ পরবর্তী পর্যায়ে পূর্ব-পাকিস্তান-এর নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে যে আশাবাদ ও সৃষ্টিশীল চৈতন্যের ব্যাপক উদ্দীপনা— তার প্রতিফলন কবিতার জগৎটিতেও উপলব্ধ হয়। স্বপ্ন -স্বাধীনতায় মিশেছে কবিতার সমাজলগ্নতার শিকড় যা কাল ও ঘটনাবর্ত্মে স্বীয় কাব্যভাবনায় সম্ভাবনাময়-মৌলিক। কবিতার তাত্ত্বিকভিত্তি এবং জাতীয় সাংস্কৃতিক আবহের মধ্যে হাসান হাফিজুরের ভূমিকা ব্যাপক।

হাসান প্রথম থেকেই প্রগতিশীল চৈতন্যের অধিকারী। ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলনে শুধু সক্রিয় অংশগ্রহণ বা 'অমর একুশের'র মতো কবিতাই রচনা করেননি। ব্যক্তিগত খরচে 'একুশে ফেব্রুয়ারি' (জানুয়ারি ১৯৫৩) সংকলন বার করেছেন— উৎসর্গ করেন একুশের অমর শহীদদের উদ্দেশ্যে। নয়া ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাঁর এই প্রয়াস অর্জনের প্রশ্নে প্রতিশ্রুতিময়। মানবিক শাখায় শুধু ডিগ্রী অর্জন নয়— জীবন ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর মানবিক প্রয়াসটিও মহৎ। ৪৫ নাজিমুদ্দিন রোডের ভাড়া বাড়িতেই ঠিকানা ছিল 'নতুন সাহিত্য' প্রকাশনী'র। পঞ্চাশের সাম্প্রতিক দাঙ্গাকে সামনে রেখে দাঙ্গাবিরোধী গল্পসংকলন 'দাঙ্গার পাঁচটি গল্প' প্রকাশ করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' গঠনের ক্ষেত্রে এই মানুষটির ভূমিকা সবাই জানে। এই বছরেই কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন'-এর সাধারণ সম্পাদকের ভূমিকা পালন করেন। 'সংস্কৃতি সংসদ', 'ড্রামা-সার্কেলে'র গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও সামলান। তারই চেষ্টায় ঢাকা থেকে 'সওগাত' প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে অগ্রহায়ণ ১৩৬০ বঙ্গাব্দে। কাজ করেছেন ১৯৫২-তে 'বেগম পত্রিকায়' সহকারী সম্পাদক হিসাবে। একক প্রচেষ্টায় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে 'ফজলুল হক ম্যাগাজিন' বার করেন। ১৩৬৪-ভাদ্র মাসে সিকানদার আবু জাফরের সঙ্গে যৌথভাবে 'সমকাল' প্রকাশ করেন। সময়ের দ্বান্দ্বিকতায় হাসান বিপরীতভাবে যুক্ত হয়েছিলেন মোনায়েম খানের 'পয়গাম', পাকিস্তান সরকারের 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকার সঙ্গে। এবং কুদরতল্লাহ শাহারের 'পাকিস্তান লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। এই সরকারি বা প্রতিক্রিয়াশীলতার সঙ্গে জড়ানো বা 'সীমান্ত শিবির'-এর মতো কাব্য লেখার জন্য পাকিস্তান লেখক সংঘ পুরস্কার (১৯৬৭) প্রাপ্তি— প্রগতিশীল চেতনার বিপরীত অধ্যায়।

১৯৫৮-'৬৮ সময় পর্বটি আইয়ুব খানের কালা দশক, চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীলতার মধ্যে হাসান প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের Friends not Maters অনুবাদে জড়িত থাকলেও পরে ফিরে আসেন চেনা ছকে স্ব-বৃত্তে। যদিও 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসাবে কাজ চালিয়ে গেছেন (১৯৬৫-র ১ জানুয়ারি থেকে ১৯৭১ মুক্তি যুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত)। এই পর্বে ১৯৬৭-র ২৩ জুন সরকার রবীন্দ্রসংগীত প্রচার নিষিদ্ধ করলে ২৫ জুন, ১৯ জুন বুদ্ধিজীবীর স্বাক্ষরিত প্রতিবাদপত্রে হাসানের উজ্জ্বল উপস্থিতি। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে সরকার বর্ণমালা ও বানান সংস্কারের যে প্রকল্প গ্রহণ করে— তার বিরোধিতা করে আফ্রো-এশীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়— সেই অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন সিকানদার আবু জাফর। সমর্থক লেখক সংঘের সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান। নাট্যকার-অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে যৌথভাবে খোলা চিঠিতে প্রতিবাদ জানান। ১৯৬৯-৭০'এর জাতীয় আন্দোলনে তিনি ছিলেন পুরোভাগে। আহ্বায়ক ছিলেন— লেখক সংগ্রাম শিবিরের। সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের দাবিতে এই শিবির ছিল সক্রিয়।

মুক্তিযুদ্ধে ৯ মাস আত্মগোপনে ছিলেন। ১৯৭১-র অক্টোবরের শেষদিকে ঢাকায় আসেন। স্বাধীন দেশে ১৯৭২-র জানুয়ারিতে 'দৈনিক বাংলা ' (পূর্বে 'দৈনিক পাকিস্তান') পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি হলেন। ১৯৭৩-এর ১ জানুয়ারি ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনের প্রতিবাদে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন যে শোভাযাত্রা বার করে— পুলিশের গুলি চালনায় মতিউল ইসলাম, মির্জা কাদেরুল ইসলাম নিহত হলে— হাসান তীব্র প্রতিবাদ জানান। এরই ফলশ্রুতি মস্কোতে প্রেস কাউন্সিলর রূপে নির্বাসন। উনিশ মাস পর স্বদেশে ফিরে আসা (৩০শে এপ্রিল ১৯৭৩ থেকে ১১ ডিসেম্বর ১৯৭৪)। ১৯৭৫ পরবর্তী পর্যায়ে হাসানের উপর দায়িত্ব বর্তায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প (১৯৭৭ জুলাই) প্রধানের। এই কাজ করার সময় ভীষণ অসুস্থতায় ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি মস্কো যান। ফিরেন নি। সেখানে সেন্ট্রাল ক্লিনিক হাসপাতালে ১ এপ্রিল ১৯৮৩ জীবনাবসান ঘটে।

তিন দশকের সাহিত্য জীবনে তিনি সম্মানিত হয়েছেন— 'পাকিস্তান লেখক সংঘ জাতীয় পুরস্কার' (১৯৬৭), 'আদমজী পুরস্কার' (১৯৬৮), বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৭১), 'সুফী মোতাহার হোসেন স্মৃতি পুরস্কার' (১৯৭৬) 'অলক্ত সাহিত্য' পুরস্কার (১৯৮১), 'নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক' (১৯৮২) ইত্যাদি পুরস্কারে। প্রকাশিত অগ্রন্থিত অনূদিত কবিতা সংখ্যা ২৭৬টি। যে কাল পর্বে হাসানের হয়ে ওঠা— সেখানে এক স্বাধীনতা থেকে আরেক স্বাধীনতার লড়াই এবং স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্র বনাম একনায়কী পরিমন্ডল—

যা তাঁর মতো সংবেদনশীল— প্রগতিপন্থী বুদ্ধিজীবীর পক্ষে কতটা কঠিন তা কবিতার পাতা ওল্টালেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মার্কস, এঙ্গেলস রচনাসহ বামপন্থী গ্রন্থপাঠ— 'লুই আরাগঁ, পল এলুয়ার, পাবলো নেরুদা, নাজিম হিকমত— এঁদের কবিতা পড়তাম।' (হাসান হাফিজুর রহমান: প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী/কাব্য সমগ্র হাসান হাফিজুর রহমান/পৃ. ৩৭১)— এই স্বীকারোক্তি থেকে বোঝা যায়, প্রগতিশীল চিন্তাচেতনার সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ ছিল। ১৯৫১-হাসান কমিউনিস্ট সংস্পর্শে আসেন। কবি শামসুর রাহমান এ প্রসঙ্গে জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আড্ডামুখর মধুর রেস্তোরাঁতে— 'আমাদের আড্ডার প্রধান বিষয় ছিলো সাহিত্য, ইতিহাস, এবং রাজনীতি। ...হাসান রাজনীতি সম্পর্কে কথা বলতে পছন্দ করতেন।' —ভাষান্দোলনে তাঁর কর্মকান্ড ভিন্ন পথ নেয়। কিন্তু মার্কসীয় তত্ত্ব চিন্তার সদর্থক একটি দিক হাসানের চিন্তা চেতনার গভীরভাবে প্রোথিত ছিল— যদিও তা চল্লিশের পশ্চিমবঙ্গীয় বাংলা কবিতার মতো প্রত্যক্ষ নয় বা যে সাম্যবাদী চিন্তাচেতনার উজ্জ্বল স্রোত উক্ত দশকের বাংলা কবিতার গতিপথে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছিল— হাসান যে পথের যাত্রী ছিলেন না। যদিও তাঁকে বলতে শুনি— 'যদিও শেষ পর্যন্ত সামাজিক অসন্তোষ, অনাচার বিক্ষোভ এ সকল বিষয়ই আমার কবিতায় প্রাধান্য পেলো, নজরুলের মতো'। নজরুলের সঙ্গে তিনি যেভাবে নিজেকে মেলাতে চেয়েছেন তা কবিতার প্রকরণ বা স্বরগ্রামের দিক থেকে নয় বিষয় নির্বাচনের দিক থেকে। উভয় কবিই সামাজিক ও রাষ্ট্রিক শোষণের বিরুদ্ধে মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে সোচ্চার ছিলেন। উত্তরণ বা বিপ্লবের প্রশ্নে উভয়ের দেশ কালের চৌহদ্দিগত অবস্থান এক ছিল না। ১৯৪৭ স্বাধীনতা পরবর্তী বাঙালি জাতির সমস্যা স্বপ্ন ও উত্তরণের কথা হাসানের কবিতার বেদীমূল নির্মাণ করেছে। বহু প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা (১৯৪৭) দেশভাগ সামাজিক বা রাষ্ট্রিক মুক্তির প্রকৃত পথ দেখায়নি, এ যেন শোষণের স্তরান্তর নয়া উপনিবেশিকতার যাপন কথা। বিনষ্টির মধ্যে ব্যক্তি মুক্তির সংকল্পের প্রশ্ন অবান্তর। তার উপরে উঠে এল ভাষা সংস্কৃতির উপর নয়া-অধ্যাদেশ— যা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা-বিমুখ প্রান্তরকে হলুদ বসন্তে ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতিই শোনা যায় হাসানের কবিকণ্ঠে— 'আটকাপড়া জিনিসের মুক্তি চেয়েছি আমার কাব্যে। Waste Land -এ Decadence বা অবক্ষয়ের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে, বিমুখ প্রান্তরে উত্তরণের কথা। এলিয়টের প্রস্থান ধর্মের দিকে, আমাদের গন্তব্য বাস্তবতার দিকে' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ/পৃ. ৩৭১)। এই বাস্তবতার দিক থেকেই হাসানে 'ব্যক্তি ও কালের মাত্রা— একীভূত হয়ে যৌথশিল্প মাত্রায় রূপলাভ করে'—বলে মনে করেন রফিকউল্লাহখান (হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতা প্রসঙ্গে/পূর্বোক্ত/পৃ. ৬)।

১৯৫০-'৬৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লেখা কবিতা গুলি 'বিমুখ প্রান্তর', 'অন্তিম শরের মতো',

'আর্ত শব্দাবলী' কাব্যে স্থান পেয়েছে। উক্ত সময়পর্বে শুধু হাসান হাফিজুর নন, সত্তা যেন সংলগ্ন সময় ও সমাজের সঙ্গে গভীরভাবে অন্বিত। ব্যক্তি বা কবি কামনা আকাঙ্ক্ষা— এই পর্বে যেন একই পঙ্‌ক্তিতে। সমষ্টির সঙ্গে মিলিয়েই স্বদেশ এই ভাবনারই প্রতিফলন হাসানের কবিতা। সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং কবির দায়বদ্ধতার প্রশ্নে এই পর্বে হাসান পরীক্ষিত। সংশয়ে, আশাবাদে, প্রগতি ও প্রতিবাদে হাসান পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর সঙ্গে অন্তর্জীবনের যে সব দৃশ্য ও কথামালার নির্মাণ করেন— তার মূলে একান্তভাবেই সমকাল— ঐতিহ্য ও স্বদেশ। ব্যঙ্গের সূক্ষতায় কবি দেখিয়েছেন—

"আমরা সবাই
রাজা
আমাদেরই রাজার রাজত্বে।" (বিমুখ প্রান্তর)

আত্মজিজ্ঞাসায় বিদ্রূপে তিনি যেন আমাদের নিহিত প্রতিবাদ ফিরিয়ে দিতে চান—

"স্বনাম ভুলেছি আমি
কৌতূকের পাশব খেলায়
জন্ম মৃত্যু ঘুঁটি চালি
নিতান্ত হেলায়
দিন যাপনের কালে প্রাণ ধারণের দেশে
বেলা বয়ে যায়।"

যে দেশ কোলাহলে মগ্ন, কান্নার মূলে যেখানে ক্লেদ, বিস্মরণে আত্মনাম— ঠিক সেখানেই হাসান স্বপ্ন দেখান— 'লাল তুকে সবুজাভ ক্ষীণতরু/হলুদ বসন্ত', বর্গিছোঁয়া খামারের মন্ত্র শোনাতে চান— যেখানে 'দ্রৌপদীর শাড়ির মতন আয়ু'—নিয়ে আর সময়ের দাঁতে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যায় মুক্তি খুঁজতে হবে না। জীবনের অগস্ত্য যাত্রা নয়— 'নূহের কাসেদ কবুতরের মতো'— দুহাতে আকাশ ডাকাই নয়— চোখের কোণে সেই ছবি এই কবি জাগাতে চান— অন্ধকারের বন্যা পেরিয়ে দ্বীপের মিনার। মানবের ইপ্সিত অভিযান হয়ে উঠুক সেদিকেই। যে দেশ 'দর্পিত দর্পণ যেন স্বদেশ আমার' বলে মনে হয় যেখানে জঠরের ঋণমুক্ত করার জন্য বিরোধী স্বপ্নের অবসানে, কুহকমন্দ্রের জাল ছিন্ন করে এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগুতে হবে—

'হৃত যৌবন অস্থির এই দগ্ধ দিনে
উদ্গত এই মৃত্যুকে হেনে
শেষ প্রহরেও আমরা আছি।' (আমরা উৎস)

'বিমুখ প্রান্তর'—কাব্যের 'অমর একুশে' কবিতাটি লেখা হয় ১৯৫২-র মার্চে। জুন মাসে কুমিল্লা সাহিত্য সম্মেলনে এটি তিনি প্রথম পাঠ করেন। 'একুশে ফেব্রুয়ারি' সংকলনে এটি প্রথম ছাপা হয়। কবিতাটি সম্পর্কে হাসানের নিজস্ব বক্তব্য : "কবিতাটি রচনাকরি স্বাবাবিক প্রেরণায়। তখন সবারই আবেগ ছিলো। ভাষা আন্দোলনে তো ছিল Public Sentiment-এর ব্যাপার তার সাথে ব্যক্তিগত অনুভূতির সংযুক্তির ফলশ্রুতিই হলো 'অমর একুশে'। মূলত দেশজ অনুভূতি সেখানে যুক্ত হলো ব্যক্তির Commitment." (কাব্য সমগ্র, হাসান হাফিজুর রহমান/পৃ. ৩৭৩)। অনেকেরই মতে, কবিতাটি হাসানের কবিমানসের বীজ কবিতা, বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। এই কবিতাটি সময়-স্মৃতি-অতৃপ্তি-যন্ত্রণা প্রতিবাদ, মানসিক অন্বেষণ ঐতিহ্যকে ধারণ করেছে প্রবলভাবে। বায়ান্নর শহিদদের সামনে রেখে আমাদের অন্তর্লীন চৈতন্যের প্রদীপ্ত রূপটিকে খুঁজছেন :

'সালাম, রফিকউদ্দিন, জব্বার কী বিষণ্ণ থোকা-থোকা নাম,
এই একসারি নাম বর্শার তীক্ষ্ণ ফলার মতো এখন হৃদয়কে হানে :

—এই ভাষাশহিদের মধ্যেই কবি খুঁজছেন যূথবদ্ধ মনুষ্যত্বের দীক্ষা।

'বুদ্ধ আর মোহম্মদের দৃষ্টির মতো দীপ্ত'—এই নাম গুলিকে শত্রু শয়তানেরা ছিনিয়ে নিয়ে গেলেও পারেনি তাদের সঞ্চালিত আবেগ প্রাণশক্তিকে। এই প্রতিজ্ঞা কঠিন শপথ থেকে সম্মিলিতের গান জেগে ওঠে—

'আর আমরা সেই অমর শহীদদের জন্যে
তাঁদের প্রিয় মুখের ভাষা বাংলার জন্যে একচাপ পাথরের
মতো এক হয়ে গেছি,
হিমালয়ের মতো অভেদ্য বিশাল হয়ে গেছি।'

ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুক্ত দেশের মধ্যে অধরা স্বপ্ন, পায়ে সেই পরাধীনতার শিকল বেজে ওঠা সামরিক শাসন, অসাংবিধানিক গণতন্ত্র, ভাষা কৃষ্টির উপর নির্মম অত্যাচার—সব মিলিয়ে কবির মনে হয়েছে— 'এখানে আমরা ফ্যারাউনের আয়ুর শেষ কটি বছরের ঔদ্ধত্যের মুখোমুখি',—এরই জন্য দ্বৈরথ, দ্বন্দ্বের সীমান্তে পৌঁছানো 'আর তুমি কি চাও'—তার সদর্থক উত্তর খোঁজার বিরামহীন আততি। কৃষি পলিসিক্ত দেশের আদিগন্ত সবুজ শিখার উজ্জ্বল ছবিকে সংগোপনে কবি সঞ্জীবিত করেন—

'কী আশ্চর্য প্রাণ ছাড়িয়েছো— একটি দিন আগেও তো বুঝতে পারিনি,
কী আশ্চর্য দীপ্তিতে তোমার কোটি সন্তানের প্রবাহে প্রবাহে
সংক্রমিত হয়েছে—

একটি দিন আগেও তো বুঝতে পারিনি, দেশ আমার।'

—খোন্দকার আশরাফ হোসেন হাসানের এই কবিতাটির সঙ্গে ইয়েটসের বিখ্যাত কবিতা Easter 1916-র একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। ব্রিটিশ গুলিতে নিহত ইস্টার উত্থানের জাতীয়তাবাদী আইরিশ বিপ্লবীদের অনেকে নিহত বা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করার বিষয় উক্ত কবিতায় রয়েছে—

''I write it out in verse
Mac donough and Mac Bride
And Connolly and Pearse
Now and in time to be
Wherever green is worn
Are changed Changed utterly :
A terrible beauty is born.''

(তথ্য : অয়নান্তের আয়না/কবিতার অন্তর্যামী আধুনিক উত্তর আধুনিক ও অন্যান্য প্রসঙ্গ/ পৃ.৬১) শহিদ স্মরণে হাসান বাংলাদেশের বীজটিকেই এই কবিতায় যেভাবে ধারণ করলেন তা সম-সময়ের নিরিখে দু:সাহস বলা যায়। সোনালি হরিণের স্বপ্ন নিয়েই এই কবি এগিয়েছেন।

'যা দিয়েছো একদিন ফেরাবে কী করে' '(তোমাকে ছাড়াও)'—এই প্রশ্নেই হাসান উত্তরণ খোঁজেন—

'তোমারই বিলানো যে জীবন
মুহূর্ত মুহূর্তে অনন্ত করে তা রাখি।'

এই অনন্তের জন্য সূর্যের সমান সাহসী দু'বাহুর বিস্তার। যেখানে ব্যক্তি নীলকণ্ঠরূপ ধারণেও পিছপা হয় না—

'হৃদয়মন্থনে তুলি হলাহল, আর
বলি নীলকণ্ঠ নিজ নাম।' (নীলকণ্ঠ)

ক্ষয়-ধস-নৈরাশ্যের মাঝেই হাসান বিমুখ প্রান্তরে ফিরে যান উৎসের অভিমুখে—

'মরা মাঠে আবাদের গান ধরি আর্তকণ্ঠে
কম্পিত হৃদয়ে বাজে ঈশ্বরের নাম' (দ্বেষ নয়, যেন সুখ ম্রিয়মান ক্রোধ)

হাসান হাফিজুর জানতেন— 'দু:শাসনের দৃষ্টির তলে'—'গা এলানো শামুকের মতো',

নরম হৃদয় নিয়ে দিন চালানো যায় না। নিরঙ্কুশ স্বাধিকার ও অবারিত সম্মানে ফেরবার— জন্য চাই হাজার বছরের ঐতিহ্য আর ক্লান্তি। সৌন্দর্যে, আশ্বাসে, প্রত্যাশায় যে সমাজ আস্থাহীন তার মূলে—

'হিংসা, যুদ্ধ
লোলুপ থাবার কাড়াকাড়ি, কোলাহল'—

মেষতান্ত্রিক জীবন নয়, হৃদয়ে রক্তিম ফুল ফোটাতে হবে। স্বদেশের পাকা ভিতে, মৌলিক মাটিতে কবি জীবনের মূল প্রতিষ্ঠা করতে চান। আত্মোৎসর্গে শোনাতে চান প্রাণের গান—

'দেবো তোমাকেই শ্রাবণের গান, অকাতর
বৈশাখ অঘ্রাণ, ফেরাবোই ঋতুকে স্বরূপে। মৃত্তিকার আপ্তধ্বনি
বাৎসল্যের, গুরুগুর আলাপনী ফেরাবোই, বিশ্বাসের বাজনা বাজাবো
তোমার ঐ বাহুতেই! দেবো এই হৃদয় রক্তিম ফুল তোমাকেই!'
(রক্তিম ফুল/বিমুখ প্রান্তর)

'আধুনিক কবি ও কবিতা' প্রবন্ধে হাসানের এই বিশ্বাস ধরা পড়ে 'কল্পনা ও বাস্তবতার মধ্যে সার্থকতম সমন্বয় কবিতার পক্ষে করা যেমন সম্ভব, অন্য মাধ্যমের পক্ষে সম্ভব নয়'—তাঁর কবিতায় সমাজ বিবর্তনের প্রশ্নে এই উক্তির সার্থকতা রয়েছে।

'আধুনিক কবি ও কবিতা' (১৯৬৫) প্রবন্ধ গ্রন্থে হাসানের কাব্যচিন্তার বিভিন্ন দিক উঠে এলেও তিনি মূলত এই ভাবনায় বিশ্বাসী ছিলেন— 'সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে সাহিত্যের প্রাণের সামান্যতমও যোগ নেই', (৮ সংখ্যক প্রবন্ধ 'পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য পটভূমি, স্বাতন্ত্র্যের উৎস') বা চতুর্থ প্রবন্ধে যা বলেছেন— 'আন্তর্জাতিক আদর্শে আমাদের কাব্যের মুক্তি নেই। আমাদের কাব্যকে বাঁচাতে হলে প্রথমে জাতীয় হতে হবে' (সাম্প্রতিক কবিতা : কতিপয় প্রবণতা ও সংকট)। তাই কবিতার চিরায়ত উপলব্ধির স্তর থেকে বা রোমান্টিকতার খোলসে নিহিত দীপ্ত অস্তিত্বের অন্বেষণ থেকেই কবিতার মাত্রা উপলব্ধি করতে হবে। 'আর্তশব্দাবলী' এবং 'অন্তিম শরের মতো' কাব্যে কবির এই উপলব্ধি বিচিত্রভাবেই বিধৃত হয়। সামরিক শাসনের মধ্যে জীবনের সর্বকৌণিক নঞর্থকতা এই কাব্য দুটিতে উঠে আসে। মনে হয়, হাসান যে আশাবাদ বহনে প্রতিশ্রুত— তা যেন দুর্বহ হয়ে উঠছে। 'জীবনের ঘন্টারোলে'—কবিতায় গভীর বিপন্নতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবি উচ্চারণ করেন সমকালের বৈরী প্রতিবেশের কথা :

'শুধু ত্রাসের গহ্বরে দেখি ডুবে গেছে

গাছ পালা-আকাশ নদী শিশু
শৈশবে কৈশোর যৌবন'
(পরাধীন ব্যক্তিসত্তায়)

বিম্বিত হয়ে ওঠে স্বদেশ-সমকাল। তাই কালের কংকালসার ছবি কখনো ধ্বংস বা অশুভ চিত্রে কখনো বা পুরাণ প্রকল্পে সবাক হয়ে ওঠে :

'নিদ্রা নেই আমার
রাত্রি বাদুড়ের বিরামহীন পাখার নির্দয় কালো ঝাপটানো যেন,
দিন এ্যাটমের ঝলসানো প্রতিচ্ছায়া' (ঐ)

বা প্রশ্ন জাগে :

'আমি ব্যথিত পূর্ব বাংলার ঈপ্সিত আলেখ্যব
চৌচির প্রতিলিপি মুখ থুবড়ে থাকা মানবতা
উদ্বাহু প্রগতির ধৃতরাষ্ট্র-বাহু বেষ্টনে ?' (ঐ)

—কবিতাটির একদিকে স্মৃতি-সৌরভ, আবহমান বাংলার অপার সৌন্দর্য, আর অন্যদিকে সেই সাজানো বাগানে দাঁতালের অবাধ প্রবেশে সত্তার বিদীর্ণ আত্মকথন— যা হাসানের অবলোকন পরিধি চিনিয়ে দেয়। এত কিছুর মাঝে সম্ভাবনার সোনালি রেখাটি ক্ষীণ হলেও এভাবে প্রতিভাত হয়— 'কে তোলে শঙ্খধ্বনি, তবু মসজিদে আজানে ?'

ষাটের দশকে অনিকেত সত্তার দীর্ঘ একটি ছায়া হাসানের মনের প্রশান্তি যেন কেড়ে নিতে চায় :

'সুপ্রাচীন শহরের আত্মহত নিস্তব্ধ তাঁবুতে
ছায়াহীন মানুষের ছবি দেখি অধুনা আয়ুতে'
(প্রাচীনতা যার/অন্তিম শরের মতো)

যৌবনের জোব্বায় জরার অক্টোপাশ কবিকে উন্মন করে তোলে। অন্বিষ্ট অসুর ধ্বংসে তিনি আহ্বান জানান। স্বদেশ পরিব্রাজকের দু'চোখে সেই মোমবাতি যা— 'বাতাসের মুখে তুলে ধরেছে।' প্রতিকূলতার আবসানে আলোর দিশারী কবি এই বার্তাই ছড়াতে চান—

'বিপদে বিপন্ন মুখ দেখিনি তোমার
বরাভয়ে সর্বংসহা স্বদেশ আমার।' (বিপদে বিপন্ন নও/ঐ)

কবির অভিযাত্রা উৎসের দিকে, জন্মের প্রথম মুহূর্তের দিকে, জন্মভূমির দিকে। তাই প্রতীক্ষা করেন অন্তিম শরের মতো। লিকলিকে পারিপার্শ্বিকতার যে বিনষ্ট বাতাসে শুধু ভয়াল আত্মরতি, কামার্ত কৌরব ধ্বনি, অট্টহাসি, শ্রুতির বিরাগ— সেসব কিছু ছাপিয়ে

উত্তরণেচ্ছু হাসান আশাবাদকে সাবলীলভাবেই প্রতিষ্ঠা করেন এভাবে—

'ফের হাঁসের পালকের মতো কূট ক্লেদ ঝেড়ে শাদা
আমি হেসে উঠি। জেগে ওঠে স্মৃতির মৈনাক
ছাপিয়ে তরল জলের গরল ভরাডুবি।
মুক্তি স্বপ্ন গেরিলার নম্র অহংকারে ভরে যায় মন,
পুড়ে যায় চোখের অরুচি, শ্রুতির বিরাগ।' (চোখের জলে ধোয়া/ঐ)

'আর্তশব্দাবলী' গ্রন্থটি নামকরণেই স্পষ্ট— যে আবেষ্টনে হাসান অবস্থান করছেন সেই সামরিক শাসনামলে সমষ্টি চৈতন্যে এক ধরনের ক্লান্তি দহন রয়েছে। স্বদেশ এবং আত্মচরিত্রের উন্মেচনে এই কাব্যে হাসান অনন্য। অভ্যস্ত বিহ্বলতাকে এড়িয়ে 'একটা সজ্ঞান পৌরুষে মন্ডিত' হয়ে ওঠার যে কথা তিনি বলেছেন— তার পুরোটা এই কাব্যে না পেলেও অস্তিত্বের অন্বেষণে তিনি নিরলস তা স্পষ্ট হয়। অন্তর্মুখ রোমান্টিক ধারার মধ্যেই এই কাব্যের বেশ কিছু কবিতায় তিনি তাঁর কাব্যবোধের অর্জনকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। চিন্তন মননের জন্য গদ্যধর্মীতা বেশি, দীর্ঘ কবিতার সর্বত্রই সংহতি— শৃঙ্খলা বা সমন্বয় আছে এমনটাও নয়— তবে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সমীকরণে যে পাঠ নির্মাণ করেন তার যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না। 'বিষণ্ণ শ্যামলী', 'শ্রাবণ ক্ষরিত রাতে', 'বিষাদ বাগান', 'তোমাকে দেখা', 'জোনাকী', 'মুখ', 'হাজার স্বজনের ভেতর', 'তোমার মনটি যদি হাতির মুঠোয় পোরা যেত', 'আরশিও পাবে না বলতে'— ইত্যাদি কবিতায় প্রেম, বিরহ, মৃত্যুর পাশে সমাজ স্বদেশ-স্বজনের কথাও উঠে এসেছে। প্রথম কবিতা 'ওডেসিউসের চোখে ন্যসিকা:আমার মনে'— গ্রিক পুরাণে বন্দিমুক্ত ওডেসিউস প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে যে ডাঙার সন্ধান পেলেন— সেখানে প্রথম দেখা রাজকুমারী ন্যসিকর সঙ্গে। চাইলেন আশ্রয়, ন্যসিকা ওডেসিউসের চোখে 'অনন্য গাছের মতো'। গোটা কবিতাটিই যেন দৈবী ক্রোধ-নিয়তি ডিঙানো সেই সত্তার কথা বলা হয়েছে— যে আশ্রয় সন্ধানী। তাই কবি লিখেন—

'পরিক্লান্ত নাবিকের দুই চোখে তুমি
অনাদি অনড় এক স্বদেশের ভূমি।'

'হ্যামলেট' কবিতায় ফুটে ওঠে বিদীর্ণ সত্তায় রোদের ছবি। গভীর আনন্দে, মৃত্যুর ঊর্ধ্বে যৌবনের গান— 'একটি রাতভরে আমি চুষে নিয়েছি আকণ্ঠ সেই বিষ'। 'অনন্য স্বদেশ' কবিতায় স্বদেশ সংসক্ত ব্যক্তিমনের অভিব্যক্তি ঘটে' :

'আমার শপথকে দিলাম তোমাকে
তোমার অমোঘ সঙ্গিন

আমরা ঐক্যকে দিলাম তোমাকে
তোমরা অজেয় শক্তি
… … …
তোমার অনন্যতাকে ক্ষুণ্ণ করে এমন সাধ্য কার ?'

এই জিজ্ঞাসা চিহ্নটিতেই জাতীয় চেতনার দার্ঢ্য উচ্চারণ নিহিত। জানুয়ারি ১৯৭১ থেকে আমৃত্যু লেখা কবিতাগুলি যে পাঁচটি কাব্যে গ্রন্থিত হয়েছে— সেগুলির মূল স্বর স্বদেশ পরিক্রমা, পরিবর্তিত সময় ও শাসনে ব্যক্তি সমষ্টি চৈতন্যের প্রতিচ্ছবি নির্মাণ। রবিকুল ইসলাম কথিত '(হাসান) আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের কবি ভাষ্যকার' (পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা/পৃ. ২৪৫)— এই মূল্যায়নের পরিসরেই যেন উক্ত পর্বের অধিকাংশ কবিতা রচিত। সমাজ অধ্যয়ন রাষ্ট্রিক পর্যবেক্ষণ, জন শক্তিতে আস্থা— সবকিছু ডিঙিয়ে মানব উজ্জীবনের প্রত্যয় উক্ত পর্বে হাসানের কবিতায় কিভাবে ফুটে উঠেছে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

ক) 'ব্যারিকেড ঘিরে আমূল বাংলাভূমি,
শান্তির নামে তোলে সঙ্গিন।
রক্তে রাঙিয়ে পলি কালো মাটি, তাকে
তারা বলে, সংহতি রঙিন।' (শত্রুর লাশ চাই/যখন উদ্যত সঙ্গিন)

খ) 'বাংলার আপদে আজ লক্ষ কোটি বীর সেনা
ঘরে ও বাইরে হাঁকে রণধ্বনি একটি শপথে
আজ হয়ে যায় শোর্যে ও বীরগাথার মহান
সৈনিক, যেন সূর্যসেন, যেন স্বয়ং স্পার্টাকাস স্বয়ং সবাই' (গেরিলা/ঐ)

গ) 'সাম্য আজো সোনার হরিণ
গণ অধিকারে এ ওর ভয়ে ভীষণ অস্থির' (আমার অনুগত্য/ঐ)

ঘ) 'অগস্ত্য যাত্রায় আমি বিশ্বাসী নই আমি। কারণ
অগস্ত্য ফিরে আসবার মিথ্যে প্রলোভনে
ভোলায় শুধু, ফেরে না কখনো।' (স্বজন হননের এই কালে/বজ্রে চেরা আঁধার আমার)

ঙ) 'মুখ বুজে মার খাই জীবনের কুরুক্ষেত্রে, সূচ্যগ্রভূমিও
আজতক পারি নাই জিনে নিতে।' (পুত্র/ঐ)

চ) 'কবি আর কিছুই চায় না হতে কেবল সে
ধ্বনিময় হতে চায়। হয়তো বা লেনিনের কণ্ঠ

হতে চায়।' (লেনিনের কণ্ঠ/ঐ)

ছ) 'ঘাতক পরেছে রক্ষকের শিরস্ত্রাণ, যা কিছু দামি
গুলির মুখে তাক করা। এ কালটার সবটাই বুঝি
বস্ত্র হরণের লাঞ্ছনায় বাঁধা পড়ে গেছে।'
(সে তার কাজ করে যাক/শোকার্ত তরবারি)

জ) 'আশৈশব
রণদামামা শুনতে শুনতে তালকানা আমার শ্রবণ
এখনো ঘুম ভাঙে রণহুঙ্কারে, আমি আমার শ্রুতি
ফিরিয়ে নিলাম।' (শোকার্ত তরবারি/ঐ)

ঝ) 'আমার ভেতরের বাঘ ম'রে যাচ্ছে প্রোটিনের অভাবে
দেদার সবুজ তৃণভোজনেও আমার দৃষ্টি আর
সুদূর প্রসারী হতে চায় না।'
(আমার ভেতরের বাঘ/আমার ভেতরের বাঘ)

ঞ) 'যদ্দূর দেখা যায়
ডালির ঘড়ির মতো
বিগলিত ধ্বংস অচল স্থির হয়ে আছে।' (কাঁপছে/ঐ)

ট) 'এবার সমুদ্র মন্থনের আগেই কালকূট উঠেছে ভেসে
নীলকণ্ঠ চাই, নীলকণ্ঠ চাই, নীলকণ্ঠ চাই
সন্তানেরা ছাড়া হননের শেষ অস্ত্র আকণ্ঠ গিলবে কে আর ?'
(ভবিতব্যের বাণিজ্যতরী)

ঠ) 'সারা দেহে বিষ নিয়ে, সারা মনে আঘাতের ক্ষত নিয়ে
সারাক্ষণ চারপাশে ঘর পোড়া ছাই নিয়ে
তবু কেন যে বহতা নদীর মতো বয়ে যেতে চাই।'
(তবুও কেন/ভবিতব্যের বাণিজ্যতরী)

হাসন হাফিজুর বিশ্বাস করতেন— 'ধ্বংস অসম্ভব একশব্দ', চান্দ্রপীঠজীবন, কালের গহ্বরেই আলোর সন্ধান করতে হবে। সুখদ সংবাদের জন্যই ভোরে ওঠা, প্রত্যাশার ডাকেই প্রাণের জেগে ওঠা। তিনি প্রতীক্ষা করেন 'যারা রক্ত ঝরায়/তাদের রক্তবমন' দেখার। মহামারী, প্লাবন, স্বৈরশাসন 'শুধু সাময়িক ধ্বংস আঁকে'—তাঁর স্থির প্রত্যয় এভাবেই জীবন চেনায়— এগিয়ে দেয়:

‘পোড়া বাগানের গাছপালা গুল্ম তরুলতা
ঋতুতে ঋতুতে হেসে ওঠে বলে জীবনের কথকতা’

(অপ্রকাশিত কবিতা : ২২)

কাব্য/গ্রন্থঋণ

১. কাব্য সমগ্র-হাসান হাফিজুর রহমান/সময় প্রকাশন, বাংলাদেশ বইমেলা-২০০১
২. হাসান হাফিজুর রহমান ও অন্যান্য কাজী মুহম্মদ আশরাফ/কথাপ্রকাশ, ঢাকা, বাংলাদেশ:ফেব্রুয়ারি-২০০৯
৩. হাসান হাফিজুর রহমান বিমুখ প্রান্তরে অনির্বাণ বাতিঘর/মিনার মনসুর/বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন-১৯৯৯
৪. পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা/সাঈদ-উর রহমান/ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/দ্বিতীয় সংস্করণ:জানু-২০০১
৫. ঈশ্বর গুপ্ত থেকে শহীদ কাদরী/আবদুল মান্নান সৈয়দ/সূচীপত্র/ঢাকা, বাংলাদেশ/প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি-২০০৭, বিশেষ সংস্করণ ২০১৫
৬. কবিতার অন্তর্যামী আধুনিক উত্তরাধুনিক ও অন্যান্য প্রসঙ্গ/খোন্দকার আশরাফ হোসেন/নান্দনিক, ঢাকা, বাংলাদেশ একুশে বই মেলা ২০১০।

সৈকত রক্ষিতের 'সিঁদুরে কাজলে' : প্রেমানলে আত্মাহুতি দেওয়া এক দুঃসাহসিনী নারীর ইতিবৃত্ত

অনিমেষ ব্যানার্জী

যশ, খ্যাতি ও সম্মানের মোহ থেকে কয়েক যোজন দূরে নিজের ঐকান্তিক সারস্বত সাধনায় রত এক নিরাসক্ত কথাকার হলেন সৈকত রক্ষিত। কোনো বাণিজ্যিক কাগজে এক ছত্র না লিখেও, কোনো সাহিত্যিক সম্মানের তাগিদ না দেখিয়েও কিংবা লেখাকে আশ্রয় করে অর্থ উপার্জনে সচেষ্ট না হয়েও তিনি চল্লিশ বছর ধরে সাহিত্যসাধনায় মগ্ন। এমন বৈরাগ্য স্থিথধী কথাকারের দৃষ্টান্ত বর্তমানে বিরল। বিরল মগ্নচৈতন্যের সাহিত্যিক মনস্তত্ত্বের মতোই বিরল তাঁর কথাসাহিত্যের বিষয়। পুরুলিয়া জেলার অনালোকিত জনজীবন ও সমাজ সংস্কৃতি তাঁর কথাসাহিত্যের আধার। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : "ছাত্রাবস্থায় বাংলা গল্প-উপন্যাস যখন পড়তাম, তখন দেখতাম যে, বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে পুরুলিয়ার কোনো অবদান নেই। এই অঞ্চলের জনজীবন ও ভাষা নিয়ে এমন একটি উপন্যাস নেই যা থেকে এই জেলার সমাজ সংস্কৃতি তথা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত হতে পারে। . . .আমার তখন মনে হয়েছিল, আমার লেখার অন্যতম উদ্দেশ্য হবে কথাসাহিত্যের মধ্যে এই পুরুলিয়াকেই প্রতিবিম্বিত করা। পুরুলিয়ার ডকুমেনটেশন করা।"[১] বলাবাহুল্য তিনি তাঁর সাহিত্য সাধনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করতে আজও সমান যত্নশীল ও ধ্যানস্থ। বয়সের ভার, অর্থনৈতিক অনটন এবং সামাজিক কোনো প্রতিবন্ধকতা তাঁকে তাঁর সাধনা থেকে বিরত করতে পারেনি। তাঁর এরূপ নিবিড় সাধনায় পুরুলিয়ার মতো পতিত জমিতে ফলেছে অসামান্য কিছু সাহিত্য ফসল। যা আপাতত প্রচারের সীমানার বাইরে থাকলেও, বিদগ্ধ পাঠকমণ্ডলীর কাছে বিশেষভাবে আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে। প্রচারবিমুখ ও অন্তমুখী স্বভাবের এই কথাকারের নাগাল পাওয়া যতটা কষ্টসাধ্য, তার থেকে সুকঠিন তাঁর সাহিত্যিক নিদর্শনগুলির সন্ধান পাওয়া। কারণ, তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাস বা গল্প-সংকলন এক বারের বেশি দুইবার মুদ্রিত হয়নি এবং বিশেষ কোনো

জনপ্রিয় প্রকাশনী সংস্থা থেকে প্রকাশিত না হওয়ায় তা পাঠকবিশ্বের নজরেও আসেনি। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি কালের নিরিখে এক একটি মাস্টারপিস। এবারে তাঁর সাহিত্যিক নিদর্শনের দিকে আলোকপাত করা যাক,

উপন্যাস : ১. 'আকরিক' (১৯৮৪), ২. 'হাড়িক' (১৯৯০), ৩. 'অক্ষৌহিণী' (১৯৯৬), ৪. 'ধূলাউড়ানি' (১৯৯৬), ৫. 'বৃংহন' (২০০০), ৬. 'সিরকাবাদ' (২০০১), ৭. 'কুশকরাত' (২০০১), ৮. 'সিঁদুরে কাজলে' (২০০২), ৯. 'ঢেঁকিকল' (২০০৩), ১০. 'ঢোল শোহরত' (২০০৩), ১১. 'মহামাস' (২০০৫), ১২. 'মদনভেরি' (২০০৮), ১৩. 'স্তিমিত রণতুর্য' (২০১৪), ১৪. 'বৈশাম্পায়ন কহিলেন' (২০১৪), ১৫. 'জয়কাব্য' (২০১৫)।

ছোটগল্প : ১. 'আরাম চেয়ার' (১৯৮০), ২. 'জন্মভূমি বধ্যভূমি' (১৯৮৮), ৩. 'উঠোরে পুতা জাগোরে পুতা' (১৯৯৩), ৪. 'মাড়াইকল' (১৯৯৪), ৫. 'বাঁশ বাগানের মাথার উপর' (২০০২), ৬. 'দশটি গল্প' (২০০৯), ৭. 'উত্তরকথা' (২০১৫)।

সৈকত রক্ষিতের উপন্যাসে চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে নারীর বিশেষ স্বাতন্ত্র্যতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর উপন্যাসসমূহের পর্যালোচনা করলে তিনটি নারী চরিত্র বিশেষ আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে, প্রথমত, 'উত্তরকথা'র জারমণি চরিত্রটি, দ্বিতীয়ত, 'বৈশম্পায়ন কহিলেন'-এর বিনতা চরিত্রটি এবং তৃতীয়ত, 'সিঁদরে কাজলে'র ভাদরি চরিত্রটি। বলাবাহুল্য, তিনটি চরিত্রই অসামান্য সুন্দরী,তবে তাদের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। জারমণি যদি আভিজাত্যের মানসসুন্দরী হয় তবে বিনতা বা ভাদরিকে দুঃসাহসের চূড়ান্ত অভিসারিকা বলা যায়। বিনতার মধ্যে মাতৃত্বের লালসা প্রকট এবং সেই সূত্রেই তাঁর মধ্যে অবৈধ রিরংসার প্রকাশ ঘটেছে। অপরপক্ষে ভাদরীর মধ্যে আছে অবদমিত যৌনাকাঙ্খার দুর্বার গতি, যা তাকে রাক্ষসী রূপ দিয়ে অবৈধ রিরংসায় মত্ত করিয়েছে এবং সন্তানহননের মতো পাপ কাজে সামিল করিয়েছে। তবে ভাদরি চরিত্রটির মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক নানা স্তরগত বিভাজন আছে এবং নানা দ্বান্দ্বিক টানাপোড়েন আছে— যা বিশেষভাবে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নপুংশক স্বামী আদালত মাহাতর দৃষ্টি এড়িয়ে, ঝুমুরের মহকী আবেদনের সূত্র ধরে ভাদরি মাহাতানের সর্বনাশী অবৈধ প্রেমানলে আত্মাহুতি দিয়েও পুনরায় প্রায়শ্চিত্তের বৃথা চেষ্টা মরমী কাহিনি 'সিঁদুরে কাজলে' উপন্যাসের মূল কথাবস্তু। উপন্যাসটির কাহিনি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভাদরির দুঃসাহসিক নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা বিশেষ আলোচ্য ও অনুভবের বিষয়। বাংলা সাহিত্যে এমন নারী চরিত্র বিরল, অথচ তা পাঠকের নজর এড়িয়ে গেছে। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে ভাদরির প্রতি তথা 'সিঁদুরে কাজলে' উপন্যাসটির প্রতি পাঠকবিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করানোই মূল উদ্দেশ্য।

পুরুলিয়ার সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে কথাকার সৈকত রক্ষিত যে কতটা সাহসী হয়ে এক দুঃসাহসিক কথাবস্তুকে পাঠকবিশ্বে পরিবেশন করেছেন তা 'সিঁদুরে কাজলে' উপন্যাস না পড়লে বোঝা যায় না। কলঙ্কিনী ভাদরি মাহাতানের দীর্ঘ পাঁচ বছর পর শিশুকন্যা চম্পিকে নিয়ে সংগোপনে স্বামীঘর মালথরে প্রত্যাবর্তনের মধ্যে দিয়ে কাহিনি শুরু হয়েছে। প্রত্যাবর্তন কালে পূর্ব পরিচিত পথ, ডুংরি গাছ, ক্ষেতের অনুষঙ্গে ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে তার কলঙ্কিনী জীবন একে একে ধরা দিয়েছে পাঠকের মনঃশ্চক্ষে।

উপন্যাসের কাহিনি সূত্রে জানা যায় যে, সুন্দরী ও তপ্ত যৌবনের অধিকারিণী ভাদরির বিবাহ হয়েছিল মালথরের আদালত মাহাতর সঙ্গে। সম্পন্ন গৃহে অভাব কিছুই ছিল না। ভাদরির রাজরানির মতো জীবন কাটানোর কথা ছিল। কিন্তু বাধ সাধল আদালতের পুরুষত্বহীনতা। স্বামীর পুরুষত্বহীনতাকে সে কখনোই মেনে নিতে পারেনি। মন থেকেও না, আবার দেহ থেকেও না। অবদমিত দৈহিক চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশির 'বাঁজা' অপবাদও সে সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না। সে নারীর স্বাভাবিক চাহিদার দাবী থেকে স্বামীর প্রতি প্রতিবাদী কণ্ঠে বলে ওঠে! "তোর হতেই হামার কপালে এমন কলঙ্ক জুটেছে। তুঁই ক্যানে হামার পেট ভরাতে পারিস নাই ? হামি নাই থাকব তোর সঙে। নাই থাকব।"[২] তবে মুখে বললেও সে আদালতের বাঁধন থেকে পুরোপুরি ছিন্ন হতে পারে না। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে সে প্রায়ই বাপের ঘর কালুহারে গিয়ে আশ্রয় নিত। আবার মনের ক্ষতকে সারিয়ে নতুন উদ্যম নিয়ে মালথরে নোঙর বাঁধত আদালতের সংসারে। নতুন কিছু মিরাকেলের আশায়। নতুন উদ্যম নিয়ে সচেষ্টও হয়ে উঠত আদালতের পুরুষত্বকে জাগিয়ে তুলতে : "সে তাকে বিছানায় ফেলে দীর্ঘসময় ধরে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল তার শরীরে জাগরণ নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু আদালতের শরীর আর কিছুতেই সাড়া দিল না। জাগল না। তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠল না নারী-শরীরের আমিষ গন্ধের জন্য। শেষতক তার নিরুত্তেজ যৌনাঙ্গটি মুঠোতে ধরেই ঘুমিয়ে পড়ল ভাদরি।"[৪] শুধু শরীর দিয়েই ক্ষান্ত না থেকে রূপের মোহিনী রহস্যেও সে আদালতের মধ্যে নারী তৃষ্ণাকে জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিল। কিন্তু ভাদরির এই ঐকান্তিক মরিয়া চেষ্টা পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই ছিল না। : "...রূপের টান আর অলৌকিকতা— কোনো কিছুই আদালতের কাছে মহার্ঘ হয়ে ওঠেনি। জাগায়নি তার হৃৎচাঞ্চল্য। সে না বুঝত তার চোখের ইশারা, না বুঝত শরীরী ভাষাও।...তবু ভাদরি ছিল নাছোড়বান্দা। শেষতক সে চেষ্টা চালিয়ে গেছিল তার মরদকে এই শাশ্বত ভাষা বুঝিয়ে দেবার জন্য। আর তাই নানাবিধ ছলাকলার অন্ত ছিল না তার। প্রতিটি রাতে সে মরিয়া হয়ে উঠত।"[৪] ভাদরির এরূপ ঐকান্তিক চেষ্টার বিপরীতে স্বামী হিসেবে আদালতের ব্যবহার ছিল চরম রূঢ়। সে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতায় বলবত্তায়

নিজের পুরুষত্বহীনতাকে ঢাকা দিতে দিয়ে গিয়ে ভাদরিকে চরম অপমান করত :"নিজের পুরুষত্বহীনতাকে মেনে নিতে না পেতে, উল্টে সে তার বউয়ের অতৃপ্তিকে খোঁচা দিয়ে বলে, 'তোর যদি এত কিসকিসানি তাইলে ফালটা ঢুকাঁয় বসে থাক ক্যানে! রেণ্ডি মাগী।'"[৫] ফলে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক হয়ে উঠেছিল বিভীষিকাময়। তাদের এই অসুস্থ দাম্পত্যের চোরা স্রোত বেয়ে অতি স্বাভাবিকতায় ঝুমুরের মোহিনী আবেশে শ্রীকৃষ্ণের বিমূর্ত অবয়বে হাজির হয়েছিল তৃতীয় জন শ্রীকান্ত। ভাদরির অশান্ত প্রেম ও শারীরিক দহনকে শান্ত করতে অবতাররূপে প্রতিপন্ন হয়েছিল তাদের বাপের বাড়ির বাগাল ছেলে শ্রীকান্ত। এক্ষেত্রে ভাদরি পিতা ল্যালহার আভিজাত্য তথা মানভূমের সামাজিক পটভূমিতে কুলটা নারীর ঘৃণ্য অবস্থানের মানদণ্ড— কোনোটিই বিচার-বিবেচনা করেনি। আসলে ভাদরি চার দেওয়ালের ঘরের পরিবর্তে হৃদয়ের ঘর গড়তে সচেষ্ট ছিল। আর তাতেই সে হয়ে উঠেছিল দুঃসাহসিনী অভিসারিকা। যার নিদর্শন মানভূমের সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিরল।

এখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে আদালতের পুরুষত্বহীনতার বিপ্রতীপে ভাদরি শ্রীকান্ত বাগালকে স্বপ্নের পুরুষের মর্যাদা দিল কেন ? শ্রীকান্তর কী এমন সম্পদ ছিল যা তাকে তার প্রতি দুর্বারভাবে আকর্ষণ করেছিল ? এই প্রশ্নগুলির উত্তর পেতে হলে আমাদের মানভূমের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি আলোকপাত করা প্রয়োজন। মানভূমের জনজীবনে ঝুমুরের এক অনির্বচনীয় মাদকতা আছে। যার প্রতি দুর্নিবার মোহে সাধারণ গৃহবধু থেকে অবিবাহিত মহিলারা পর্যন্ত বিবাগী হয়ে সুর-সাধনায় মত্ত হত। ভাদরির পিতা ল্যালহা মাহাতর মতো অনেক সাধারণ মানুষই ঝুমুরের এই সর্বনাশী শক্তির বিষয়ে অবহিত ছিল। আর তাই তাদের কাছে ঝুমুর ছিল "চুয়াড়দের জিনিস"। কিন্তু সংসার জীবনে নিষিদ্ধ সুরের মাদকতার স্পর্শ ভাদরি তার মায়ের সুত্র ধরে পেয়েছিল। আর জীবনের চরম দ্বান্দ্বিক পর্বে শ্রীকান্তের মুখে শোনা ঝুমুরই তার কাছে কাল হয়ে উঠল। বিশেষ করে তার মুখে শোনা : "তুমার সিঁথার সিঁদুর দামিনী চৈখের কাজল যামিনী / কানফুলটি কামিনী করিছে ঝলমল।...বধু, আর কী দিঁইয়ে সাজাব তুমাকে— সিঁদুরে কাজলে টলমল।"—ঝুমুরটির মধ্যে নিজের সত্তাকে খুঁজে পেয়েছিল। খুব স্বাভাবিকভাবে এক মোহনীয় মাদকতায় সে তাঁর জীবন-যৌবন ঝুমুরিয়ার প্রতি সঁপে দিয়েছিল। তার এই আত্মনিবেদনে তাৎক্ষণিক উচ্ছ্বাস ও অনুরাগ বেশি ছিল। বলাবাহুল্য এই উচ্ছ্বাসের সোপানে পা দিয়েই সে শ্রীকান্তের সঙ্গে নিষিদ্ধ শরীরী খেলায় মেতে উঠেছিল।

নিষিদ্ধ প্রণয় ও ঝুমুরের মাদকতায় মত্ত ভাদরির নারীত্ব অবশেষে সার্থকতা লাভ করেছিল। সে ক্রমান্বয়ে শ্রীকান্তের ঔরসে এক পুত্র ও এক কন্যার মা হতে পেরেছিল। অন্যদিকে অবৈধ সন্তানদ্বয়ের পিতৃত্ব বিনা বিরোধিতায় স্বীকার করেও আদালত চেয়েছিল

শুধু এক নির্ঝঞ্ঝাট সংসার জীবন। কিন্তু, আদালতের চোখ এড়িয়ে শ্রীকান্ত সীমিত ও অনিয়মিত পরিধিতে ভাদরিকে পেতে ইচ্ছুক ছিল না। সে চেয়েছিল ভাদরিকে নিয়ে ঘর বাঁধতে। সে প্রায়ই ভাদরিকে বলত : "কিস্যার লাইগে তুঁই উ 'মেনিমুহা'টার সঙে থাকবি ? বউকে য্যা দিতেই লারে!"[৬] ভাদরিও হয়তো মনে মনে তাই চেয়েছিল। কিন্তু সে শ্রীকান্তের মতো তাড়াহুড়ো করতে চায়নি। সে হয়তো রয়ে সয়ে আদালতের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিধিতে থেকেই তার প্রণয়লীলা চালিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু তার নিষিদ্ধ রিরংসার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তারই পুত্র ভব।

সর্বদা মায়ের ন্যাওটা ভবের চোখে তার মায়ের আচরণ অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। সে তার শিশুমন দিয়ে অনুভব করেছিল যে, মায়ের যে ভালোবাসা ও যত্ন তার বাবার প্রাপ্য তা পায় অন্য কেউ। আর এই অন্য কেউটা যদি তাদেরই বাগাল শ্রীকান্ত হয়!— তবে তো তার শিশুমনকে নাড়া দেবেই। কিন্তু শিশু ভব তো জানে না তার আত্মপরিচয়। সে বাবা বলতে জানে আদালতকেই। সে তাই স্বাভাবিকভাবেই তার মাকে সচেতন করতে চেয়ে প্রায় এক প্রকার হুমকি দিয়েও বলেছে, : " ...হাঁ মাই, শিকাইন্তাকে তুঁই গুহালঘরে চুপু চুপু খাওয়াস ক্যানে ? হামি বলে দিব বাবাকে।'"[৭] এমন হুমকি অবশ্য ভব প্রায়ই তার মাকে দিতে থাকে। ভবের এরূপ নজরদারি ভাদরির নিষিদ্ধ শরীরী মিলনে প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। পুত্রের নজরদারি থেকে বাঁচতে সে প্রায়ই ভবকে কোঠাঘরে বন্দি করে রাখে। এরকম সময় ভাদরির মধ্যে দেখা দেয় এক তীব্র দ্বন্দ্ব। সে শ্রীকান্তের মোহনীয় আকর্ষণকে যেমন উপেক্ষা করতে পারে না, তেমনই পুত্র স্নেহকে হৃদয়ের মধ্যে দমন করেও তার প্রতি নিষ্ঠুর হতেও পিছুপা হয় না। সে তখন এমন কাম-ঘোরে মত্ত যে পাপ ও পুণ্যের বোধশক্তিও হারিয়ে ফেলে। কিন্তু ভব শ্রীকান্তের সঙ্গে তার মায়ের শঙ্খিনী রূপ দেখেই ফেলে এবং রাগে প্রমত্ত হয়ে রুদ্ধ দ্বারের অপর প্রান্ত থেকে মরিয়া হয়ে বলে ওঠে : " 'খুল কপাট! এ শিকাইন্তা! কপাট খুল নাই তো হামি বলে দিব বাবাকে! হামি আজ বলবই!' " ভাদরি ভবের এরূপ আক্রমণাত্মক মেজাজ দেখে বুঝতে পারে আর কোনো প্রলভন বা ভীতি দিয়ে শিশুমনকে স্তব্ধ করা যাবে না। ফলে সেও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে মরিয়া হয়ে ওঠে এবং প্রকৃতই এক করালরূপিনী হয়ে :" ...দমাদম মারতে থাকে ভবকে। বলে, 'বলবিস ? লে বল তুঁই কী বলবিস। বল খালভরা!" ...তারপর এক সময় রাক্ষসী মূর্তিতে তার টুঁটি দুহাত দিয়ে শক্ত করে চেপে বলতে থাকে, 'বল ইবার...বলবিস'...ভব আর কিছুই বলল না। তার অসাড় শরীর নিয়ে সে তালাইয়ের ওপেরে পড়ে গেল! চোখগুলো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।"[৯] ভাদরির যখন চৈতন্য ফিরল তখন সব শেষ। পৃথিবীর সব থেকে ঘৃণ্য পাপ কলঙ্কিনী হয়ে সে শুধু আর্ত চিৎকার করে উঠল : " 'অ মা গ! হামি ই কী

করলি! হামার ভব ব্যাটা য্যা আর রা সা কুছুই কাড়ছে নাই গ। –এ শিকাইন্তা।"[১০]

পুত্রহন্তার পাপে অপরাধিনী ভাদরি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শ্রীকান্তের হাত ধরে বিবাগী হয়ে এক অন্যতর জীবনে পদার্পণ করেছিল। আদালত মাহাতর সংসারে যে শ্রীকান্ত ঝুমুরের অনুষঙ্গে ভাদরির কাছে শ্রীকৃষ্ণের বিমূর্ততায় প্রতিভাত হত, সেই শ্রীকান্ত স্বাধীন পরিবেশে হয়ে উঠল চরম অসহ্যকর। একদিকে শ্রীকান্তের ঝুমুর ও নাচনি দল নিয়ে মাতামাতি এবং ভাদরির যৌবনকে নাচনির মাধ্যমে পণ্য করার প্রচেষ্টা যেমন তার প্রতি ভাদরির মোহ ও আকর্ষণকে ঘৃণায় পরিণত করেছিল, ঠিক তেমনই পুত্রহন্তার মহাপাপ তার অন্তরের চৈতন্যকে জাগিয়ে তুলেছিল। ফলে ভাদরি অন্তরাত্মায় প্রায়শ্চিত্তের তাগিদ অনুভব করছিল। এই তাগিদ তাকে ক্রমশ সাহসী হতে সাহায্য করেছিল। সে সুযোগ বুঝে শিশুকন্যা চম্পিকে নিয়ে স্বামীঘর মালথরের উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়েছিল। সে জানত মালথরে তার জন্য অপেক্ষা করছে চরম বিপদ। হয়তো বা মালথরবাসী তার মতো কলঙ্কিনীর জন্য ভেবে রেখেছে মৃত্যুদণ্ডই। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তকামী ভাদরি সমস্ত রকমের আশঙ্কা দূরে সরিয়ে রেখে শেষবারের মতো আদালত মাহাতর সামনে দাঁড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু মালথরে পৌঁছে সে প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ তো দূরের কথা আদালতের নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতাই উপহার পেয়েছিল। আদালত তীব্র ভৎর্সনা নিয়ে বলেছিল : "ক্যানে তরা ইয়াকে গাঁয়ে ঢুকতে দিলি ? ই কে বঠে হামার ? নাই চিন্‌হি!"[১১]

আদালতের প্রত্যাবর্তনের পর গ্রামবাসীরা ভাদরির প্রতি তীব্র অসম্মান দেখিয়ে তাকে গ্রামছাড়া করে গদাইডুংরি পার করে দিয়ে এসেছিল। কলঙ্কিনী নারীর প্রতি যতটা রূঢ় ও কঠোর হয়ে অপমান প্রদর্শন করতে হয় তার কোনোকিছুই মালথরের অধিবাসীরা বাকী রাখেনি। আপাত দৃষ্টিতে তা মনে হতে পারে নারীত্বের অপমান। কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলে বোঝা যায় যে, এই কলঙ্কিনী নারী-জীবনের প্রতি অসম্মানের মধ্যে দিয়েই ভাদরী তার প্রায়শ্চিত্তমনস্ক নারীজীবনকে সার্থক করে তুলেছিল। তাই কথাকার সৈকত রক্ষিত নৈর্ব্যক্তিক থাকতে না পেরে ভাদরির মনঃশ্চক্ষে সাজিয়ে দিয়েছেন কতকগুলো শব্দবন্ধ যা একান্ত তাঁরই এবং হয়তো আধুনিক পাঠকবিশ্বের অনুধাবন, "ভাদরির মনে হয়, সে যা দেখেছে অথবা সে যা— দেখেনি, তার সবটাই নারী-জনমের কারণে। সে ধন্য! সে নারী হয়ে জন্মেছে বলে। তা না হলে কি এমনভাবে দেখতে পেত সেই 'উপিন্দ কাকা'কে ? মুকুন্দকে ? কমলাকান্তকে ? হর পাগলকে ? এবং সর্বোপরি নিবারণ ও শ্রীকান্তকে ? মুনশিকে ? এদের না দেখলে জীবন পূর্ণ হতো না ভাদরির। সে নারী বলেই দেখতে পেয়েছে পুরুষের বহুরূপতা। সে দেখল জগতের ছদ্মরূপ। এই ছদ্মই প্রকৃত সত্য। সত্য অন্ধকার। পাঁচ বছর ধরে সে দেখেছে এই অন্ধকারকে তাই এই নারী জীবন পেয়ে সে তৃপ্ত।"[১২]

পুরুষকে চিনে, নিজেকে চিনে তথা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে জীবনের শেষাংশটা স্বামী আদালতের পায়ে পড়ে থাকতে চাইলেও তা হবার নয়। মানভূমের সমাজ ও সংস্কৃতি যে কলঙ্কিনী নারীকে কোনোদিন ক্ষমা করতে শেখেনি। তাই শত অনুনয়-বিনয়ের পর গ্রামবাসী দল করে তার শিশুকন্যাটির ভবিষ্যতের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে তাকে গ্রামছাড়া করে দিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে সমবেতভাবে গাইতে থাকে একটি ঝুমুর, যে ঝুমুরে মানভূমের চিরন্তন পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে নেই কোনো স্বৈরিণী নারীর কথকতা, সেখানে নেই পুত্রহন্তার মহাপাপে অভাগিনী কোনো নারীর মর্মবেদনা বা সেখানে নেই সেই সব পুরুষের কথা যাদের ক্লেদে মানভূমের শত শত নারী আজ বিবাগী ও কলঙ্কিনী :

"আওয়া দেখা ভাই
মানভূঞ কেসন সুন্দর
কাঁসাই শিলাই সবন্নখা
নায়ে কুদয় আঁকাবাঁকা
কুমারী গুয়াই দামুদর গো
মানভূঞ কেসন সুন্দর...
শাল পিয়াল মহুল বন
উড়ু উড়ু করয় মন
তালপাতে বনাওলঁ ঘার গো
মানভূঞ কেসন সুন্দর...
টুসু ভাদু করম গান
ঝুমৈরে বহয় বান
ছোনাচে নাচয় অন্তর গো
মানভূঞ কেসন সুন্দর..."[১৩]

ঝুমুরটি ঘটনা প্রেক্ষিতের সঙ্গে অসামঞ্জস্য মনে হলেও একান্তভাবেই তা প্রাসঙ্গিক।সুন্দর মানভূমের মায়াবী পরিবেশে আছে মনহরণীয় আবহাওয়া। সেই আবহাওয়ার মায়াজালে ভাদরির মতো শত শত নারী প্রেম ও বৈধতার প্রান্তিক সীমানা অনুধাবন করে উঠতে না পেরে পতঙ্গের মতই কামানলে ভস্মীভূত হয়ে যায়। ভাদরির মতো দুঃসাহসিনী নারীদের আর্তকথা যেমন মানভূম মানতে চায় না, তেমনি মানভূমের সমাজও তাদের মান্যতা দেয় না। আপাত মানভূম এতটাই নিষ্ঠুর। কথাকার সৈকত রক্ষিত ভাদরির দুঃসাহসিক আত্মক্ষয়ী পথচলাকে 'সিঁদুরে কাজলে' উপন্যাসের মাধ্যমে সাহিত্যিক রূপ দিয়ে এক 'এপিক্যাল জার্নি'কে পাঠকবিশ্বেউপস্থাপন করেছেন।

তথ্যসূত্র

১. রক্ষিণ সৈকত, লেখা এক অপ্রত্যক্ষ সংগ্রাম,সম্পা. পলমল অরূপ, কথাসাহিত্যিক সৈকত রক্ষিত, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০১৩,ডাভ পাবলিশিং হাউস,৯/৪ টেমার লেন (কলেজ স্ট্রিট), কলকাতা- ৭০০০০৯, পৃ. ২০-২১।

২. রক্ষিত সৈকত,সিঁদুরে কাজলে, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০০২, মুক্তাক্ষর, ১/১১ গান্ধী কলোনি, কলকাতা— ৭০০০০৪০, পৃ. ২৫।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

ঔপন্যাসিক বাণী বসু :
সাম্প্রতিক বাংলা কথা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল প্রতিভা

শুদ্ধসত্ত্ব বর্মণ

ভারতের স্বাধীনতা লাভের বছর পঁয়ত্রিশ পরে— ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের সূচনায় ওই সময়টা কেমন যাবে, সে বিষয়ে অমলেন্দু দাশগুপ্ত একটি দৈনিক পত্রিকায় তাঁর অভিমতটি ব্যক্ত করেন। সেই অভিমতটি এরকম— "১৯৮১ সালের বেশিরভাগ সম্ভাবনাই উদ্বেগজনক বা হতাশাব্যঞ্জক মনে হয়। আমি অর্থনীতিবিদ নই, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ও বর্তমান অবস্থায় অভিজ্ঞতার এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত শুনে বিশেষ ভরসা হচ্ছে না। দেশের রাজনীতিক ও প্রশাসনিক অব্যবস্থা দূর হবে এই আশা করাও কঠিন। বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বিভিন্ন কারণে বিক্ষোভ ও অশান্তি হয়তো আরও বাড়বে। দেশব্যাপী অস্থিরতা বা নৈরাজ্য দেখা যাবে এমন আশঙ্কা করি না, কিন্তু সংহতি বা সুস্থিতি বা দৃঢ় সমষ্টিক অগ্রগতির আশাও কম। ইংরেজিতে যাকে বলে drift— যা আমাদের জীবনে অনেকদিন ধরেই চলছে— সেটা আরও বাড়বে। রাজনীতিক দল অথবা নেতৃত্ব সম্বন্ধে জনসাধারণের আস্থা কমছে, অথচ রাজনীতির আবর্ত থেকে মুক্তি নেই। এই অবস্থায় চলবে। সবচেয়ে উদ্বেগ জনজীবনে ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলা।" (অমলেন্দু দাশগুপ্ত/'বছরটা কেমন যাবে' সাক্ষাৎকার/ আনন্দবাজার পত্রিকা ১১ জানুয়ারি ১৯৮১)। কোনও অলৌকিক উপায়ে নয়, শুধুমাত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে জরিপ করে, নিজের বোধশক্তির উপর নির্ভর করে যে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, তার পুরোটাই মিলে গেছে। সাম্প্রতিক এই সময়ের যে সংকট তা সাহিত্যের ওপরও প্রভাব ফেলেছে, বলাইবাহুল্য। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের কাল আমরা পেরিয়ে এসেছি। তার পরবর্তীকালে প্রায় সম-সময়ে কথাসাহিত্যের অঙ্গনে আবির্ভূত তিন শক্তিশালী বন্দ্যোপাধ্যায় লেখক বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক—এঁদেরকেও আমরা হারিয়েছি। তাঁদের কিছু সময় পরের শক্তিমান লেখকবৃন্দ— বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে মনোজ বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, প্রমথনাথ বিশী, সুবোধ ঘোষ, সতীনাথ ভাদুড়ী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী এঁরা সবাই বিদায় নিয়েছেন। তাঁদের কিছু পরবর্তী প্রজন্মের নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ

গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ— এঁদের লেখনী আজ স্তব্ধ।

সেকারণে বাংলা উপন্যাসের এই ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করার দায় যাঁদের ওপর এসে পড়ছে, তাঁদের জন্ম ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে। আমাদের আলোচ্য এই পর্যায়ের লেখকবৃন্দের লেখনী থেকে যে সাহিত্যসম্ভারের প্রকাশ ঘটবে— তার মধ্যে কোন্ বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হবে।

বেশিরভাগ উপন্যাসই স্রষ্টার আপন দেশ-কালের স্মৃতিকথন। এই স্মৃতি অনতি অতীত বা সুদূর অতীত হতে পারে। যে সুদূর অতীতের কথা বলা হল— তা যেমন ইতিহাসের ধূসর পথ বেয়ে জেগে উঠতে পারে, আবার তা লেখকের নিজের বাল্যজীবন থেকেও উঠে আসতে পারে। অসংখ্য, অগুনতি এই ঘটনাবলীই লেখকের কল্পনায় মিশে এমনভাবে আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়, যার মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে এই সমাজকালের বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

সদ্য বিগত শতকের আটের দশকে যে সমস্ত লেখনী ঝলসে উঠবে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের বছরে যাঁরা নিতান্ত বালক-বালিকা, এই মধ্যবর্তী সময়ে তাঁরা কোন্ কোন্ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন ? দেশভাগ, দাঙ্গা, উদ্বাস্তুস্রোত, গান্ধীহত্যা, অর্থমন্দা, খাদ্যসমস্যা ও তাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন, পুলিশি বর্বরতা, রেল ধর্মঘট, প্রতিবেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ, নকশাল আন্দোলন, বন্যা, উদ্বাস্তুনিপীড়ন, মেধা চালান, গণটোকাটুকি, প্রাইভেট ট্যুশনের রমরমা, শিক্ষার মানের লজ্জাজনক অবনমন, যৌথপরিবারগুলির ভাঙ্গন, বৃদ্ধাবাস-সংস্কৃতি, ভোটের প্রহসন, প্রতিভাবান যুবকদের পথভ্রষ্টতা, সন্ত্রাসবাদ থেকে উদ্ভূত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, প্রযুক্তির কাছে মানুষের বশ্যতা স্বীকারের ফলে যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতি, এরসঙ্গে সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য, মহামারী, অশিক্ষা। এবং দেখা যাচ্ছে নারীসমাজের উন্নতি শুধু মুখের বুলিতেই সীমাবদ্ধ— তা যেন বিরাট কাগুজে বাঘ। আসলে সেই পণপ্রথা, বৈধব্য প্রথা, কন্যাভ্রূণ হত্যা, বলাৎকার গৃহহিংসা— এসবই আগের মতোই নারীর অদৃষ্ট হিসেবে চিহ্নিত।

স্বাধীন প্রৌঢ় নাগরিকের অভিজ্ঞতাগুলি এমন সঞ্চয়েই পূর্ণ হয়। এমন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়েই অধ্যাপনার কাজে যুক্ত বাণী বসুর লেখার জগতে আত্মপ্রকাশ। যে আশির দশকে তাঁর লেখালেখি প্রকাশ পায়, সেই দশক যেন এক ডুবন্ত দশক। চূড়ান্ত-অব্যবস্থা চারিদিকে। মানুষের নৈতিক কোনো খড়কুটো নেই। আর তারফলে চিন্তাসূত্রে দৈন্যতার প্রকাশ ঘটছে লজ্জাজনকভাবে। গভীর বেদনাবোধে আক্রান্ত লেখক দেখেন, এই হতভাগ্য দেশের মূল দুর্বলতা— 'অশিক্ষা' ও 'কুশিক্ষা'। এবং একদল স্বার্থান্বেষী তাকে ইচ্ছে করে

জিইয়ে রেখেছে। সমালোচকের দৃষ্টিতে এইসময় তিনধরণের ভাবনার কথা উঠে আসে। একদল মনে করেন, আমাদের একটা দেশ ছিল। আমরা তাকে হারিয়েছি। আবার তার পুনরুদ্ধার দরকার। আর একদল মনে করেন, এখন যে দেশে আমরা রয়েছি, তা বদলানো দরকার। অন্য আর এক দলের মতে, আমাদের কোনো দেশই ছিলনা কোনোদিন। একে নতুন করে নির্মাণ করা দরকার। কিন্তু বাণী বসু মনে করেন, এই দেশ বিশেষ জল হাওয়া মাটি, মাটির মানুষ, তাঁর পরিবার, সমাজ, সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে গড়া এক বিশেষ ভূমণ্ডল, যা তাঁর 'জন্মভূমি-মাতৃভূমি।' এই মাতৃভূমির আজ গভীর অসুখ— আর এই অসুখ নিরাময়ের স্বপ্নেই তাঁর সাহিত্য সাধনা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' ('বিবিধপ্রবন্ধ' দ্বিতীয়খণ্ড/প্রথম প্রকাশ 'প্রচার' ১২৯১ বঙ্গাব্দ মাঘ/জানুয়ারি ১৮৮৪) রচনায় নব্য লেখকদের উদ্দেশ্যে বারোটি নির্দেশদান করেছিলেন, তার একটি—

'যদি এমন বুঝিতে পারেন যে লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন; অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।'— এই কথাটিকেই যেন শিরোধার্য করে বাণী বসু সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হয়েছেন। পরিণত বয়সেই বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে তাঁর আত্মপ্রকাশ। তাঁর জন্ম বাংলা ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ২৬শে ফাল্গুন। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা-কর্ম সবই কলকাতায়। অনুবাদধর্মী রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর লেখালেখির জগতে প্রবেশ। প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় ১৯৮০ সালে। প্রথম উপন্যাস 'জন্মভূমি মাতৃভূমি' (১৯৮৭), প্রকাশিত হয় শারদীয় আনন্দলোকে। এ পর্যন্ত তাঁর যত উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে তারমধ্যে কয়েকটি হল— 'অন্তর্ঘাত' (১৯৮৯), 'পঞ্চম পুরুষ' (১৯৯০), 'শ্বেতপাথরের থালা' (১৯৯০), 'উত্তর সাধক' (১৯৯২), 'গান্ধর্বী' (১৯৯৩), 'একুশে পা' (১৯৯৪), 'মৈত্রেয় জাতক' (১৯৯৬), 'দিদিমাসির জিন' (১৯৯৬), 'কিনার থেকে কিনারে' (১৯৯৭), 'মেয়েলি আড্ডার হালচাল' (১৯৯৮), 'উপন্যাসপঞ্চক' (১৯৯৯), 'রাধানগর' (২০০১), 'অষ্টম গর্ভ' (১ম খন্ড ২০০০, ২য় খন্ড ২০১৫), 'অশ্বযোনি' (২০০৯) প্রভৃতি।

চলচ্চিত্রায়িত 'শ্বেতপাথরের থালা' উপন্যাসের সুবাদে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মুখে মুখে এখন বাণী বসুর নাম। কিন্তু জনপ্রিয়তা কোনো উপন্যাসের সার্থকতার মাপকাঠি হতে পারেনা, একথা বলাই বাহুল্য। লেখক তাঁর প্রথম উপন্যাস থেকেই প্রমাণ করতে পেরেছিলেন, নিছক গল্প বলার জন্য তিনি কলম ধারণ করেন নি। তিনি দার্শনিক ও দিগ্‌দর্শক। শুধুমাত্র পাঠক মনোরঞ্জনের জন্য তেমন কোনো কাহিনি রচনা করেননি তিনি, এ পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর সব উপন্যাসই বিষয় বৈচিত্র্যে অভিনব। ঠিক 'যেমন হয়ে থাকে'র সঙ্গে 'যেমনটি হওয়া ভালো'র সংযোজন ঘটে তাঁর কথা-আখ্যানে।

আশির দশকের ভয়ঙ্কর রিক্ততার চিত্র প্রকাশিত হয়েছে লেখকের প্রথম উপন্যাস 'জন্মভূমি মাতৃভূমি'তে। এই উপন্যাসে দেশের প্রতি হতাশায় নিমজ্জিত ও তার ফলশ্রুতিতে দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে বিদেশে চলে যেতে তৎপর চরিত্র যেমন উঠে এসেছে, তেমনই এইসব দেখার পরও স্বদেশের 'অসুখ' নিরাময়ের স্বপ্নে বিভোর সংগ্রামী চরিত্রও গভীর সহানুভূতিতে চিত্রিত। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র স্বদেশ, যার ডাকনাম বাবু তার উক্তিতে যেন লেখকেরই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ধ্বনিত, 'ধর্, টাইটানিকের মতো বিশাল জাহাজ ডুবছে, তলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। আমার মতো একজন সক্ষম যুবক যাত্রী কি লাইফবোট নিয়ে সেখান থেকে পালাতে পারে, না পালানো উচিত ?...চেষ্টা তো করবো।...আমাদের সাহায্য প্রার্থনা যে নিজেদের কাছে। বাঁচব বাঁচাব। বাঁচব বাঁচাব।'— এই বিশ্বাসই বাণী বসুর সমস্ত কথাসাহিত্যের মধ্যে ঘুরে ফুরে এসেছে, যা বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে এই সার সত্যকেই প্রকাশ করেছে। 'অন্তর্ঘাত'-এর সৌম্য, শীর্ষ, 'উত্তরসাধক'-এর মেধা, দেবপ্রিয়; 'শ্বেত পাথরের থালা'-র আনন্দসাধক কাকা, এম. ডি. ঘোষাল, 'একুশে পা'-র ভেঙ্কটেশ, 'মৈত্রেয় জাতক'-এর চণক, তিষ্য; 'গান্ধর্বী'র অপালা, সোহম বা 'রাধানগর'-এর মন্দার এমনই সব উজ্জ্বল চরিত্র, যারা তাদের সমস্তজীবন অন্যের বা সমাজের বা দেশের অসুখের আরোগ্য লাভের জন্য নিবেদন করেছে।

'দুর্নীতির কি পচা ঘা থিক থিক করছে ওপর তলায় নীচতলায়। দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধি!' ('জন্মভূমি মাতৃভূমি') আর এই ব্যাধি নিরাময়ের জন্য সমাজের তরুণ প্রজন্ম আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে। কখনও তা নিরুচ্চারভাবে। আবার কখনও সোচ্চার প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে তীব্র আন্দোলনের মাধ্যমে। আর এই আন্দোলন সমাজ তথা মানুষের প্রতি গভীর জ্ঞান থেকেই জেগে ওঠে। তবুও অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে কালে কালে আন্দোলনে হাতিয়ার হিসেবে বন্দুকের নলকেই বেছে নেওয়া হয়েছে এবং তাকেই শক্তির উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে। দেশের যা কিছু দুষ্ট বীজ তা বিনষ্ট করাই তাদের একমাত্র অভীপ্সা ছিল। তাদের এই স্থির সংকল্পকৃত স্বপ্নে কোনও অন্যায় ছিল না; ছিল তা যে পথে আনার ভাবনা, তাতে। কারণ, হিংসা আনে প্রলয়। হিংসায় মঙ্গলের পথ হয় রুদ্ধ। হিংসা থেকে শুভবোধের জন্ম কখনও হতে পারে না। অচিরেই দ্বিগুণ হিংস্রতায় এই আন্দোলন দমন করে প্রশাসনিক শক্তি। কিন্তু, এই তরুণদলের স্বপ্ন দেখা, তাদের সংকল্প, আত্মদান, যন্ত্রণা— এসব মিথ্যে ছিল না। বাণী বসুর উপ্যাসে এই পথভ্রষ্ট প্রতিনিধিরা কী গভীর সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কিত হয়, 'অন্তর্ঘাত' উপন্যাসটি তারই উজ্জ্বল প্রমাণ।

তাই হিংসা বাণী বসুর সাধনপথ নয় কখনোই। বরং হিংসার অন্তর্নিহিত মনস্তত্ত্বে তাঁর বিশেষ মনোযোগ। হিংসার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েও তাঁর উপন্যাসে তা থেকে

উত্তরণের পথ প্রদর্শিত হয়। দ্বেষ-হিংসা-দ্বন্দ্ব-মৃত্যুর কথা তাঁর কাহিনিতেও ঘুরে ফিরে আসে। তবুও জীবনের এই অন্ধকারময় দিকটাই শেষ সত্য হয়ে ওঠে না। হিংসার বিপরীতে জন্ম নেয় অহিংসা, অপরাধের প্রতিদানে ক্ষমা, অক্ষমতার উদ্দেশ্যে অনুকম্পা,— জীবনের এই আলোকিত দিকগুলোই তাঁর উপন্যাসে বার বার ফিরে ফিরে আসে। 'অন্তর্ঘাত'-এও শীর্ষের চিঠির শেষ অংশে সেই অন্তিম অনুরোধে ক্ষমার কথাই শোনা যায়— 'দিদিকে বলিস ও ক্ষমা চায়নি, তবু যেন দিদি ওকে ক্ষমা করে। ওর জন্যে নয়, নিজেরই জন্য।'

প্রেমে অপ্রেমে ভরা মানবজীবন বাণী বসুকে বারবার আকর্ষণ করে। নতুন ভাবনায় প্রাণিত করে। আর সেই ভাবনা প্রকাশের জন্য 'নানা এক্সপেরিমেন্ট' তিনি করেন কাহিনি বয়নের ক্ষেত্রে। তাঁর 'পঞ্চম পুরুষ' নবজাতকের সম্ভাবনার বাণী। বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ভেঙে নতুন করে গড়ার গল্প। হয়তো রক্ত ঝরা লড়াই, মৃত্যু— এসব এই উপন্যাসে নেই। তবুও যে লড়াই আছে, তা এক সত্তার সঙ্গে অন্যের। প্রবৃত্তির সঙ্গে নিবৃত্তির। ভালোর সঙ্গে মন্দের। নরনারীর সম্পর্ক ভেঙে গড়ে উলটে পালটে তার আত্ম-আবিষ্কারের কাহিনি শোনান লেখক এই উপন্যাসে। এই উপন্যাসে আছে বিক্রমের মতো পুরুষ চরিত্র, যার কাছে নারী মাত্রেই ভোগ্যপণ্য, 'সুখারুটির সাথে খাট্টি মিঠি চাটনি', 'মুচমুচে কড়ানো চিংড়ি ভাজা', কিংবা নারীকে যে 'ঠিক বাথরুমের মতো ব্যবহার' করত। আবার উল্টো দিকে মহানামের মতো চরিত্র যিনি নির্বিকার নিরাসক্ত অথচ প্রেমময় ও মহাজ্ঞানী কর্মযোগী সদানন্দময় পুরুষ।

আকারে বৃহৎ ধ্রুপদী রীতির উপন্যাসই লেখেন তিনি। একটি নিটোল মূলকাহিনির সঙ্গে অসাধারণ মুন্‌শিয়ানায় মিশিয়ে দেন কিছু দারুণ কৌতূহলকর উপকাহিনি এবং সৃষ্টি হয় একটি সার্থক উপন্যাস। 'মৈত্রেয়জাতক', 'অষ্টমগর্ভ', 'খনামিহিরের ঢিবি'-র মতো এমনই ধ্রুপদী রচনার স্রষ্টা তিনি। আমাদের চেতনার গভীরে মিশে থাকে যে পুরাণ, লোককথার অনুষঙ্গ— তা আমরা আমাদের জীবনে নতুন করে নবরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। তার ওপরে আছে অবতার ভাবনা। যেমন 'অষ্টমগর্ভ' উপন্যাস। জনমানসে কৃষ্ণ-কথা সর্বদা সজীব এবং আমরা আমাদের সমাজে, পরিবারে কৃষ্ণের পুনরাবির্ভাবের প্রত্যাশায় সদা উন্মুখ— এই প্রত্যাশা একদিকে যেমন কৌতূককর, তেমনই করুণ। মহামানবের পুনরাবির্ভাবের স্বপ্ন অন্য বিশেষত্বে প্রকাশ পায়। মনের গোপনে টিকে থাকা এই আকাঙ্ক্ষার একান্ত মানবিক প্রেক্ষাপটে তিনটি শিশুর বেড়ে ওঠার কাহিনি 'অষ্টমগর্ভ'। তাদের ঘিরে আবর্তিত হয় বাংলার ইতিহাসের এক কালান্তক অধ্যায়। শিশুদের ও বড়োদের দুই পৃথক সমান্তরাল জগতের লড়াইতে জমে ওঠে কাহিনি, যেখানে বস্তুজগৎ অনবরত পুরাণ হয়ে যাচ্ছে, আর পুরাণ হয়ে উঠছে বাস্তব।

দেশে যখন মৈত্রীর অভাব সর্বত্র, তখনই লেখক কী গভীর মিলনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে লিখলেন 'মৈত্রেয়জাতকে'র মতো উপন্যাস। বর্তমানকে শুদ্ধিকরণের প্রয়াসে এই উপন্যাসে অতীতের ইতিহাসকে যেন পুনর্নির্মিত করা হল। বিচ্ছিন্নতাবোধ, দাঙ্গা-হিংসায় আক্রান্ত বর্তমানকে নিখুঁত করার প্রয়াসে তিনি এক প্রেমময় দেশের রূপ গড়ে তোলেন অতি সযত্নে। এই উপন্যাসেই তাঁর গভীর উপলব্ধি, যারা দলিত-নিপীড়িত-রিক্ত-ব্রাত্য তাদের উন্নতির কথা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা না করলে কল্যাণকর রাষ্ট্র গড়া যায় না। তাই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র চণক বা তিষ্য এই বিশাল ভূখণ্ডকে একত্র করে তার সার্বিক মঙ্গল কামনায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। একই পথ বেছে নেয় বিশাখা, জিতসোমা-র মতো দেশহিতৈষী, শুভচিন্তকেরা।

লেখক নিজের কর্মসূত্রে অধ্যাপনার সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত থাকার জন্য সমাজের হাজার হাজার তরুণকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন, মিশেছেন— উপর থেকে যেমন, ভিতর থেকেও। এই নবপ্রজন্মকে বেশিরভাগ প্রৌঢ়ের দল নষ্ট-পথভ্রষ্ট বলে মনে করলেও এদের প্রতি লেখকের গভীর আস্থা। তিনি মনে করেন, এরা অপার সম্ভাবনার আধার। 'একুশে পা' ছেলেমেয়েদের প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস যে, নিবিড় বন্ধুত্ব ও স্বার্থহীন সহযোগিতায়-সহমর্মিতায় সংঘবদ্ধভাবে তারা যেমন অসাধ্যসাধন করতে পারে, তেমনই কর্মক্ষেত্রে তারা যদি সুযোগ পায়, তাহলে তাদের ভেতরকার যোগ্যতার প্রতি প্রকৃত সুবিচার করে দেশের মঙ্গল ও গৌরববৃদ্ধি করতে পারে। তাঁর উপন্যাসে তাই এমন এক ঝাঁক উজ্জ্বল তরুণ তরুণী তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পাঠকমনে আলাদা করে জায়গা করে নেয়। আবার এমন কিছু তরুণ চরিত্র তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে, যারা প্রকৃতই কালো ছোপে আঁকা, কিন্তু ঔপন্যাসিক তাদের এই সংকটকালের অনিবার্য ফসল বলেই মনে করেন। তিনি তাঁর উপন্যাসে উজ্জ্বল এই তরুণ-তরুণীদের কৃত্রিমতা বর্জিত, ভানবর্জিত, সপ্রতিভ সহৃদয় নির্মল এক প্রজন্ম হিসেবেই দেখেন, যারা পরের জন্য নিবেদিত প্রাণ ও সম্পর্ক-উদাসীন নয় মোটেই।

পরিবারের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে বিভিন্ন সম্পর্কে যুক্ত নানা বয়সের, নানা স্বভাবের অসংখ্য নারী চরিত্র এসেছে তাঁর উপন্যাসে। তিনি নিজে নারী বলে তাঁর সৃষ্ট নারীরা কী গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তির আলোকে আলোকিত হয়েছে! সত্তরের দশক পেরিয়ে এসে নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা এসেছে নারীর— শিক্ষা ও বাইরের জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ পাবার কারণে। তা সত্ত্বেও নারীর সত্তার সংকট কি ঘুচেছে ? বা বলা যায় পূর্বের বিপন্নতা কি তাঁকে আর গ্রাস করে না ? পুরুষের চোখেও তার অবস্থানে পরিবর্তন সদর্থক দিকে ঘটেছে কিনা— এও বিচার্য। 'গান্ধর্বী' বা 'শ্বেতপাথরের থালা'— এমনই প্রশ্নের মুখোমুখি

আমাদের দাঁড়াতে বাধ্য করে। 'শ্বেতপাথরের থালা' উপন্যাসে বন্দনার স্বামীর মৃত্যুর পর যে কঠোর বৈধব্যব্রত তাকে গ্রহণ করতে হয়, তা থেকে বোঝা যায়, আমরা মধ্যযুগীয় চিন্তা থেকে খুব বেশি এগোতে পারিনি। এমনকি, পরে বন্দনা যখন তার কাকার স্নেহসাহচর্যে স্কুলে চাকরি নিয়ে ছেলেকে নিয়ে নতুন জীবনে সামান্য মুক্তির শ্বাস নিতে শুরু করেছে, তখন তারই স্কুলের 'শিক্ষিত' সহকর্মীনীরা তার বৈধব্য নিয়ে বাঁকা কথা শুনিয়েছে। 'গান্ধর্বী' উপন্যাসে অপালা অপার প্রতিভার অধিকারী হয়েও শুধুমাত্র সে নারী বলে তার এই প্রতিভার অপচয় ঘটেছে নিদারুণভাবে। অথচ এই উপন্যাসের আর এক চরিত্র মিতশ্রী, যে আত্মশক্তির জোরে সবকিছু ছিনিয়ে নিয়েছে। তার কাছে পুরুষেরা খেলার পুতুলমাত্র।

বাণী বসুর অভিজ্ঞতায় মেয়েরা ভীরুতা, দুর্বলতা, আশঙ্কা, অজ্ঞতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে বলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ প্রতাপ চালিয়ে গেছে। কিন্তু তিনি নারী-পুরুষের লিঙ্গভেদকে কখনও গুরুত্ব দেননা। সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্যই দরকার নারীর উন্নতি। এরজন্য প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষা এবং তা নারী-পুরুষ উভয়েরই। 'উত্তরসাধক' উপন্যাসের মেধা বলেছিল, 'আসল কাজটা হল মন পালটানোর কাজ।...আমার নিজের মনে হয় ছোট থেকে মুক্ত হৃদয়ে এবং মুক্ত বুদ্ধিতে কর্ম, মানবিক সম্পর্ক এবং জ্ঞানের চর্চা দরকার। ...নীতিবোধ সৌন্দর্যবোধ সহৃদয়তা খোলা মন— কর্মে প্রীতি এবং জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ এই সমস্ত মিললে যথার্থ মানুষ তৈরি হয়।' তাই ঔপন্যাসিক 'আস্ত-মানুষ' গড়ার জন্য বিচারবুদ্ধির সম্পন্নতাকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন।মাতৃরূপকে তিনি নারী-পুরুষ উভয়েরই মধ্যে অন্বেষণ করেন। তাই তাঁর অনেক পুরুষ চরিত্রের মধ্যেই প্রকাশিত হয় নারী-মন, যা মাতৃসত্তারই অন্যরূপ। বাণী বসুর সাহিত্যে এই মানবতাবাদেরই সঙ্গীত ধ্বনিত হয়।

বাণী বসুর উপন্যাসে যে কারণে দেশের এই দৈন্যতার-অসুখের নিরাময়ের পথ প্রদর্শিত হয়, যাতে মনের মধ্যে জাগে নতুন স্বপ্ন। তিনি নতুনত্বের প্রয়াসী। তাঁর কাহিনি সবসময়ই যেন ছক ভাঙতে চায়, ঘটনা-পরম্পরাকে অনুসরণ না করে সময়ের সংকটকে বুঝে নিতে চায় এক যুক্তিবাদী, শিক্ষিত মননের মধ্যে দিয়ে। তাঁর নির্মিত কথা-আখ্যানে মানবজীবনের সমগ্রতাই এক চরম রহস্য নিয়ে উপস্থিত হয়, যেখানে আদি-মধ্য-অন্তে গাঁথা সময়ই রহস্যের জাল ছড়ায়।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আকর

১. বাণী বসু/দশটি উপন্যাস/আনন্দ/চতুর্থ মুদ্রণ নভেম্বর ২০১০

২. বাণী বসু/নানা রসের ৯টি উপন্যাস/দীপ প্রকাশন/বইমেলা ২০১১
৩. বাণী বসু/কাহিনি ত্রয়োদশ/আনন্দ/দ্বিতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১১

সহায়ক

১. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়/বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা/দে'জ পাব:/জুন ২০০৪
২. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার/সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি/দে'জ পাব:/জানুয়ারি ২০০৩
৩. ক্ষেত্র গুপ্ত/বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (৬ষ্ঠ খণ্ড)/গ্রন্থনিলয়/আগস্ট ১৯৯৫
৪. সত্যেন্দ্রনাথ রায়/বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা/দে'জ পাব:/জানুয়ারি ২০০০
৫. সুজিত সেন সম্পাদিক/নারীমুক্তি: নানা চোখে/পাল পাবলিশার্স/২০১৫

পত্র/পত্রিকাপঞ্জি

১. পুরবৈয়াঁ, বিশেষ নারী ঔপন্যাসিক সংখ্যা, সপ্তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই ২০০১
—সম্পাদনা পূর্বাণী ঘোষ
২. বইয়ের দেশ, ১১ বর্ষ ৩ সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৫
—সম্পাদনা হর্ষ দত্ত
৩. শুভশ্রী (নারী : বাংলা কথাসাহিত্যে) ৪৩ বর্ষ, ১৪১১, ২০০৪-০৫
—সম্পাদনা পুলক কুমার সরকার

ভারতীয় নবজাগরণের প্রাণপুরুষ বিদ্যাসাগর ২০০তম জন্মবর্ষে— ফিরে দেখা

ড. রামশঙ্কর প্রধান

'উনবিংশ শতাব্দী' সাহিত্য তথা সমাজ ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং বাংলা তথা বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতির জীবন্ত দলিল। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে রামমোহনের প্রচেষ্টায় সমাজ থেকে সতীদাহ প্রথার অভিশাপ দূরীভূত হয়েছিল। উচ্চ-নীচ সব সম্প্রদয়ের মধ্যে সে কালে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। হিন্দু বিধবাদের জোর করে সতী হওয়ার জন্য বাধ্য করা হত। কখনো ধর্মীয় কখনো শাস্ত্রের অজুহাত দেখিয়ে বিধবা নারীদের সতী হওয়া যে পূণ্যের কাজ, কিংবা তাতে বংশ মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে সেকালে সমাজ পতিগণ বিধবাদের সতী হতে বাধ্য করতেন। স্বামীর মৃতুর পর বিধবাকে আফিং বা সিদ্ধি জাতীয় মাদক খাইয়ে আচ্ছন্ন করে রাখা হত এবং হাত পা বেঁধে জোর করে স্বামীর চিতায় তুলে দেওয়া হত। রামমোহন রায় সেই অভিশাপ থেকে বাঙালি সমাজকে নিষ্কলুষ করেছিলেন। আর বিদ্যাসাগর মহাশয় অবিদ্যা ও কুসংস্কারের মূঢ় আবরণ উন্মোচন করে সমাজকে জ্ঞানের আলোকের করুণাধারায় স্নাত করেছিলেন।

পড়াশুনায় সুখ্যাতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবাল্য। মাত্র পনের বছর বয়সে বিদ্যাসাগর মহাশয় অলঙ্কার শ্রেণিতে প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের সকল ছাত্র অপেক্ষা সর্বোৎকৃষ্ট হয়ে সর্বপ্রধান পারিতোষিক লাভ করেছিলেন, শুধু তাই নয় বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্য দর্পণ'— 'কাব্য প্রকাশ', 'রস গঙ্গাধর' প্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থে তাঁর ব্যুৎপত্তি বিচার করে তৎকালীন বিখ্যাত দর্শন শাস্ত্রবেত্তা জয়নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন মহাশয় বিদ্যাসাগরের সম্পর্কে বলে ছিলেন,— 'এই বালকের বয়োবৃদ্ধি হইলে বাংলা দেশের মধ্যে অদ্বিতীয় লোক হইবে। এত অল্প বয়সে এরূপ সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন লোক আমার কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই।'[১] এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিশেষ ঘটনার কথা আমাদের স্মরণে আসে, যেদিন ১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার বিদ্যাসাগর মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন, সেই দিনই বিদ্যাসাগরের পিতামহ রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাশয় তীর্থক্ষেত্র থেকে ফিরে বালক বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন তাঁর স্ত্রী দুর্গাদেবীর কাছে তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ— 'এই বালক

ক্ষণজন্মা অদ্বিতীয় পুরষ ও পরম দয়ালু হইবে এবং ইহার কীর্তি দিগন্ত ব্যাপিনী হইবে। এই বালক জন্মগ্রহণ করায় আমার বংশের চিরস্থায়ী কীর্তি থাকিবে, ইহাকে দেখিয়া আমি চরিতার্থ হইলাম, এ বালক সাক্ষাৎ ঈশ্বরতুল্য, অতএব ইহার নাম অদ্য হইতে আমি ঈশ্বরচন্দ্র রাখিলাম।'[২] ঈশ্বরচন্দ্র ক্ষণজন্মা এবং উনিশ বিশ শতক নয় আজীবন বঙালির অদ্বিতীয় পুরুষ হিসাবে পরিগণিত হবেন।

পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মাত্র নয় বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় আসেন। ১৮২৯ ,সালে ১লা জুন কলকাতার পটলডাঙ্গার সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। মাসিক বৃত্তি লাভ করে ঈশ্বরচন্দ্র 'ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হয়েছিলেন।'[৩] ছাত্রাবস্থা থেকেই ঈশ্বরচন্দ্র পরোপকারী ও দয়ালু ছিলেন। মাসিক যে বৃত্তি পেতেন তা কলেজের ছাত্রদের ও দরিদ্রদের খাওয়া ও বস্ত্র কেনার কাজে ব্যয় করতেন। কলকাতা থেকে দেশে ফিরলে দুঃস্থ ও গরীবদের বস্ত্র দান করতেন। মাত্র বাইশ বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজ থেকে আইন, বেদান্ত, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়ে তিনি সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি মার্শেল সাহেবের বিশেষ আস্থাভাজন হয়ছিলেন এবং 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেছিলেন। ঐ সময় ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ঈশ্বরচন্দ্র মহাশয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদ অলংকরণ করেন, মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কারণে ঈশ্বরচন্দ্র সমাজের বৃহত্তর আঙ্গিনায় প্রবেশ করলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অনেক ইংরাজি জানা লোক এদেশীয় ও বিদেশীয় যেমন ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে সংস্কৃত শিক্ষার মানসে উপস্থিত হতেন, তেমনি তত্ত্ববোধিনী সভার মুখ্য প্রচারক অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় সভায় যেসব প্রবন্ধ প্রচার হবে তার পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে নিতে আসতেন। তৎকালের বহু পন্ডিত মানুষ ঈশ্বরচন্দ্রের পান্ডিত্যের ও ব্যক্তিত্বের মহিমায় যেমন নতজানু ছিলেন, তেমনি তার করুণার কিরণে সমগ্র সমাজ স্নাত পুতঃ পবিত্র হয়েছিল সন্দেহ নেই। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রী এ প্রসঙ্গে বলেছেন— 'মানবচরিত্রের প্রভাব যে কি জিনিস, উগ্র-উৎকট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন তেজীয়ান পুরুষগণ ধনবান হীন হইয়াও যে সমাজ মধ্যে কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন তাহা আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়া জানিয়াছি। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, যাঁহার পিতার দশ বার টাকার অধিক আয় ছিলনা, যিনি বাল্যকালে অধিকাংশ সময় অর্ধবসনে থাকিতেন, তিনি এক সময় নিজ তেজে সমগ্র বঙ্গসমাজকে কিরূপ কাঁপাইয়া গিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে মন বিস্মিত স্তব্ধ হয়। তিনি এক সময় আমাকে বলিয়াছিলেন ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই যাহার নাকে এই চটিজুতাশুদ্ধ পায়ে টক করিয়া লাথি না মারিতে পারি। আমি তখন অনুভব করিয়াছিলাম এবং এখনও

অনুভব করিতেছি যে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য, তাঁহার চরিত্রের তেজ এমনি ছিল যে তাঁহার নিকট ক্ষমতাশালী রাজারাও নগন্য ব্যক্তির মধ্যে।'[৪] ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে থাকাকালীন ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীর পদ শূন্য হলে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সে দায়িত্বভার নিতে হয় ও পরে ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বিদ্যাসাগর কে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে আসীন হতে হয়।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর একদিকে সংস্কৃত কলেজের নানাপ্রকার সংস্কার, যেমন পুস্তকাদি সংরক্ষণ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের ছাত্রদের জন্য কলেজে পড়ার অনুমতি পত্র প্রদান, শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ প্রণয়ন ও শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিকীকরণ আনার প্রয়াসে দিনরাত চিন্তা ও পরিশ্রমে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। আবার অন্যদিকে তাঁর বেতাল পঞ্চবিংশতি যেমন বঙ্গে নবযুগের সূচনা করল তেমনি তাঁর 'জীবন চরিত', 'বোধোদয়', 'শকুন্তলা'র জনপ্রিয়তা বিদ্যাসাগরের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি জনসমাজে বাড়িয়ে দিল। ইতোপূর্বে সংস্কৃত কলেজের গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয়ের বিশুচিকা রোগের চিকিৎসা ও সেবা করেছেন। দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন মহাশয়ের ভাগিনেয়র ওলাউঠার খবর পেয়ে বিদ্যাসাগর সমাজের শুচি অশুচির তোয়াক্কা না করে ডাক্তার ডেকে নিজে তার সেবা করে সুস্থ করে তুলেছিলেন। শুধু পরিচিতই নয়, পরিচিত অপরিচিত যে কেউ অসুস্থকে বিদ্যাসাগর যথাসাধ্য চেষ্টা করে সেবা করে তাদের পুনর্জীবন দান করেছেন, তাই তাঁকে অনেকে দেবতা বলে শ্রদ্ধা করত। এই সেবা মনস্কতা বিদ্যাসাগরের আবাল্য মনো মধ্যে লালিত হত। তিনি দুঃস্থ কাউকে দেখলে স্থির থাকতে পারতেন না। বিদ্যাসাগরের সেবা পরায়নতার কথা বলে শেষ করা যাবে না। ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষে যখন খাদ্যের অভাবে মানুষ মৃতপ্রায়, বিদ্যাসাগর কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে নিজ হাতে খাদ্য পরিবেশন করেছেন। বীরসিংহে তিনি ঐ দুর্ভিক্ষের সময় অন্নছত্র খোলার ব্যবস্থা করেন। সমাজে তখন জাতপাতের বাছবিছারের কড়াকড়ি, কিন্তু বিদ্যাসাগর কতটা উদার ও এই সব তুচ্ছ জাত ধর্মের অন্ধকুসংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে তিনি হাড়ি মুচি ডোম প্রভৃতি নিচু জাতের গরীব দুঃখিনী মেয়েদের রূক্ষ মাথায় নিজ হাতে তেল লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এই ঘটনা শুনে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বিদ্যাসাগর চরিত'-এ যে মন্তব্য করেছেন তা আজ একবিংশ শতকেও সমান প্রাসঙ্গিক— 'আমাদের হৃদয় যে ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তাহা বিদ্যাসাগরের দয়া অনুভব করিয়া নহে— কিন্তু তাহার দয়ার মধ্য হইতে যে একটি নিঃসঙ্কোচ বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব পরিস্ফূট হইয়া উঠে, তাহা দেখিয়া আমাদের এই নীচ জাতির প্রতি চিরাভ্যস্ত ঘৃণাপ্রবণ মন ও আপন নিগূঢ় মানব ধর্ম বশতঃ ভক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া পারে না।'[৫]

বিদ্যাসাগর ঐ দুর্ভিক্ষের সময় অগনিত মানুষকে জীবন দান করেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে দেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের সাহায্য ছাড়াও তিনি সর্বসাধারণের কথা ভেবে তদানীন্তন বর্ধমান ডিবিশনের কমিশনার মনট্রিশর সাহেবের কাছে দরবার করে বহু সরকারি অন্নসত্রের ব্যবস্থা করেছিলেন। মনট্রিশর সাহেব বিদ্যাসাগরকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন— "The worm acknowledgment of Government for your generous exertious in relieving the poor during the recent scarcity in the hoogly District."[৬] এরপর বিদ্যাসাগর দেশবাসীর কাছে 'দয়ার সাগর' হিসাবে পরিচিত হলেন। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছিলেন— "অনেক মহৈশ্বর্যশালী রায় বাহাদুর প্রচুর ক্ষমতা লইয়া যে উপাধি লাভ করিতে পারেন নাই, এই দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান (বিদ্যাসাগর) সেই দয়ার সাগর নামে বঙ্গদেশে চিরদিনের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিলেন।"[৭]

শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন— ১৮৫৬ সাল বিদ্যাসাগরের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। বিদ্যাসাগর দরিদ্রদের দুঃখ নিবারণের জন্য যেমন নিজের সর্বস্ব পণ করতে পারতেন তেমনি সমাজের বিধবা প্রথার নামে অমানবিক কুসংস্কার দূরীকরণের জন্যও হয়েছিলেন বদ্ধ পরিকর। কারণ বহু প্রাচীন কাল থেকেই সহমরণকে সমাজ নিজেদের সুবিধার্থে শাস্ত্র সিদ্ধ প্রথায় রূপান্তরিত করে ফেলেছে, এবং বিধবা নারীগণ সমাজের এক কোণে নিদারুণ অবহেলায় জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে নিঃশেষে জীবন অতিবাহিত করবে এটাই ছিল বিধি সম্মত দস্তুর। উনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহনের ন্যায় বিদ্যাসাগরই 'প্রথম পুরুষ' যিনি সমাজের গন্ড প্রদেশে প্রোথিত এই জগদ্দল প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করে বিধবাদের ব্যর্থ জীবনকে সার্থকতায় উন্নীত করেছিলেন। বিধবাদের প্রতি সমাজের এই বিরূপ ব্যবহার বিদ্যাসাগরকে অনেক অল্প বয়সে পীড়িত করেছিল। তখন বিদ্যাসাগর কলকাতায় পিতার কাছে পড়াশুনার নিমিত্ত থাকতেন— "বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি বাল্যসহচরী ছিল। সেই সহচরী তাঁর এক প্রতিবেশীর কন্যা। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে বড় ভালোবাসিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন কলিকাতায় পড়িতে আসেন তখন বালিকার বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহের কয়েকমাস পরে তাহার বৈধব্য ঘটে। বালিকাটি বিধবা হইবার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের ছুটিতে বাড়িতে গিয়াছিলেন। বাড়ি যাইলে তিনি প্রত্যেক প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে জিজ্ঞাসা করিতেন কে কি খাইল ? ইহাই তাঁহার স্বভাব ছিল। এবার গিয়া জানিতে পারিলেন তাঁহার বাল্যসহচরী কিছু খায় নাই, সেদিন তাহার একাদশী : বিধবাকে খাইতে নাই। একথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেদিন হইতে তাঁহার সংকল্প হইল বিধবাদের এ দুঃখ মোচন করিব। যদি বাঁচি তবে যাহা হয়, একটা করিব। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বয়স ১৩/১৪ বৎসর মাত্র হইবে।'[৮]

বিদ্যাসাগরের একক আন্তরিক প্রচেষ্টায় এবঙ্গে নারীশিক্ষার প্রসার ঘটেছিল। পুরুষদের জন্য তো বটেই, শুধু মেয়েদের জন্যই বাংলাদেশে বহু স্কুল তাঁর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়ছিল। এরই সঙ্গে সঙ্গে বহু বিবাহ রদ ও বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের সংকল্প রূপায়নের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলাদেশে এক অভিশপ্ত যুগের অবসান ঘটিয়েছিলেন। একদা ভগবতী দেবী ও ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের কোন আত্মীয়ের দ্বাদশবর্ষীয়া বিধবা কন্যাকে দেখে বিদ্যাসাগরের কাছে আক্ষেপ করে বলেছিলেন— "বিধবা বালিকার পুনর্বার বিবাহ বিধি কি ধর্মশাস্ত্রের কোন স্থলে কিছু লেখা নাই ? শাস্ত্রকারেরা কি এতই নির্দয় ছিলেন ?"[৯] পিতামাতার আক্ষেপ বিদ্যাসাগরকে অনন্তর দগ্ধ করেছিল সন্দেহ নেই, সে কারণে তিনি পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলেন যে— বেদ, পুরাণ, স্মৃতি পাঠে তাঁর এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সিদ্ধ, এতে কোন সন্দেহ নেই। ইতোপূর্বে ডিরোজিও সাহেবের শিক্ষাগুরু ডেভিড ড্রামড তাঁর সম্পাদিত 'উইকলি এগজামিনার' পত্রিকার ২রা মে ১৮৪০ সংখ্যায় 'কুলীন ব্রাহ্মণস' নিবন্ধে লিখেছিলেন "লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক দ্বারা প্রণীত 'সতীদাহ প্রথা' রদকারী আইনটি আজ সর্বজন প্রশংসিত কিন্তু সবদিক বিচার করে নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না, এই প্রথার অবলুপ্তিতে নারী জাতির কোন মঙ্গল হয়েছে কিনা ?

সতীদাহ প্রথার রদ হওয়ার ফলে যে বিধবারা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন, তাদের সমাজ ও সংসারের চোখে সসম্মানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা যদি লর্ডউইলিয়াম বেন্টিংক ও তার সরকারের দ্বারা সম্ভব হত তবে এই আইনের উদ্দেশ্য ও ফলাফল যথার্থই সুফলদায়ী হত। আজ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে অসহায় বিধবারা অন্তরালবর্তী হয়ে অতিশয় কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন।'[১০]

বিদ্যাসাগর বিধবাদের এই অসহায় নিদারুণ যন্ত্রণার শরিক হয়েছিলেন বলেই প্রথমে 'সর্বশুভকরী' পত্রিকায় 'বাল্য বিবাহের দোষ' প্রসঙ্গে লিখলেন— 'পতি বিয়োগ দুঃখের সহ সকল দুঃসহ দুঃখের সমাগম হয় উপবাস দিবসে পিপাসা নিবন্ধে কিংবা সাংঘাতিক রোগানুবন্ধে যদি তাহার প্রাণাপচয় হইয়া যায় তথাপি নির্দ্দয় বিধি তাহার নিঃশেষ নিরস রসনাগ্রে গন্ডুষমাত্র বারি বা ঔষধদানেরও অনুমতি দেন না।'[১১] ফলে সমাজ থেকে এই অভিশাপ নির্মূল করতে হলে, যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সমাজপতিগণ বিধবাদের নরককুন্ডে নিক্ষেপ করছে, সে শাস্ত্রের বিধানেই যে এর প্রতিকারের কথা আছে তা সমাজ সমক্ষে গোচর করার দায়িত্ব বিদ্যাসাগর নিলেন। ইতোপূর্বে ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায় 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকায় ১৮৪২ সাল থেকে বিধবা বিবাহের সপক্ষে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যাসাগর কয়েকমাস দিবারাত্র শাস্ত্রপাঠের মাধ্যমে সমাজের সামনে উক্ত বিধবা

বিবাহের বিধান গোচরীভূত করলেন। ১৮৫৫ সালের কার্তিক মাসে বঙ্গভাষায় অনুবাদ সহ 'বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা' পুস্তক প্রচার করেন। 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিৎ কিনা' এই প্রস্তাবে সমগ্র ভারত জুড়ে আন্দোলন আলোচনা চলতে লাগল। কেউ কেউ বিদ্যাসাগরকে কুৎসিৎ গালাগালিও দিলেন, কিন্তু পুরাকালে বিধবা বিবাহ চালু ছিল। শাস্ত্রের কথা 'পরাসর সংহিতা' থেকে উদ্ধৃত করে বিদ্যাসাগর বললেন—

'গতে মৃত প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে।'
(যদি চিনি যদি জানিবারে পাই— শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থ মিত্র)

অর্থাৎ 'Women are ar liberty true marry again if their husbands be not heard of, die retired from the world, proof to be eunuchs of become patitas.' (Bengal Spectator 1842)

ধর্মশাস্ত্রের বিচার দিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সেকালের তাবড় তাবড় ধর্মবেত্তার সঙ্গে সমালোচনার ধর্ম যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের জয় হয়েছিল। প্রায় দুই সহস্র লোকের স্বাক্ষর সম্বলিত বিধবা বিবাহের সপক্ষের আবেদন বিদ্যাসাগর মহাশয় জমা করলেন— হোম ডিপার্টমেন্টের স্যার সিসিলি বীডন সাহেবের কাছে এবং সুপ্রীম কাউন্সিলর মেম্বার হেলিডে সাহেবের কাছে। অন্যদিকে রাধাকান্ত দেবের মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ ১৮৫৬ সালের ১৭ই মার্চ বিধবা বিবাহের আইন যাতে না পাশ হয় সেজন্য প্রায় ৩৩০০ জনের স্বাক্ষর সহ আবেদন পত্র জমা করেন। শেষ পর্যন্ত গ্র্যান্ড সাহেবের সহায়তায় ১৮৫৬ সালের ১৩ই জুলাই 'বিধবা বিবাহ' আইন পাশ হল। যা '১৮৫৬ সালের ১৫ই আইন' নামে প্রসিদ্ধ হল। বিদ্যাসাগরের নামে সমস্ত বাংলা তথা ভারতবর্ষে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। বিদ্যাসাগরের নামে গান রচিত হল 'বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে।'

গৃহস্থে, নগরে, গ্রামে বিদ্যাসাগরের নামে বিজয় ধ্বনি ঘোষিত হল। বিধবাগন পুনরায় সংসার জীবনের স্বপ্ন দেখে বিদ্যাসাগরকে আশীর্বাদ দান করলেন। শুধু আইন প্রণয়নই নয়— ১২৬৩ বঙ্গাব্দের ২৪শে অগ্রহায়ণ সর্বপ্রথম মহা সমারোহে কলকাতার সুকিয়া স্ট্রীটে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে বিধবা কালিমতী দেবীর বিবাহ সম্পন্ন হয়। কিশোরী চাঁদ মিত্রের মতে— 'আমাদের দেশে ইতিবৃত্তে নবযুগের প্রারম্ভ।' (যদি চিনি যদি জানিবারে পাই)। ১২৬৩ সালে ২৫শে অগ্রহায়ণ মাসে নদীয়ার কৃষ্ণমোহন বিশ্বাসের সঙ্গে কলকাতার ঈশানচন্দ্র মিত্রের বিধবা কন্যা থাকমনি দাসীর বিবাহ হয়, ঐ সালেই রামসুন্দর ঘোষের বিধবা কন্যা গোবিন্দমনি দাসীর সঙ্গে ২৪ পরগনার দুর্গানারায়ণ বসুর বিবাহ এবং পর পর বিধবাদের

বিবাহে সমাজে বৈধব্যের মরাগাঙ্গে বিদ্যাসাগর জীবনের জয়তরী ভাসিয়ে দিলেন।

আজ এই আন্দোলনের কথাগুলো দু-শত বছর পরে আমরা গল্পের মতো হয়তো শুনে তৃপ্ত হচ্ছি, কিন্তু বিদ্যাসাগর কে এই কঠিন পথ বহু প্রতিকূলতা প্রতিবন্ধকতা জয় করে করতে হয়েছে। সাহিত্যের ছাত্র মাত্রই জানেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই বিধবা বিবাহ প্রবর্তন নীতিবাগীশ বঙ্কিমচন্দ্র-ও সমর্থন করেন নি। 'বিষবৃক্ষে' বলেছিলেন— 'ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে নাকি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবা বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা করে দেয়, সে যদি পন্ডিত হয়, তবে মূর্খ কে ?"[১২] কিন্তু বিদ্যাসাগরের অদম্য সাহস ও চরিত্রের অনমনীয় দৃঢ়তার কাছে সব প্রতিবন্ধকতা দূর হয়। আজ একবিংশ শতাব্দীতে বসে ভাবতে অবাক লাগে বিদ্যাসাগর একক মহীমায় সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা, সংস্কৃতি, নারী প্রগতি, বিধবা বিবাহ ইত্যাদি ভারতীয় সমাজ আন্দোলন কে শুধু নিয়ন্ত্রণই করেন নি সমাজ মনে জ্ঞানের ও প্রেমের সঠিক দিশা দেখিয়ে ছিলেন। বাঙ্গালি জাতি যতদিন থাকবে বিদ্যাসাগরের অবদান উত্তরোত্তর কালে আরো প্রাসঙ্গিক ভাবে প্রতীয়মান হবে। কিন্তু মূঢ় অশিক্ষিত বর্বর লোক সমাজে তখনো ছিল, যারা বিদ্যাসাগরের গায়ে কালিমা লেপন করতে সদা সচেষ্ট ছিলেন। আজও তাদের দেখা যায় একই কর্মে লিপ্ত হতে। না হলে মেট্রোপলিটন ইনশট্টিউশন যা বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙালি দরিদ্র ছাত্রদের জন্য নিজ হাতে গড়ে তুলেছিলেন, তাদের স্বাধীনভাবে উচ্চ শিক্ষা ও ইংরাজি শিক্ষা দানের জন্য, যাতে সমাজের আবিলতা দূর হয়। ন্যায় শিক্ষায় সমাজকে এই প্রতিষ্ঠানে তিনি বর্ণপরিচয় দান করেছিলেন; ঐ প্রতিষ্ঠান যা আজ 'বিদ্যাসাগর কলেজ' নামে প্রসিদ্ধ, সেই কলেজেই সম্প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ভুলুণ্ঠিত হতে হয়েছে কিছু হীন, ক্ষুদ্রমতী, রাজনৈতিক ব্যবসায়ীর হাতে। এর থেকে বাঙালি জাতির বড় অভিশাপ আর কি হতে পারে ? সমস্ত বাঙালি জাতির আজ লজ্জায় মরমে অবনত হওয়া উচিৎ ঐ মহামানবের পদতলে। তবেই হয়তো ঐ চরম পাপের খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে। আমাদের বিশ্বাস তাদের অসৎ উদ্দেশ্য অচিরেই নষ্ট হবে। বিদ্যাসাগর আমাদের অন্তরে ও শিরোপরে সর্বদা থাকুন, আমরা ওনার কীর্তি শুনে ও বলে যদি সমাজের আঙ্গিনায় কোনো মুক্ত বায়ু প্রবাহিত করতে পারি তবে আমাদের জীবন ধন্য হবে।

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার দু-এক পংক্তি দিয়ে আমার 'সাগর তর্পন' এখানে সমাপ্ত করি।

'তেমন মানুষ না পাই যদি খুঁজব তবে হায়
ধুলায় ধূসর বাঁকা চটি ছিল যা ওই পায়

সেই যে চটি উচ্চে যাহা উঠত এক এক বার
শিক্ষা দিতে অহংকৃতে শিষ্ট ব্যবহার।

শাস্ত্রে যারা শাস্ত্র গড়ে হৃদয় বিদারণ
তর্ক যাদের অর্কফলার তুমুল আন্দোলন
বিচার যাদের যুক্তিবিহীন অক্ষরে নির্ভর
সাগরের এই চটি তারা দেখুক নিরন্তর।
দেখুক এবং স্মরণ করুক সব্যসাচীর রণ
স্মরণ করুক বিধবাদের দুঃখ মোচন পণ
স্মরণ করুক পান্ডা রূপী গুন্ডাদিগের হাত
বাপ মা বিনা দেবতা সাগর মানেই নাকো আর।

অদ্বিতীয় বিদ্যাসাগর মৃত্যু বিজয় নাম
ঐ নামে হায় লোক করেছে অনেক ব্যর্থ কাম।'[১৩]

অনুসরণে

১. বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও অমনিবাস— শম্ভু চন্দ্র বিদ্যারত্ন— চিরায়ত প্রকাশন, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ.১৯
২. তদেব, পৃ. ৭
৩. তদেব, পৃ. ১৭
৪. বিদ্যাসাগর চরিত— চারিত্র পূজা, রবীন্দ্র রচনাবলী, একাদশ খন্ড, অগাষ্ট, ১৯৮৯
৫. করুণা সাগর বিদ্যা সাগর— ইন্দ্র পূজা, আনন্দ, অক্টোবর ২০০৯, পৃ. ২৮
৬. বিদ্যাসাগর চরিত— চারিত্র পূজা, রবীন্দ্র রচনাবলী, একাদশ খন্ড, অগাষ্ট, ১৯৮৯
৭. যদি চিনি যদি জানিবারে পাই— শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থ মিত্র, ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ৩০৮
৮. বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও অমনিবাস— শম্ভু চন্দ্র বিদ্যারত্ন, চিরায়ত প্রকাশন, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ৪৫
৯. যদি চিনি যদি জানিবারে পাই— শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থ মিত্র, ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ৩০৯
১০. তদেব, পৃ. ৩০৮

১১. বিষবৃক্ষ— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম উপন্যাস সমগ্র, সম্পাদক কাঞ্চন বসু, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কল-৯
১২. কাব্য সঞ্চয়ন— সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স, ১৯৬০, পৃ. ২৫-২৬

সহায়ক গ্রন্থ

১. বিদ্যাসাগর রচনাবলী— ১ ও ২, কালিকলম, সম্পাদনা, তীর্থপতি কর, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪
২. সেকাল আর একাল— রাজনারায়ণ বসু, চিরায়ত প্রকাশন, কল-৭৩, জানুয়ারি ২০০৮
৩. উনিশ শতকের বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতি— স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, পুস্তক বিপণী, নভেম্বর ২০০৩
৪. উনিশ শতকের বাংলা— সম্পাদন অলোক রায়, গৌতম নিয়োগী, পারুল প্রকাশনী, ২০১৩
৫. সেই প্রথম পুরুষ— নীলকণ্ঠ ঘোষাল, প্রতিভাস, জানুয়ারী ২০১১
৬. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, নিউএজ-১৯৮৩

ইতিহাসের ছায়ায় সাহিত্যের কায়া

ড. নিবেদিতা দিন্দা

বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রবন্ধে আক্ষেপ করে বলেছিলেন— "সাহেবরা যদি পাখি মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই।"[১] সেই সঙ্গে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেছেন— "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে ? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালি তাহাকে লিখিতে হইবে।"[২] মানভূম-পুরুলিয়া সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। এই অঞ্চলের ইতিহাস তেমনভাবে লেখা হয় নি। বাংলা, বিহার, ওড়িশার মানচিত্রে তার নানা পর্বের ইতিহাস সন্ধান করতে হয়। অতীতের গভীরে ইতিহাসের শিকড় প্রোথিত থাকে। সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় মানভূমি-পুরুলিয়ার অতীত ইতিহাসের ছায়ায় সাহিত্যের কায়া সৃষ্টি হয়েছে। 'ইতিহাসের ছায়ায় সাহিত্যের কায়া' প্রবন্ধটিতে সেই প্রসঙ্গই তুলে ধরা হয়েছে।

ছোটনাগপুর পুরাভূমির অন্তর্গত মানভূম-পুরুলিয়া অঞ্চল। তাই তার ইতিহাসও অতি প্রাচীন। প্রাচীনকাল থেকেই 'রাধা', 'বজ্রভূমি', 'শিখরভূম', 'মান্দারণ' ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল এই অঞ্চল। নামের সাথে জড়িয়ে রয়েছে নানা ইতিহাস। সাহিত্যের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে সেই ইতিহাস।

আবুল ফজল রচিত 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থ থেকে জানা যায় বঙ্গদেশের ১৯টি সরকারের মধ্যে 'মান্দারণ' ছিল অন্যতম। আকবরের রাজত্বকালে এই অঞ্চল বঙ্গদেশের 'মান্দারণ' সরকারের অন্তর্গত ছিল। সদর দপ্তর ছিল তাম্রলিপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসেও গড় মান্দারণ প্রসঙ্গ রয়েছে।

'শিখরভূম' নামটির প্রসঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায় গোপীজনবল্লভ দাস প্রণীত 'রসিকমঙ্গল' গ্রন্থটিতে। সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গ্রন্থটি রচিত। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক রসিক মুরারির শিক্ষাগুরু ছিলেন গোপীজনবল্লভ। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের জন্য রসিকানন্দ শিখরভূমে এসে উপস্থিত হন। শিখরভূমের রাজধানী ছিল পঞ্চকোট। তিনি পঞ্চকোট রাজার আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেই প্রসঙ্গই 'রসিকমঙ্গল'

কাব্যে উল্লেখ করেছেন—

'তথা হৈতে প্রভু গেলা শিখরভূমিতে।
উতরিলা গিয়া প্রভু রাজার বাড়িতে।
সগোষ্ঠী সহিতে রাজা আনন্দিতা হৈলা।
দ্বিতীয় নারায়ণ সম প্রভুরে পূজিলা।।'

তিনিই প্রথম বাঙালি কবি যিনি বাংলা সাহিত্যে শিখরভূমের ইতিহাস উপস্থাপিত করেছেন।

মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশম' কাব্যে 'কপিশা' নদীর উল্লেখ রয়েছে। 'কপিশা' নদীটিই পুরুলিয়ার অন্যতম নদী কাঁসাই। বাংলার রাজাকে পরাজিত করে রাজা রঘু ওড়িশা প্রত্যাবর্তনকালে কাঁসাই নদী অতিক্রম করেছিলেন। অনেকগুলি হাতিকে পরপর সাজিয়ে সেতু নির্মাণ করেন। সৈন্য নিয়ে সেতুর ওপর দিয়ে নদী পার হয়েছিলেন। সেই ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়—

'সা তীর্ত্বা কপিশাং সৈন্যৈর্বদ্ধদ্বিরদনসেতুভিঃ।
উৎকলাদর্শিত পথঃ কলিঙ্গামুখো য়য়ৌ।।' ৪-৩৮।। ('রঘুবংশ', ৪র্থ সর্গ)

একাদশ শতাব্দীতে তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র রামপাল সৈন্য সংগ্রহ করতে তৈলকম্পের রাজা রুদ্রশিখরের কাছে এসেছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্যে তারই ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। দামোদরে নিমজ্জিত হওয়ার পূর্বে প্রাচীন তৈলকম্পের মন্দির, স্থাপত্যগুলির ইতিহাস দেবলা মিত্র 'Telkupi' নামক পুস্তিকাটিতে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে।

যোড়শ শতাব্দীতে যুগপুরুষ চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর তীর্থ পর্যটনে বেরিয়েছিলেন। পুরী থেকে মথুরা যাওয়ার সময় এই অঞ্চলের ওপর দিয়ে গিয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে ঝারিখণ্ড-জঙ্গলমহলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল এই অঞ্চল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে 'ঝারিখণ্ড' স্থানের উল্লেখ রয়েছে। চৈতন্য জীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে খুব সুন্দরভাবে সেই বিষয়টি তুলে ধরেছেন—

"মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড।
ভিল্লপ্রয় লোক তাহা পরম পাষণ্ড।।
নাম প্রেম দিয়া কৈল সবারে নিস্তার
চৈতন্যের গূঢ়লীলা বুঝিতে শক্তি কার।।"[৩]

ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে মল্লরাজ বীর হাম্বির বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। তার প্রভাবে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষেরা বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।

"ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত
কৃষ্ণ নাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত।
যেই গ্রাম দিয়া যান যাহা করেন স্থিতি
সেই গ্রামের লোকের হয় প্রেম ভক্তি।।"[৪]

১৬৫০-৬০ খ্রিস্টাব্দে রূপরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে উল্লেখ করেছেন উড়িষ্যার গজপতি রাজারা এই এলাকা নিয়ন্ত্রণ করত। ১৭৪২/১৭৪৩ সালে বর্গিরা বাংলা আক্রমণ করেছিল। তাদের আকস্মিক হানায় বাংলার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ডোম, বাগদি ইত্যাদি অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ তাদের সাথে প্রত্যক্ষ লড়াইতে লিপ্ত হয়। যুদ্ধ, পলায়ন, অনুসরণ, প্রতিরোধ— সমস্তই হয়েছিল এই মাটিতে। দ্বিজগঙ্গারাম দেব 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' গ্রন্থে সেই ইতিহাস ব্যক্ত করেছেন—

'গ্রাম উপবন যত লস্কর এড়াএ যত
নাগপুর আসি উপনিত।
সেখানে ছাড়িয়া যবে লস্কর যাইলা তলে
পঞ্চকোটে আসিলা ত্বরিত।'
(ভাস্কর পরাভব, ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে)।

সীমান্তবঙ্গের ভূস্বামীরাই এই প্রত্যন্ত ভূম অঞ্চলগুলি শাসন করতেন। তারা নিজেদেরকে 'রাজা' বলে পরিচয় দিতেন। রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় কেউ কেউ সাহিত্য রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। গড়জয়পুর, বেগুনকোদর, বাঘমুন্ডি ইত্যাদি অঞ্চলের ভূস্বামীদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৈষ্ণব সাহিত্য রচিত হয়েছিল। ঝুমুর গানের প্রতি পাতকুম ও বাঘমুণ্ডি রাজাদের গভীর অনুরাগ ছিল। প্রচলিত ঝুমুর গানগুলি সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পরিমণ্ডলের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

ঝালদার রাজপরিবারের উৎসাহে গোবিন্দচন্দ্র 'নটবর চরিত' নাটকটি রচনা করেন। ঝালদার রাজা নটবর সিং-এর জীবন কাহিনিই নাটকটির উপজীব্য বিষয়। নাটকটি প্রায় অভিনীত হতো। পঞ্চকোটের রাজপুরোহিত রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী 'জগদ্দেও' এবং 'পঞ্চকোট প্রতিষ্ঠা' নামক দুটি নাটক রচনা করেন। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে (১৩৩৯ বঙ্গাব্দে) পঞ্চকোট রাজবংশের সম্পূর্ণ ইতিহাস নিয়ে রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী একটি গ্রন্থ রচনা করেন 'পঞ্চকোটের ইতিহাস'। এই তিন গ্রন্থ থেকে মানভূমের সুপ্রাচীন রাজবংশ পঞ্চকোটের ইতিহাস

বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রখ্যাত ইতিহাসকার নিখিলনাথ রায়ের গ্রন্থ 'ইতিকথা' এবং পঞ্চকোটের রাজপুরোহিত বিদ্যারত্ন রাখালচন্দ্র চক্রবর্তীর 'পঞ্চকোটের ইতিহাস' গ্রন্থ দুটি ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য আকরগ্রন্থ।

পঞ্চকোটের রাজপরিবার সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিল। জ্যোতিপ্রসাদ সিংদেও নাট্যচর্চা, সঙ্গীতচর্চা, শাস্ত্রীয় সাধনায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। গুণিব্যক্তিদের সম্বর্ধনার জন্য তিনি 'সারস্বত সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা নীলমণি সিং দেও।

সাহিত্যে পুরুলিয়াকে অমরত্ব দান করেছেন যিনি তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। একটি মামলার কাজে তিনি পুরুলিয়ায় এসেছিলেন। পুরুলিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে 'পুরুলিয়া' সনেট রচনা করেন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিং দেওর আমন্ত্রণে মাইকেল মধুসূদন দত্ত পুনরায় পঞ্চকোটের রাজধানী কাশীপুর আসেন। পঞ্চকোটের প্রাচীন রাজধানী পরিদর্শন করেন। অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য বহনকারী পঞ্চকোট পাহাড়, প্রাচীন মন্দির, ভগ্নপ্রায় দেওয়াল কবিকে কবিতা লেখার অনুপ্রেরণা দিয়েছিল—

'কাটিলা মহেন্দ্র মর্ত্ত্যে বজ্র প্রহরণে
পর্ব্বতকুলের পাখা; কিন্তু হীনগতি
সে জন্য নহ হে তুমি, জানি আমি মনে,
পঞ্চকোট!'

পঞ্চকোটের প্রাচীন ভৈভব সমৃদ্ধি ভূলুণ্ঠিত দেখে কবি ব্যথিত হৃদয়ে লেখেন—

'কোথায় রাজলক্ষ্মী, যাঁর স্বর্ণ-জ্যোতি
উজ্জ্বলিত মুখ তব ? যথা অস্তাচলে
দিনান্তে ভানুর কান্তি! তেয়াগি তোমারে
গিয়াছেন দূরে দেবী, তেঁই হে! এ স্থলে
মনোদুঃখে মৌনভাব তোমার; কে পারে
বুঝিতে, কি শোকানল ও হৃদয়ে জ্বলে ?
মণিহারা ফণী তুমি রয়েছ আঁধারে।'[৫]

'পঞ্চকোট গিরি', 'পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী', 'পঞ্চকোট গিরি বিদায় সঙ্গীত' ইত্যাদি সনেটগুলির মধ্য দিয়ে এভাবেই পুরুলিয়া এবং পঞ্চকোট বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে মানভূমের

মাটি। সেই ইতিহাসকে আশ্রয় করে সাহিত্যিকরা সাহিত্যের কায়া সৃষ্টি করেছেন। সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মানভূমসহ ছোটনাগপুরের পটভূমিতে গল্প রচনা করেছেন। বাংলার মন্বন্তরের করুণ দৃশ্য তাঁর লেখনীতে উঠে এসেছে। শবরমাতা মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসের পটভূমিতেও উঠে এসেছে ছোটনাগপুর অঞ্চলের আদিবাসীদের বিভিন্ন বিদ্রোহের ইতিহাস— চুয়াড় বিদ্রোহ, মুণ্ডা বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ ইত্যাদি। ভৌগোলিক সীমার দ্বারা এই অঞ্চলের ইতিহাস পরিমাপ করা সম্ভব নয়। বার বার এই অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা বদল হয়েছে। অশোক চৌধুরী, শূদ্রক, সনজিৎ গোস্বামী, সুধীরকুমার করণ প্রমুখ লেখকদের লেখনীতে উঠে এসেছে ইতিহাস।

সিধু কানুর নেতৃত্বে হুল বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল কাঞ্চন মুর্মু। লাখ লাখ সাঁওতালের তলোয়ার ঝলসে উঠেছিল দিকুদের মাথায়। আজও সেই স্মৃতি কাঞ্চনকে তাড়া করে বেড়ায়। সাঁওতাল বিদ্রোহে ব্যবহারকারী তলোয়ার হাতে নিলেই সে অন্য মানুষ হয়ে যায়। বাহা পরবে মেলার মাঠে সে ছুটে বেড়ায় হুল করবার জন্য। তার "মনে হয় হাজার হাজার সাঁওতাল জমেছে হুলের টাঁড়ে। হাতে তাদের ঢাল-তলোয়ার, তীর-ধনুক, টাঙ্গি-বল্লম। দিকু খতম কর— চারদিকে এই আওয়াজ শুনি।"[৬]

শূদ্রক তাঁর 'হুল' গল্পে এভাবেই সাঁওতাল বিদ্রোহের বিষয়কে পরিবেশন করেছেন। সনজিৎ গোস্বামীর 'লছু শবরের দিনরাত্রি' গল্পটির পটভূমিতে রয়েছে স্বাধীনতা আন্দোলন প্রসঙ্গ। ব্রিটিশরা শবর-খেড়িয়াদের বশ করতে না পেরে অপরাধপ্রবণ জাতি হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। তাদের ওপর অত্যাচার চালাত। একদিন লছুদের গ্রামে এসে পড়ে স্বাধীনতা সংগ্রামী কান্তি ঘোষাল। পায়ে গুলি লেগে জখম। লছু শবর তাকে নিজের বাড়িতে সেবা করে সুস্থ করে তোলে। বিপ্লবী কান্তি শবরদের মনেও স্বাধীনতা স্পৃহা জাগিয়ে তোলে। তারাও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। আর পড়ে পড়ে মার খাবে না। ব্রিটিশদেরকে তাড়াতেই হবে। পুরুলিয়ায় এসে হাজির হন সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁর বক্তৃতা শুনে উদ্বুদ্ধ হয়ে লছু শবর বলে ওঠে— 'আমরা গেলছিলি। মিটিং শুনলি। তখন মনে হচ্ছিল শালার বিরটিশকে পালে একই কাঁড়ে কলজাটা ফাঁক করে দিব।'[৭] সুভাষ বোসের যুদ্ধে নাম লেখাতে চায় তারা। মানবাজারের শবর পাড়ায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। স্বাধীনতা সংগ্রামী কান্তি ঘোষালের নেতৃত্বে মানবাজার পুরুলিয়া বাস রাস্তায় তিনটা পুল ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয় শবররা। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির পরেই শবরদের কাঁড়, ধনুকের সাথে বন্দুকের লড়াই শুরু হয়ে যায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত সে লড়াই চলে। কান্তিবাবু গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেলে শবররা পিছু হটে। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। শবরদের ঘরগুলোতে ব্রিটিশরা আগুন জ্বেলে দেয়।

অশোক চৌধুরীর 'বিপ্লবের শিকা' এক অনবদ্য উপন্যাস। স্বাধীনতা সংগ্রামকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি রচিত। ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রথম সংঘাত এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ড. সুধীর কুমার করণ-এর 'অরণ্য পুরুষ', 'উলুগুলান' রচনা তারই সাক্ষ্য বহন করছে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে পুরুলিয়া মিউজিক্যাল ইনস্টিটিউট-এর অবদান উল্লেখযোগ্য। এই সাংস্কৃতিক সংস্থা বিভিন্ন নাট্য প্রযোজনার মধ্য দিয়ে মানুষের মনে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলেছিল।

বিশ শতকের পুরুলিয়ার ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ আকরগ্রন্থ হল স্বামী অসীমানন্দের আত্মজীবনী 'আমার জীবন।' ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে অখণ্ড ভাবে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি বিশ শতকের পুরুলিয়ার ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ আকরগ্রন্থ।

ভজহরি মাহাত ও পদকচন্দ্র মাহাতর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় স্বাধীনতা আন্দোলনের কাহিনি 'রক্তে রাঙা মানভূম।' লোকসেবক সঙ্ঘের অনুগামীদের দ্বারা লিখিত। পূর্বতন মানভূম জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামী জগবন্ধু ভট্টাচার্য জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম প্রকাশিত পূর্ণ দলিল 'বীর বিভূতি' (১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ) গ্রন্থটি। স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মানভূমের জেল বন্দীদের কাহিনি নিয়ে বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত উপন্যাস সদৃশ 'সেই মহাবরষার রাঙাজল' (১৯৭৪) গ্রন্থটি রচনা করেন। তরুণ বিপ্লবী বৈকুণ্ঠ শুকুল জেলে বন্দী। ফাঁসিকাঠে আত্মবলিদান দিয়ে শহীদ হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বের রাত্রির অত্যন্ত মর্মস্পর্শী কাহিনি পড়লে পাঠকের চোখ অশ্রু সজল হয়ে ওঠে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ-এর ভাগ্নি সাহানা দেবী 'স্মৃতির খেলা' (১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ) নামক আত্মজীবনী লেখেন। বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নের পুরুলিয়ার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে গ্রন্থটিতে।

মানভূমের আঞ্চলিক পটভূমিতে রচিত হয়েছে সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া' উপন্যাসটি। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই করে মানভূমের জন্ম। সেই মানভূমের বুকে ছোট গ্রাম মধুকুপি। 'কর্মঠ ভূমিজ জীবনের ছোট্ট একটি উপনিবেশ এই মধুকুপি।'[৮] উপন্যাসে মধুকুপির পটভূমি, যুগ পরিবর্তনের সাথে বিবর্তিত হয়েছে। খ্রিস্টান মিশনারীদের খ্রিস্ট ধর্মের প্রচার এবং যন্ত্র সভ্যতা গ্রামীণ জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। গ্রাম নির্ভর কৃষক সমাজ ভেঙে কয়লা খাদানের শ্রমিক হওয়ার ইতিহাস ব্যক্ত হয়েছে। সেই সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাস ব্যক্ত হয়েছে। নতুন মাদল কিনবে করম নাচ নাচবে।

পুরুলিয়াকে কেন্দ্র করে সীমান্তবর্তী ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সীমান্ত বাংলার ঐতিহাসিক নানা তথ্য ড. সুধীর কুমার করণ পরিবেশন করেছেন তাঁর 'সীমান্ত বাংলার লোকযান' গ্রন্থটিতে। সীমান্ত বাংলার বিভিন্ন ইতিহাস পরিবেশনের পাশাপাশি এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির বিষয়গুলিও লেখক সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। লোকপরব, লোককথা, লোকগান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলটির বিশিষ্টতা ফুটিয়ে তুলেছেন। মুণ্ডা জাতির ঐতিহাসিক সামাজিক পটভূমিতে রচনা করলেন সুধীর কুমার করণ 'উলুগুলান' নামক এক ঐতিহাসিক উপন্যাস। পুরুলিয়ার ইতিহাস এবং সম সাময়িক জনজীবন নিয়ে লেখা গল্পগুলোর মধ্যে গঙ্গানারায়ণী সেনা, অবসাদ, ভাটাই জোড়ের বন্যা, শ্মশানবন্ধু উল্লেখযোগ্য।

কথা সাহিত্যের পাশাপাশি কাব্য সাহিত্যেও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসের ছবি ফুটে উঠেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ঋষি নিবারণ দাশগুপ্তের 'মুক্তি' এবং অন্নদা প্রসাদ চক্রবর্তীর 'সংগঠন' পত্রিকার ভূমিকা ছিল অপরিসীম। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। এই পত্রিকা দুটিতে জেলার সংবাদ ছাড়া কাব্য-সাহিত্য, প্রবন্ধ ও প্রকাশিত হতো। 'মুক্তি' পত্রিকার ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যায় ১৯২৬ চারণ কবি মুকুন্দ দাসের গানের সঙ্গে 'অন্নদা প্রসাদ চক্রবর্তীর 'তারুণ্যের অভিযান' কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

'ভারতের মুক্তিপথে যাত্রা মোরা করিয়াছি শুধু,
অমৃত অলিতে চাই, জিনিয়া মরণ;
এস তুমি কালঝঞ্ঝা, এস বজ্র, গর্জি গুরুগুরু
এস মৃত্যু, হাসিমুখে করিব বরণ।'

'হামরাকে ছিনাই নিতে হবেক' কবিতায় যুগ যুগ ধরে আদিবাসী সমাজের বঞ্চনার ইতিহাস ধরা পড়েছে চিত্তরঞ্জন পাঠকের কবিতায়।

"বাহা রে, ব্যাটা ছোয়া সিধো কানহু,
হঁ বাপ লড়েছিলিস তরা। তাথেও
হামদের কপালে জমি নাই ঘুরলেক।
কেহু বলছে ঝাড়খণ্ড কেহু গোর্খাল্যাণ্ড-উয়াতেই
কী নসিব পালটিবেক ? বিটিশ যাঁয়েছে
ত কি হঁয়েছে ? পুঁজীর মালিক ত সেই লুটে লিছে সবই।
ভেকগুলাকে চিনহে লিতে হবেক।
হামরাকে ছিনাই লিতে হবেক।"[৯]

১৯৪৭ সালের পর অর্থাৎ স্বাধীনোত্তর যুগে মানভূমে দেখা দিল ভাষাগত দ্বন্দ্ব। বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষার মর্যাদা দিতে এবং ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবিতে শুরু হয় তীব্র আন্দোলন। এই ঐতিহাসিক আন্দোলনকে জোরদার করেছে টুসুগান।

'শুন বিহারি ভাই
তোরা রাখতে নারবি ডাঙ দেখাই।
তোরা আপন তরে ভেদ বাড়ালি
বাংলা ভাষায় দিলি ছাই।
ভাইকে ভুলে করলি বড়
বাংলা-বিহার বুদ্ধিটাই।।'

কবি কৃষ্ণপদ ভট্টাচার্য অতুল কৃষ্ণ গাঙ্গুলী, সুনীতিকুমার পাঠক, শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবি লেখকরাও কলম ধরেছিলেন জনগণের এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য। এরই ফলশ্রুতি তাঁদের সৃজনশীলতায় কাব্য-সাহিত্য জগৎ হয়েছে সমৃদ্ধ। বিশেষত পত্র সাহিত্য গুলিই বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

সুবোধ বসু রায় সম্পাদিত 'ছত্রাক' পত্রিকার আবির্ভাব এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিভিন্ন বিষয় তাঁর পত্রিকায় পরিবেশিত হতো। এই পত্রিকায় মানভূম-পুরুলিয়ার গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, ইতিহাস, পুরাকীর্তি ইত্যাদির সমাবেশ ঘটল।

'মুক্তি' পত্রিকায় রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেব লিখেছিলেন—
"বহুমানে আজ মানভূমে মোরা
এই শুভদিনে নিলাম বরি।
ধন্য হলেন জননী আবার
হারানো তনয় বক্ষে ধরি।
জয় গৌরবে এসেছে ফিরিয়া।
সন্তান তাঁর আপন গেহে
ছিন্ন অঙ্গ দেশমাতৃকা।
দেখা দিল পুনঃ পূর্ণ দেহে।"

বিভিন্ন সাহিত্যের ধারায় এভাবেই মানভূম-পুরুলিয়ার নানা ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এই অঞ্চলের সামগ্রিক রূপ বৈচিত্র্যের সংহত রূপ আজও অপ্রতুল। মানভূম-পুরুলিয়ার অতীত ইতিহাসের ছায়ায় এভাবেই গড়ে উঠেছে সাহিত্যের কায়া। সেই সাহিত্য ধীরে ধীরে পল্লবিত, কুসুমিত আর রূপ, রস, সুগন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র

১. 'বাঙ্গালার ইতিহাস', 'বঙ্কিম রচনাবলী' (২য় খণ্ড), যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, ১ম প্রকাশ ১৩৬১, পৃ-২৮৫
২. 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', 'বঙ্কিম রচনাবলী' (২য় খণ্ড), যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, ১ম প্রকাশ ১৩৬১, পৃ-২৯১
৩. 'চৈতন্য চরিতামৃত', মধ্যলীলা, ১৭ পরিচ্ছেদ, সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমি, ১ম সংস্করণ ১৯৬৩, পৃ.-১২০
৪. 'চৈতন্য চরিতামৃত', মধ্যলীলা, ১৭ পরিচ্ছেদ, সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমি, ১ম সংস্করণ ১৯৬৩, পৃ.-১২০
৫. 'পঞ্চকোট গিরি', 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী', দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত, পৃ.-৩২৪
৬. 'ছত্রাক' শারদীয়া সংখ্যা, সুবোধ বসু রায় সম্পাদিত, ১৩৯৮, পৃ.-৯৭
৭. 'ছত্রাক' শারদ সাহিত্য বিশেষ সংখ্যা, সুবোধ বসু রায় সম্পাদিত, ১৪০৬, পৃ.-৯১
৮. 'শতকিয়া', সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র (৩), সমীর কুমার নাথ সম্পাদিত, ১৯৯৮, পৃ.-১১৮
৯. 'ছত্রাক' পত্রিকা, সুবোধ বসু রায় সম্পাদিত, অষ্টাদশ বর্ষ, ১৩৯৪, পৃ,-৮

সহায়ক গ্রন্থ

১. তরুণদেব ভট্টাচার্য: 'পুরুলিয়া' ফার্মা কে. এল. এম, কলকাতা, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ২০০০
২. দিলীপ কুমার গোস্বামী: 'মানভূমে মাইকেল', পারিজাত প্রকাশনী, পুরুলিয়া, ১ম প্রকাশ ২০১৩
৩. দিলীপ কুমার গোস্বামী: 'প্রবন্ধ কুসুমাঞ্জলি', বজ্রভূমি প্রকাশনী, পুরুলিয়া, ১ম প্রকাশ ২০১০
৪. দেবপ্রসাদ জানা সম্পাদিত: 'অহল্যাভূমি পুরুলিয়া' (১-৩) পর্ব, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৩
৫. নীহাররঞ্জন রায়: 'বাঙ্গালির ইতিহাস (আদি পর্ব)', দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৪০০
৬. পশুপতিপ্রসাদ মাহাতো : 'জঙ্গলমহল ও ঝাড়খণ্ডী লোকদর্শন', কলকাতা, ১ম প্রকাশ ১০০৪
৭. প্রবীর সরকার: 'পুরুলিয়ার সাহিত্য-সংস্কৃতিঃ রাজন্য অবদান', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ২০০৮
৮. মৃণালকান্তি মণ্ডল: 'পুরুলিয়ার জেলার তথ্য ও পরিচয়', সুদর্শন প্রকাশন, নদীয়া, প্রথম প্রকাশ ২০১৫

৯. রুমা বন্দ্যোপাধ্যায় : 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ২০০৫

১০. সুধীর কুমার করণ : 'সীমান্ত বাংলার লোকযান', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০২

১১. সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : 'জঙ্গলমহলের জনজীবন ও লোকসংস্কৃতি', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২য় সংস্করণ ২০১২

১২. সমীর কুমার নাথ সম্পাদিত : 'সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র (৩)', নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮

পত্র-পত্রিকা

১. 'অনৃজু' : সম্পাদক সুভাষ রায়, বর্ণালী, কলকাতা, ২০১০

২. পশ্চিমবঙ্গ (পুরুলিয়া জেলা সংখ্যা), তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৭

৩. 'ছত্রাক' : সম্পাদক সুবোধ বসু রায়, ছত্রাক প্রকাশনী, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৯৮, ১৪০৬

৪. 'ছত্রাক' : সম্পাদক সুবোধ বসু রায়, ছত্রাক প্রকশনী, অষ্টাদশ বর্ষ, ১৩৯৪

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প : মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্য বিত্তের আত্মদর্পণ

উদয় সরদার

নরেন্দ্রনাথ মিত্র মানব জীবনের জটিলতাকে তাঁর গল্পের আখ্যান-ভুবনে নানা বর্ণময় বিচিত্র চিত্রে উপস্থাপন করেছেন। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের স্রোতধারায় অনিশ্চিত আর্থ-সামাজিক পটভূমি যে বিপর্যস্ত মানসিকতা ও ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের সম্মুখে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের জীবনকে দাঁড় করিয়েছিল তারই প্রতিবিম্ব প্রকাশ পেয়েছে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে। ফ্রয়েডিয় মনোবিকলন ও যৌন চেতনা নির্ভর মানব চরিত্রের দ্বন্দ্বময় অন্তর্চিত্রকে তিনি তাঁর নানা গল্পে যথার্থভাবে উদ্ঘাটন করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, যুদ্ধকালীন কলকাতার সমাজজীবনের অধোগতি, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, নৈতিকমূল্যবোধের বিনাশ, দাঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু স্রোত—সব মিলিয়ে বাংলায় সমাজ ও রাষ্ট্রে এক অস্থির বাতাবরণ রচিত হয়েছিল। পারস্পরিক বিশ্বাসহীনতায় সময় সৃজনশীলতার দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আবেগ সমৃদ্ধ যোগ্যমূল্যবোধ সম্পন্ন শুভ বুদ্ধিতে বিশ্বাসী কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনা করলেন তাঁর মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জীবন ভাবনা কেন্দ্রিক গল্পের ভুবন। জটিলতার অবক্ষয়ে ভরা মানুষের পারিবারিক ও অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিল। পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে বাংলা ছোটোগল্পে উঠে এসেছে এই বিপর্যস্ত মধ্যবিত্ত নায়কেরা। স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়েও স্বাধীনতা তাদের কাছে সুখপ্রদ হয়ে উঠতে পারেনি। তাই মধ্যবিত্ত বাঙালি দেশভাগের ফলে হয়ে গেছে বাস্তুহারা-ছিন্নমূল। তারা কলকাতা ও তার আশেপাশে দাঁড়াবার জন্য ন্যূনতম মাটির সন্ধান ও কর্মসংস্থানের অন্বেষণে কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি উপনীত হয়েছে। নির্মম বাস্তবের সঙ্গে সংঘর্ষে পুরাতন মূল্যবোধ ও নৈতিকতা পরাজিত হয়ে চলেছে ক্রমশ। বাঙালির মধ্যবিত্তকে নতুন ভাবে জীবন ভাবনা ভাবতে হয়েছে। আর এরই প্রতিফলন ঘটেছে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালির জীবন-নীতি ও জীবনভাষ্য অবলম্বনে রচিত ভিন্ন ধারার সামাজিক, পারিবারিক গল্পে। এই পরিমণ্ডলের লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষ কুমার ঘোষ, বিমল মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রমুখ।

অনুসন্ধানীর দৃষ্টিতে ধরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্প ভাবাকে ভাঙা গড়ার মধ্যে দিয়ে গ্রহণ করেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। জীবনের প্রত্যক্ষ সরলতা থেকে জটিলতায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বচ্ছল পদচারণা। জীবনের জটিলতার শিল্পী মানিক পরবর্তী কথাসাহিত্যকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছেন; নরেন্দ্রনাথের গল্পে একথা সমর্থন লাভ করেছে। মানুষের মন ও মনন সত্তার বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে যে জটিলতা ও নিবিড় রহস্যময়তা নিহিত আছে তা আবিষ্কারের শিল্প দক্ষতা মানিকের ছিল, নরেন্দ্রনাথের মধ্যে তা প্রবহমান। আবেগ সমৃদ্ধ-মমত্ববোধ সম্পন্ন শুভবোধে বিশ্বাসী শিল্পী নরেন্দ্রনাথ মধ্যবিত্ত মানসকে বারবার ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন। তাঁর এই ক্লান্তিহীন, বিরামহীন নিরন্তর পর্যবেক্ষণ মানুষের বাইরের অবয়ব অপেক্ষা রক্তমাংসের উপাদানে গঠিত শরীরের অভ্যন্তরের অতিরিক্ত কিছু পরিচয় দিয়েছেন। সমাজ ও পারিবারিক জীবনে, এমনকি ব্যক্তিজীবনেও মূল্যবোধের ভাঙাগড়া তিনি স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নানা বৃত্তির নানা মানুষকে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক-সংঘাত ও অন্তর্ঘাতকে শিল্পী নরেন্দ্রনাথমিত্র তাঁর গল্পের ভুবনে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেবলমাত্র সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত নয়, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক জটিলতা তাঁর গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। মধ্যবিত্ত জীবনের বৈধ-অবৈধ প্রণয় সম্পর্ককে তিনি নানা দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। দুর্জ্ঞেয় মনের জটিল রহস্য উন্মোচনে তাঁর যে প্রখর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মেলে তা তাঁর গল্পকে অন্যতর মাত্রা দান করেছে। তিনি মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানবহৃদয়ের নিপুণ পর্যবেক্ষক-বিশ্লেষক।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে পরিবর্তনশীল সমাজ ও অবক্ষয়িত মূল্যবোধের পরিচয় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে। 'অবতরণিকা', 'অভিনেত্রী', 'চোর', 'সেতার', 'মহাশ্বেতা', 'ঘুষ' প্রভৃতি গল্পে অবক্ষয়িত মূল্যবোধ ও সামাজিক পরিবর্তনশীলতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে মূলত বিভিন্ন বৃত্তিকে কেন্দ্র করে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক আর্থিক সংকট মোচনের জন্য চিরাচরিত গৃহবন্দী প্রথা ভেঙে নারীকে সংসারের হাল ধরতে হয়েছে। উপার্জনের জন্য চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাইরে বেরিয়েছে নারী। এর ফলে মধ্যবিত্ত মানসিকতায় তীব্র আঘাত লেগেছে। ভেঙে গেছে দীর্ঘকালের লালিত মূল্যবোধ। 'সেতার' গল্পে দেখা যায় অসুস্থ স্বামী সুবিমলের চিকিৎসার জন্য ও সংসারের অনটন ঘোচাতে স্ত্রী নীলিমাকে জীবিকার সন্ধানে বাইরে বেরোতে হয়েছে। মামাতো ভাই নীরদার বউ সম্পর্কে নীলিমার বৌদি। তার কাছে সন্ধান পায় নীলিমা রায় সাহেব পি .এন . বিশ্বাসের— "ছোট ছোট দুটি নাতনীকে বিকেলে গিয়ে গান শেখাতে হবে। . . .টাকা পঁচিশেক তো ওরা দেবেনই, বেশিও দিতে পারেন।"[১]

দীর্ঘকাল ধরে হাসপাতালে শয্যাশায়ী স্বামী সুবিমল আর শ্বশুর-শাশুড়ীর অনিচ্ছাসম্মতি নিয়ে নীলিমা বেরিয়েছে গানের মাস্টারি করতে। গৃহবধূ অর্থ উপার্জনের আশায় বেরিয়ে পড়ায় প্রচলিত মূল্যবোধ চরম ধাক্কা খায়। কিন্তু প্রবাহমান জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিকল্প কোনো পথ খোলা নেই সুবিমলের সামনে। তাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলে— "তারা যদি রাজী থাকেন তবে আর কি। অন্যের কাছ থেক ভিক্ষে নেওয়ার চেয়ে তোমার রোজগার আমি সহজভাবেই নিতে পারব।"[২]

অসুস্থ সুবিমল বন্ধুদের সাহায্য অপেক্ষা নিজের স্ত্রীর রোজগারকে অনেক বেশি নির্ভরশীল উপায় বলে মনে করেছে। অন্যদিকে সুবিমলের বাবা-মা তথা নীলিমার শ্বশুর-শাশুড়ির মনে দারুণ এক সংশয়।

"লোকে কি বলবে!...স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ী সকলের মনে সেই একই প্রশ্ন, সেই একই বিপদের আশঙ্কা। অভাব অনটন সমস্ত সংসারকে গিলে ধরেছে কিন্তু স্থির আছে সেই অবিশ্বাস, সেই কুটিল সংশয়—প্রবণতা।"[৩]

কিন্তু 'লোকে কি বলবে'। এই জিজ্ঞাসা শেষ পর্যন্ত হার মেনেছে জীবনজিজ্ঞাসার কাছে। সুবিমল তাই অন্যের কাছ থেকে নেওয়া সাহায্য অপেক্ষা স্ত্রীর উপার্জিত অর্থকে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করেছে। সুবিমলের আশ্বাসে নীলিমাও সংশয়াচ্ছন্ন শ্বশুর-শাশুড়ীকে— "জবাব দিল, 'এত ভাবছেন কেন মা, আজকাল কত মেয়েই এমন তো করছে। এতে নিন্দার কিছু নেই। আর নিন্দা-বন্দনার দিকে কান দেওয়ার এই কি আমাদের সময় ?"[৪]

অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসা ও সংসারের ব্যয় নির্বাহের জন্য নীলিমা তাই ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বেরিয়ে পড়ে গানের মাস্টারি করতে। শুধু গানের মাস্টারি নয়, সে নিজে সেতার বাজানো শিখে অন্যদের শেখায়। সেতারে দক্ষ নীলিমা রেডিওতেও বাজায়। এখানে নীলিমার শুধু অর্থ প্রাপ্তি ঘটেনি, যশ-খ্যাতিও পায় সে। সুবিমল সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরে এলেও নীলিমা বাজাতে যায় আসরে। এবার প্রয়োজনের তাগিদ অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে শিল্পীমনের নিবিড় ব্যঞ্জনা। সুস্থ সুবিমল প্রয়োজন ফুরালে নীলিমার সুরের বিনিময়ে অর্থ উপার্জনের প্রত্যাশী নয়। স্বামীর এই আকস্মিক অমতে নীলিমার শিল্পীহৃদয়কে মুল্যবোধ বিনষ্টির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। গল্পের শেষে স্বামীর অনুরোধে সেতারখানা টেনে নিলেও তার নিষ্প্রভ শূন্যদৃষ্টিময় চোখে ফুটে উঠেছে মূল্যবোধ বিনষ্টির ছবি। দুর্বিসহ সময় ও পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিম্নমধ্যবিত্তের গৃহিণী নীলিমা পুরাতন মূল্যবোধকে ভেঙে বেরিয়ে এসে বাঁচার ও বাঁচানোর প্রয়োজনে অর্থ উপার্জনের পথে চালিত হয়। গানের মাস্টারি, সেতার শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার ফলে গড়ে ওঠে নতুন মূল্যবোধ। নীলিমার এভাবে অর্থ

উপার্জনকে তার অসুস্থ স্বামী প্রয়োজনের তাগিদে মেনে নিলেও সুস্থ হয়ে ফেরা স্বামী সুবিমল মেনে নিতে পারে না। ফলে নীলিমার শিল্পীমনে গড়ে ওঠা মূল্যবোধে আঘাত লাগে। তাই 'সেতার' গল্পে অন্তর্বয়ন নিম্নমধ্যবিত্তের দ্বন্দ্বময় মনকে ভাঙাগড়ার মূল্যবোধের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে।

'মহাশ্বেতা' গল্পে দেখা যায় মধ্যবিত্তের বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন অবক্ষয়িত মূল্যবোধ। চিন্মোহন বিধবা অমিতাকে বিয়ে করে। বিধবাবিবাহ আইনসম্মত হলেও সমাজে তেমনভাবে প্রচলিত ছিল না। তবুও সমাজ চিন্মোহন-অমিতার বিয়ে মেনে নেয়। সমাজ পরিবর্তনের সাথেসামঞ্জস্য রেখে পরিবর্তন আসেনি পুরুষ চিন্মোহনের মনের। তাই বিধবার শ্বেতশুভ্র বসনে ভালোলাগা অমিতার 'মহাশ্বেতা' নাম দিয়ে বিয়ের পরেও তার বিধবাবেশ ত্যাগ করাকে মেনে নিতে পারেনি। নববধূ সাজে সজ্জিতা অমিতাকে দেখে মধ্যবিত্তের পুরানো মূল্যবোধ জেগে ওঠে চিন্মোহনের মনে। সে বিধবা বিবাহ করলেও বিধবার বেশভূষা বদলের পক্ষে নয়। অর্থাৎ এয়োতি স্ত্রীর পোষাকী স্বীকৃতিকে অস্বীকার করে চিন্মোহন মধ্যবিত্তের বিকৃত মানসিকতার পরিচয় দেয়নি কী ? চিন্মোহন বিধবা বিবাহ করলেও বিধবার সাজের পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারেনি। তাই অমিতার নববধূর সাজকে তীব্র ব্যঙ্গ করে সে বলেছে— "তোমাকে এমন বিশ্রী সঙ সাজালো কে ?"[৫]

এছাড়াও, "অতি চমৎকার! দশ বছর বয়স কমে গেছে তোমার। একেবারে চতুর্দশী বালিকা বধূ"।[৬]

অথচ এই চিন্মোহন-ই একদিন বিধবা অমিতাকে বিধবার বেশ খোলানোর জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। সে বলেছিল— "এ বেশ যেদিন নিজে থেকে বদলাবে আমি সেদিনের প্রতীক্ষাকরে থাকব। কিন্তু বদলাতে একদিন হবেই।[৭]

এখানেই গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র মধ্যবিত্ত মানসিকতার দ্বন্দ্বজর্জরিত সংকটময় অবক্ষয়িত মূল্যবোধকে নিপুণভাবে উপস্থাপন করেছেন। চিন্মোহন প্রেম-ভালোবাসাকে স্বীকৃতি দিলেও মধ্যবিত্ত মানসিকতা বদলাতে পারেনি। আর প্রবল দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজ মানসের অবক্ষয়িত মূল্যবোধের চরম প্রকাশ ঘটেছে এই গল্পে।

উন্মত্ত উত্তাল সময়ের ক্রনোটপে মধ্যবিত্ত সমাজ মানসের রূপকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র 'অবতরণিকা' গল্পের চরিত্রের অন্তর্বয়ন নির্মাণ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালীন কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজ জীবনের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র উঠে এসেছে এই গল্পের বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে। স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ-দেবর নিয়ে মধ্যবিত্তের যৌথ পরিবার আরতিদের। দাঙ্গা কবলিত, মন্বন্তর পীড়িত সময়ে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়ায় আরতিদের পরিবার। পরিস্থিতিকে সামাল দিতে চিরাচরিত প্রথা ভেঙে, প্রচলিত মূল্যবোধের গণ্ডী

এড়িয়ে গৃহবধূ আরতি অর্থ উপার্জনের জন্য চাকরির সন্ধানে দরখাস্ত লেখে। মধ্যবিত্তের প্রচলিত মূল্যবোধ ছেড়ে স্বামী সুব্রত স্ত্রীকে বলে— "পুরুষ হোক, মেয়ে হোক, আজকাল বসে খাওয়ার কি জো আছে কারো ? চেষ্টা চরিত্র করে তুমিও যদি একটা জোটাতে পারতে মন্দ হোত না। বিশ হোক, পঁচিশ হোক,যা আনতে, তাতেই সাহায্য হত আমার।"[৮]

আরতি চাকরি পেলেও শ্বশুর-শাশুড়ির প্রবল আপত্তি গৃহবধূর চাকরি করা নিয়ে। মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে তারা আঁকড়ে রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই মূল্যবোধ ও মানসিকতা অর্থহীনতার সঙ্কটে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ভেঙে পড়ে। আরতি চাকরিতে যোগ দেয়।

অফিসের অ্যাংলোইন্ডিয়ান মেয়ে এডিথের চরিত্র নিয়ে বস হিমাংশুবাবুর কূট মন্তব্য আরতির নারীত্বের মর্মমূলে তীব্র কুঠারাঘাত করে। শেষ পর্যন্ত চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয় সে।মধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত অর্থনৈতিক সংকটের মাঝে দাঁড়িয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে দিয়ে আরতির মনের মূল্যবোধের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। কিন্তু আর্থিক সংকটে পড়ে শ্বশুর-শাশুড়ি ও সুব্রত-র যে মূল্যবোধ ভেঙে পড়েছে, তার আর পরিবর্তন ঘটেনি। তাই আগে যারা সহজে রাজি হয়নি গৃহবধূকে চাকরিতে পাঠাতে, তারাই এখন আরতির চাকরি ছাড়া নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ করে। অবক্ষিত মূল্যবোধের শিকার হয়ে তারা আরতির চাকরি ছাড়াকে মেনে নিতে পারে না। এখানেই অবক্ষয়িত মধ্যবিত্তের তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন মধ্যবিত্তের জীবনশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র। সুব্রত মায়ের কাছে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে কটাক্ষ করে বলে— "সব চেয়ে মজার কথা মা, সত্যি সত্যি যাকে অপমান করেছে, সে হয়ত দিব্যি সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে অফিসে হাজির হয়ে এতক্ষণে কাজও শুরু করে দিয়েছে। সে তো আর সেন্টিমেন্টাল বাঙ্গালী মেয়ে নয়।"[৯]

স্বামীর এই কথার মধ্যে দিয়ে আরতির মনে সুবিধাবাদী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অবক্ষয়িত মূল্যবোধের চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের অবক্ষয়কে লেখক শিল্পসম্মত ভাবে উপস্থাপন করেছেন এই গল্পে। গল্পের শেষে আরতির অশ্রুসিক্ত চোখে স্বামীর উদ্দেশ্যে— "তুমি, তুমিও তাই বলছ ?"[১০] এই জিজ্ঞাসামূলক উক্তির মধ্যে দিয়ে 'অবতরণিকা' গল্পের চূড়ান্ত শিল্পপরিণতি দান করেছেন শিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

'চোর' গল্পে ব্যক্তি চরিত্রের মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র উঠে এসেছে। ব্যক্তির আত্মিক সংকট ও পারিবারিক আর্থিক সংকট থেকেই 'চোর' গল্পের বিষয় নির্মিত হয়েছে। অমূল্য ও রেণু স্বামী-স্ত্রী। উভয়ের বিবেক প্রচণ্ড সচেতন তবুও উভয়েই চুরি করে। গল্পের প্রায় শুরুতেই অমূল্য একটি সাবানের বাক্স ও এককৌটো স্নো স্ত্রীর হাতে দিলে রেণু শান্ত কণ্ঠে বলে— "দেখ, তোমার ভালোর জন্যই বলি, না হলে আর কি, একদিন যদি হাতে-নাতে ধরা পড়ে যাও তখন দশা হবে কি, তখন মান থাকবে কোথায় ?"[১১]

অভাব অনটনের সংসারে সৎভাবে বেড়ে ওঠা মেয়ে রেণু, মধ্যবিত্ত পরিবারে তার স্বামী চুরি করে এটা সে মেনে নিতে পারে না।

"নিজের ভাগ্যের কথা ভেবে কান্না পায় রেণুর। শেষ পর্যন্ত এমন লোকের হাতেই পড়তে হলো তাকে! আর শুধু হাতে পড়া নয়, আজীবন এই লোকটির সঙ্গেই তাকে বাস করতে হবে, হাসতে হবে, আদর-সোহাগ করতে হবে। তারপর ছেলে হবে, মেয়ে হবে, কিন্তু কিছুতেই অমূল্যের প্রবৃত্তি আর বদলাবে না। কেননা, এসব অভ্যাস মানুষের যায় না, বয়স হলেও না, পয়সাও হলেও না, রেণু অনেক শুনেছে, অনেক দেখেছে।"[১২]

আসলে অমূল্য অন্যের জিনিসকে অ-মূল্যে নিজের করে নেয়। এটাই তার চরিত্র দোষ, যা রেণু কিছুতেই মেনে নিতে পারেনা। কিন্তু কথায় বলে— 'চোরের সঙ্গে থাকলে চোর হয়', রেণুর দশাও তাই। তার সচেতন বিবেকের উপর শেষ পর্যন্ত মসীলিপ্ত হয়। রেণু বিনোদ বাবুর হাতঘড়ি চুরি করে অমূল্যকে উপহার দেয়। তার সচেতন জাগ্রত বিবেক যেন ঘুমিয়ে পড়ে। অন্যদিকে অমূল্য-র ঘুমন্ত বিবেক ওঠে জেগে। তাই সে চুরি করে দেওয়া স্ত্রীর এই উপহার সহজ ভাবে মেনে নেয়নি। তার জাগ্রত বিবেক, মানবিক মূল্যবোধ তাকে যেন আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করেছে প্রতিমুহূর্তে। ইতিপূর্বে অমূল্যের চুরি করাকে বিবেক ও মানবিক মূল্যবোধের কারণে যেমন মেনে নিতে পারেনি রেণু। মূল্যবোধ অবক্ষয়ের যন্ত্রণা অনুভব করে সে। অমূল্যও রেণুর মতো মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে,তাই— "স্ত্রীর কোমল বাহু বেষ্টনের মধ্যে অমূল্য যেন কাঠ হয়ে রইল। পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত মাধুর্য যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর যে চিরপরিচিত দু'খানি হাত তার কণ্ঠ জড়িয়ে রয়েছে তা কোনো সুন্দরী তরুণীর কঙ্কণ-ক্বণিত মৃণালভুজ নয়— তাও আজ শ্রীহীন কলঙ্কিত।"[১৩]

এতদিন স্ত্রীর বাহু বেষ্টন অমূল্যকে শান্তি দিলেও বিনোদ বাবুর ঘড়ি চুরি করেছে যে হাত তা যেন আজ সমস্ত সৌন্দর্য ও কোমলতা হারিয়েছে। এই গল্পে শিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র অত্যন্ত শিল্পসম্মত ভাবে মধ্যবিত্ত দম্পতি অমূল্য ও রেণুর মূল্যবোধের অবক্ষয় ও অবক্ষয়জনিত বেদনার চিত্র অঙ্কন করেছেন।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পের ভুবন বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সন্তোষকুমার ঘোষের বক্তব্য অনুসরণে বলা যায় শিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র শিল্পের যথার্থস্বচ্ছতম গুণকে মুক্ত বিন্দুর মতো ধরে রেখেছেন তাঁর গল্পের অন্তর্বয়নে। প্রকরণগত দক্ষতার সঙ্গে ছিল তাঁর অসামান্য সমাজ ভাবনা ও শিল্পীসুলভ দায়বদ্ধতা। দেশভাগ, দাঙ্গা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রভৃতি সংকটময় সময়ের মধ্যবর্তী মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ-পরিবার ও ব্যক্তিজীবনকে তিনি তাঁর গল্পের বিষয় হিসাবে নির্বাচন করেছেন। গল্পের চরিত্রগুলির সঙ্গে সঙ্গে পাঠককেও তিনি বার বার

সামাজিক, মানবিক ও অবক্ষয়িত মূল্যবোধ সম্পর্কে জটিল প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছেন। মধ্যবিত্তের আজন্ম লালিত সংস্কার ও মূল্যবোধ যখন কঠিনবাস্তবের মুখোমুখি, মধ্যবিত্তের জীবন ভাবনার রূপকার শিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র সেই সংকট কালীন সমস্যামূলক জীবনের ক্রান্তিকালকে তাঁর গল্পের বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছেন। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের জীবনে পুরানো মূল্যবোধের বিনষ্টি ও নতুন মূল্যবোধ গড়ে তোলা এবং এরই পাশাপাশি দ্বিধাদ্বন্দ্বে জর্জরিত চরিত্রের অন্তর্সত্তায় অবক্ষয়ী মূল্যবোধের পুনপ্রতিষ্ঠা করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে দেশব্যাপী চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় যে সামাজিক অবক্ষয়ের জন্ম দিয়েছিল বাঙালি মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের সেই সান্ত্বনাহীন অবক্ষয়িত জীবনসংকটের ছবি ঘুরে ফিরে উঠে এসেছে তাঁর গল্পের ভুবনে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের সংকটময় জীবনকে এত কাছের থেকে এমন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার কৌশল আবিষ্কার করেছেন শিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র। এখানেই তাঁর আশ্চর্য শিল্পদক্ষতার পরিপূর্ণ প্রকাশ।

তথ্যসূত্র

১. 'সেতার', গল্পমালা ১, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, দশম মুদ্রণ, আগস্ট, ২০১১, পৃ. ৪৩।
২. তদেব, পৃ. ৪৪।
৩. তদেব, পৃ. ৪৫।
৪. তদেব, পৃ. ৪৫।
৫. 'মহাশ্বেতা', তদেব, পৃ. ২৩।
৬. 'মহাশ্বেতা', তদেব, পৃ. ২৩।
৭. 'মহাশ্বেতা', তদেব, পৃ. ১৯।
৮. 'অবতরণিকা', তদেব, পৃ. ১২৫।
৯. 'অবতরণিকা', তদেব, পৃ. ১৪২।
১০. 'অবতরণিকা', তদেব, পৃ. ১৪২।
১১. 'চোর', তদেব, পৃ. ২৯।
১২. 'চোর', তদেব, পৃ. ৩১।
১৩. 'চোর', তদেব, পৃ. ৩৪।

গ্রন্থপঞ্জি

১. গল্পমালা ১, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা-৯, দশম মুদ্রণ, আগস্ট, ২০০৯।

২. বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, শ্রীভূদেব চৌধুরী, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি., কলকাতা-৭৩, পঞ্চম প্রকাশ, পুর্নমুদ্রণ, ২০১৩-২০১৪।

৩. কালের পুত্তলিকা, অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ৪র্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১১।

৪. ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, সুমিতা চক্রবর্তী, পুস্তক বিপনি, কল-৯, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, মে, ২০১২।

৫. প্রসঙ্গ বাংলা ছোটগল্প : স্বাধীনতার আগে ও পরে, সম্পাদনা–শম্পা চৌধুরী, রত্নাবলী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারী, ২০১১।

৬. বাংলা ছোটগল্প তত্ত্ব ও গতিপ্রকৃতি, সোহারাব হোসেন, করুণা প্রকাশনি, কল-৯, ২য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১২।

৭. বিশ শতকের বাংলা ছোটগল্প নবমূল্যায়ন, সম্পাদনা— শম্পা চৌধুরী, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ, মার্চ, ২০০৯।

নকশাল আন্দোলনের বর্ণমালা : প্রসঙ্গ জয়া মিত্রের ছোটগল্প

সন্দীপ গরাই

বাংলা সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত রক্ত ঝরার কালপর্ব হিসেবেই চিহ্নিত। জয়া মিত্র 'হন্যমান' উপন্যাসের সূচনাতে বলেছেন— "সমস্ত আড়াল সরিয়ে দিয়েছিল সেই বিপুল ভাঙচুর আর জন-জোয়ারের দশক।"[১] কারণ অবক্ষয়ী আধুনিকতাবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিপতি শ্রেণির চক্রান্তের ফলে প্রবল অরাজকতা ও অনিশ্চয়তার ছায়া ভারতবাসীকে জড়িয়ে ধরে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে সমগ্র ভারতবাসী সার্বভৌম, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের যে স্বপ্ন দেখেছিল তা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কালোবাজারি, মন্বন্তর, বেকারত্ব, উদ্বাস্তু সমস্যা, অর্থনৈতিক মন্দা, খাদ্যসঙ্কট, যৌথ পরিবারের ভাঙনের ফলে চরম সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়। এছাড়াও "দেশ বিভাগের ঘটনাটি একটি ভূখণ্ডকে খণ্ডিত করার অপেক্ষা জনমানসে বিচ্ছেদ সৃষ্টির করুণতর কাহিনি।"[২] ফলে একদিকে দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা, অন্যদিকে সময়ের উত্তাল স্রোত, বীভৎস রূপ জনমানসে লড়াই ও সংগ্রামী চেতনার প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। আবার আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তিযুদ্ধ, ব্যক্তির সামাজিক প্রতিষ্ঠার দাবিতে যে আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে তা এদেশীয় ছাত্র-যুবকদের মধ্যে শেকল ভাঙার ডাক দিয়েছিল।

তেভাগা আন্দোলন, তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ দেশের কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র যুবকদের মধ্যে তীব্র প্রতিবাদ, লড়াই ও সংগ্রামী চিন্তাচেতনার প্রসার ঘটিয়েছিল। তবু এই প্রভাব সুদূরপ্রসারী হলেও স্বাধীনতার পরবর্তীকালে যে আধা উপনিবেশিকতাবাদ ও আধা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির জয়ধ্বনি আকাশে বাতাসে মুখরিত হচ্ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং প্রয়োজন ছিল এক নতুন রাষ্ট্র গঠনের; যেখানে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষ নিজের স্বাধিকার, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে তীর-ধনুক-বল্লম নিয়ে গর্জে ওঠে সার্বিক মুক্তির দাবিতে। ফলে ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে কৃষকরা নকশালবাড়ি এলাকায় যে আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায় তা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। সুনীতি বিশ্বকর্মকার তাঁর স্মৃতিকথাতে বলেছেন—

"রাত্রে পুরুষরা গ্রাম পাহারা দেয়— পুলিশের যাতায়াত বেড়ে গেছে। পুরুষরা রাত জাগে, আর আমরা রাতে ঘুমাই। আর দিনের বেলায় আমরা পাহারার ডিউটি করি, পুরুষরা তখন ঘুমায়...নারীদের মধ্যে প্রচারের কাজ আমরা চালিয়েই গেছি নারী মুক্তির সমিতির মাধ্যমে। নারীদের এককাট্টা হতে হবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই রকম— সমস্ত প্রচার।"[৩] নকশাল আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা যে প্রবল ছিল তা খুব সহজেই অনুমান করা যায়।

নকশাল বাড়ি আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল ১৯৬৭ সালের মে মাসে। নকশাল বাড়ি বাজারে সভা চলাকালীন বিশাল পুলিশ বাহিনী নির্বিচারে গুলি চালায় নিরীহ জনতার ওপর। মোট ১১ জন নিহত হয় এই ঘটনায়। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে— "সেই উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি থেকে যে ঝড়ের কেন্দ্র তৈরি হয়েছিল, আর সেই ঝোড়ো হাওয়া দ্রুত ছড়াল সিন্ধু সভ্যতা জুড়ে লোকমুখে, দেওয়ালের পোষ্টারে, টেনসিলের কালো কালিতে, জুটমিলের তাঁতঘরে, পাড়ায় পাড়ায়, খবরের কাগজের হেডলাইনে দিন-দিন, স্কুলের ছাদে টাঙানো একটু কারো লাল কাপড়ে, রেশনের দোকানের দমদম দাওয়াইয়ে, অজস্র পথনাটকের মাঝে আর গানে!"[৪] কানু সান্যাল, চারু মজুমদার, জঙ্গল সাঁওতাল, সুশীতল রায় চৌধুরী নকশাল আন্দোলনে দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। "নকশালবাড়ি লাল সেলাম", "সারা ভারত সারা বাংলা/হো নকশাল হো নকশাল", "মাঠের ফসল তুলবে কে ?/গরিব চাষি আবার কে ?"[৫]—প্রভৃতি স্লোগানে এই আন্দোলন সুবৃহৎ রূপ নেয় এবং মেহনতি মানুষের চিত্তে এক নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নকে ত্বরান্বিত করে। নির্বাচন বয়কট, স্কুল-কলেজ ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ, ব্রিটিশ শাসকের সান্নিধ্যে থাকা ব্যক্তিদের মূর্তি ভাঙা, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের জীবনের সমাপ্ত ঘোষণা প্রভৃতির মাধ্যমে এই আন্দোলন তদানীন্তন সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, স্বর্ণ মিত্র, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, কিন্নর রায়, অনিতা অগ্নিহোত্রী, মহাশ্বেতা দেবী, সমরেশ মজুমদার, জয়া মিত্র প্রমুখ সাহিত্যিকেরা নকশাল আন্দোলনের তীব্রতাকে সাহিত্যের পাতায় তুলে ধরেছেন। কবিতা, গান, নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন সাহিত্যিকেরাও। আন্দোলনে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর আত্মশক্তির দিকটিকে সুনিশ্চিত করে। জয়া মিত্র নারীর সেই বিপ্লবী ও প্রতিবাদী ভাবনাকে সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। 'হন্যমান' উপন্যাসে জয়া মিত্র নারীবাদী চেতনার দিকটিকে তুলে ধরেছেন নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে— "জেলে না গেলে কখনো কি জানা যেত মুসুর ডালের জল, শাড়ির আঁচল দিয়ে পোকা ছেঁকে ফেলে, লেবুর রস দিয়ে খেতে কি যে ভালো লাগে! তার সাথে যেদিন খাঁদি বউদি সিকি ইঞ্চি পুরু দুখানা রুটি গুঁড়ো করে নুন আর কাঁচা পেয়াজ

দিয়ে মাখে—"[৬] জয়া মিত্র ছোটগল্পের মধ্যেও নারীর আত্মকথনের স্বরকে তুলে ধরেছেন।

জয়া মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্পের অন্তর্গত "সূর্য ও সাদাপাখিটি"[৭] গল্পটি নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা। পারিবারিক ও সাংসারিক জীবনের অন্তরালে নকশাল আন্দোলনে সরকারের পোষা গুন্ডা বাহিনীদের অমানবিক অত্যাচারের কাহিনি গল্পটিতে চিত্রিত হয়েছে। গল্পের সূচনাতে দেখা যায় শ্রীলতা উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ছেলেমেয়েরা বাড়ি না ফেরার কারণে। শ্রীলতার ছেলের নাম পূর্ব। চিরাচরিত শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে এসে পূর্ব পুড়িয়ে ফেলেছিল অনার্সের সার্টিফিকেট, ছেড়ে এসেছিল ইউনিভার্সিটির পড়াশুনার জগত থেকে। এক্ষেত্রে পূর্বর যুক্তি তাঁর মায়ের কাছে— 'তোমার ছেলে গ্র্যাজুয়েট নয় বলে কি লোকের কাছে তোমার লজ্জা হবে মা ?' কিন্তু এতে একদিকে শ্রীলতার মনের তীব্র যন্ত্রণা প্রকাশ পেলেও অন্যদিকে ছেলের স্বাধীন চলাফেরাকে স্বাগত জানিয়েছে। এই চলাফেলা অবশ্য কৃষকদের দাবিগুলিকে বাস্তবায়িত করা, ব্যক্তির মৌলিক অধিকারগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, নকশাল আন্দোলনের তীব্রতাকে সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং সেলের ভিতরে পুলিসের অত্যাচারকে অগ্রাহ্য করে সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখার চলাফেরা। পূর্বার মতো হাজার হাজার ছেলে এভাবেই স্বাধীন পথে হেঁটেছিল এবং শ্রীলতার মতো বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজনদের মানসিকতারও পালাবদল ঘটেছিল। তাই গল্পের মধ্যে ছাব্বিশদিন পুলিসের অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত ডালিয়াকে দেখতে এসে তাঁর মা প্রশ্ন করেছিলেন— 'কাউকে ধরিয়ে দিসনি তো ?' অর্থাৎ সংসারের অন্দরমহলে থাকা সাধারণ নারীরা যেভাবে আন্দোলনে বারুদ সঞ্চালন করেছিলেন; অন্যদিকে ছাত্র-কৃষক-শ্রমিকরা সেই বারুদে অগ্নি-সংযোগ ঘটিয়েছিলেন।

নকশালবাড়ি আন্দোলন দেশের বাইরে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল তারও পরিচয় দিয়েছেন গল্পকার। ব্রিটিশ মেয়ে মেরি টাইলার জার্মানিতে দোভাষির কাজ করতে করতে বাঙালি তরুণ ইঞ্জিনীয়ার অমলেন্দুর সঙ্গে পরিচয় হয়। কিন্তু অমলেন্দু স্বদেশে ফিরে সত্তরের বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিলে মেরিও এদেশে এসে আন্দোলনে যোগ দেন। আবার চার দেওয়ালে গন্ডিবদ্ধ ভয়াবহ ও বীভৎস জীবনযাত্রার চিত্র তুলে ধরেছেন শ্রীলতার জবানিতে— 'সেই বাহাত্তর সালে বাইরে র‍্যাশন ব্যবস্থার কড়াকড়ি, মাথাপিছু চালের যোগান যতটা তাতে বাচ্চাদের পেটও সবটা ভরবে না। হাসপাতালের দু-চারজন হারামখাউনি সর্দারনী ছাড়া ওয়ার্ডের প্রত্যেকটা মেয়ের চেহারায় সর্বদা খিদেয় থাকার ছাপ, জেলখানার ফিমেল ওয়ার্ডের চেয়ে বেশি সেটাকে দেখায় যেন হাঘরে ভিখিরিদের আস্তানার মতো।' জেল জীবনের এমন বাস্তব বর্ণনা গল্পকার দিয়েছেন যা পাঠককে ভাবিয়ে তোলে। শুধু তাই নয় শাসকশ্রেণির হাতের পুতুলগুলো যেভাবে কয়েদীদের ওপর নৃশংস শারীরিক

ও মানসিক অত্যাচার চালিয়েছিল তা মানবিকতার চরম সীমাকে লঙ্ঘন করেছে। জেলে খাবারের গুণমান নিয়ে তো প্রশ্নই ওঠে না। এমন খাবার যা চরম ক্ষুধার্ত মানুষেরও ঘৃণার সৃষ্টি করবে— 'সেই খাবারও রোজই আসছিল সকালে কাদামাখা ছোলাসেদ্ধ, কালো ডাল কালো ভিন্ডি সেদ্ধ এক হাতা ভাত, বিকেলে কালো ডাল কালো ভিন্ডি সেদ্ধ দুটো নোংরা বাজরার রুটি। রোজ। সপ্তাহের পর সপ্তাহ।' এছাড়াও জেলের ভেতরে বন্দিদের মধ্যেও যে রঙিন স্বপ্ন ডানা মেলে কল্পলোকে উড়ে যায় তারও বর্ণনা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গটি এনেছেন চিনি দিয়ে তৈরি একটা হলুদ হাঁসকে কেন্দ্র করে। যে হাঁসটি শ্রীলতার জীবনে পঁচিশ বছর পর ভালোবাসার সংসার তৈরি করেছে।

গল্পের শেষাংশে শ্রীলতা বর্তমান পৃথিবীকে দেখেছেন এভাবে— 'আগুন কখনো শিখা তুলে জ্বলে, কখনো ছাই চাপা, কিন্তু আগুন থাকে। আগুন তো মাটিতে জমে থাকা সূর্যতাপ, সে কি হারায় ? অর্থাৎ আন্দোলনের বহ্নিশিখা যে এখনো সক্রিয় তারই ইঙ্গিত এখানে রয়েছে। কৃষকদের হকের লড়াইকে সাধারণ পুলিশবাহিনী ধামাচাপা দিতে পারে না। আন্দোলনের সঙ্গে সমাজের সার্বিক স্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। কারণ এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ক্ষমতা অধিকারের লড়াই ছিল না। এই লড়াই মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের লড়াই ছিল। তাই রক্ত খেকো সাম্রজ্যবাদী শক্তিগুলিকে জবাব দেওয়ার সময় এসেছিল। আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাওয়ার পরেও এই আন্দোলনের আক্রোশ যে মাটির পৃথিবীতে, সূর্যের প্রখর রশ্মিতে চিরন্তন, প্রতিনিয়ত গল্পের শেষে তাই বলেছেন। গল্পকার দেখাতে চেয়েছেন এই আন্দোলনে নারীরাও সমানভাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। নারী শক্তির জয়জয়কার গল্পটিকে আলাদা মাত্রা দান করেছে।

'শেল্টার' গল্পে নকশালবাড়ি আন্দোলনের ভয়ানক রূপ তুলে ধরেছেন লেখিকা। গল্পটিতে একদিকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ঘেরাটোপে বন্দী মেয়েদের সাংসারিক জটিলতা; অন্যদিকে সেই মেয়েরাই পার্টির নীতি-আদর্শকে বজায় রেখে আন্দোলনে কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা গল্পকার দেখিয়েছেন। পরিবারতন্ত্রে নারীরা যেভাবে পিষ্ট হচ্ছে তা গল্পে সরস্বতী বর্ণনা করেছেন এভাবে— 'নিজের অতীতের আর কোন পরিচয়ই থাকবে না কোথাও। কখনো যে গান গাইতাম, পড়াশুনো করতে ভালবাসতাম, লোকজন হাসিখুশি— সমস্ত ভুলে গেছি।' সংসারে নারীরা এভাবেই আত্মসঙ্কটে বার বার পড়ে। জীবন-প্রবাহে এগোতে এগোতে সরস্বতী একসময় ভাবে— 'বড় হয়ে এসে কেবল শুনেছি মেয়েমানুষকে নরমসরম হতে হয়। কথা মেনে চলতে হয়, মুখে মুখে জবাব করতে নেই। বিয়ে হয়ে এসেও ভয়ে ভয়ে থাকতাম।' কিন্তু সময়ের খরস্রোতে নারী চেতনার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। তাই সাংসারিক মোহ ত্যাগ করে নরী সমাজ আন্দোলনে সক্রিয়

ভূমিকা পালন করেছে। নন্দিতা তার মধ্যে একজন। কিন্তু পুলিশের নির্মম অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে ওপরতলার কমরেডদের নির্দেশে নন্দিতাকে মাটির তলায় আন্ডারগ্রাউন্ডে একরকম অজ্ঞাতবাসে রাখা হয়। কারণ— 'যখন কিনা খাকি কুকুররা তোমার সঙ্গীদের রক্তের গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।' এখানে থেকে নন্দিতা দেখেন সাগরের মতো হাজার হাজার যুবক হয়ত এরেস্ট হয়ে যাবে, না হয় গুলি খেয়ে পড়ে থাকবে কোথাও। সেন্টু বৌদির সঙ্গে পরিচয় পর্বে নন্দিতা জানতে পারে বৌদির নাম সরস্বতী। সাংসারিক প্রেম ও যন্ত্রণাকে সঙ্গে নিয়েই সেন্টু বৌদির পথ চলা শুরু। একসময় পারিবারিক মেলবন্ধনে জড়িয়েও পড়েছিলেন সরস্বতী নন্দিতার সঙ্গে। কিন্তু বিদায় বেলায় সরস্বতীর পৌরুষত্ব ও বীরত্বব্যঞ্জক কথাবার্তার জন্য তাকে সেলাম জানাতেই হয়। সে নন্দিতাকে বলেছে— 'এবার থেকে যেখানে নকশালদের খবর শুনবো জানবো তোমরাই আছো। দেখো তোমরা ঠিক জিতবে, তোমরা তো ভাই নিজের জন্য কিছু চাওনা—' এই বক্তব্য একজন আন্দোলনকারী নারীর পক্ষেই সম্ভব। সরস্বতীর মতো নারীরাও যে আন্দোলনের তীব্রতা ও গভীরতাকে উপলব্ধি করেছিল তা লক্ষণীয়। আন্দোলনের পটভূমিতে নারী চরিত্রের এহেন বিবর্তন গল্পকার সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

"স্বজন বিজন" গল্পটিতে গল্পকার নকশাল আন্দোলনের স্মৃতিকে জীবন্তরূপ দান করেছেন। এই আন্দোলনে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ যেভাবে অংশগ্রহণ করেছিল তা লেখিকা দেখিয়েছেন। রিকশাওয়ালা, বিড়ি বাঁধা বস্তিগুলোর মানুষ, মিউনিসিপ্যালিটিতে কাজ করা মেথর— প্রভৃতি শ্রেণির মানুষেরা আন্দোলনে যোগদান করেছিল। বিপরীতে বিশেষ ট্রেনিং পাওয়া স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশের দল এবং সি আর পি-র ব্যাটালিয়ানদের নারকীয় অত্যাচারের কাহিনি দিয়েই গল্পের সূচনা। গণতন্ত্রের হত্যাকারী খাকি উর্দি পরা দানবগুলো যখন মীরাকে ধরে নিয়ে যায় তখন মীরার আত্মজিজ্ঞাসা বারবার উত্তরণের পথ খুঁজে বেড়াই। তাদের সমস্ত অত্যাচারের পদ্ধতিগুলোকে হার মানিয়ে মীরা নিজের নীতি ও আদর্শের জগত থেকে সরে আসেনি। আসলে মীরা তো মাটির কসম খেয়েছিল। তাই রাক্ষসদের চোখরাঙানিও শেষ পর্যন্ত ঝলসে গেছে তার আত্মবিশ্বাসের কাছে— 'আমি কমিউনিস্ট পার্টি করা পরিবারের মেয়ে, দেশের জন্য প্রাণ দেবার কথা শুনতে শুনতে বড়ো হয়েছি, মরতে ভয় পাই না।' এ শুধুমাত্র মীরার কথা নয়, সমস্ত কর্মীদের মুখের কথা, প্রাণের কথা।

চার দেওয়ালে বন্দি প্রত্যক্ষ করে খড়্গপুরের কাছের গ্রাম থেকে আসা খাঁদি ও তার দু-বছরের মায়ের ওপর নৃশংস অত্যাচারের ছবি। খাঁদির পায়ের তলায় পিশাচের দলেরা আপলিন ঢুকিয়ে দিয়েছিল এবং বলেছিল বিপ্লবীদের সন্ধান না জানালে মা-মেয়েকে কেটে ফেলবে। কিন্তু খাঁদি বাঁচবার চেষ্টা করেনি। তিনি মীরাকে বলেছিলেন— 'তুমাদের জিত

হবেই। এত পাপ মা বসুমতী আর সইতে লারছেন। হামদের গাঁয়ে সবজনা তুমাদের দলে। নিশ্চয় জিত হবে।' বিদ্রোহের আগুন এভাবেই দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। মীরা জানে তার মৃত্যু বিপ্লবীদের চেতনায় আত্মপ্রেরণা সঞ্চার করবে; অন্যদিকে খাঁদিও তো মৃত্যুর ভয় থেকে বিরত থেকেছে। মৃত্যুর ভয় তুচ্ছ, অত্যাচারী রাষ্ট্রশক্তি ও সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে নব সমাজ প্রতিষ্ঠার সংকল্পেই এগিয়ে চলেছেন তারা। নারী শুধুমাত্র গৃহকর্মে নিপুণা, পুরুষতান্ত্রিক শ্বাসরুদ্ধতার জালে আবদ্ধ থাকতে পারে না; প্রয়োজনে নারী বীরত্ব, পৌরুষত্ব ও রণমূর্তি রূপ ধারণেও যে সক্ষম তা গল্পকার জয়া মিত্র দেখিয়েছেন। মুক্তির দশকে দাড়িয়ে নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নারীমুক্তির প্রসঙ্গটিকেও গল্পকার অভিনব রূপে তুলে ধরেছেন।

নকশাল আন্দোলনের ৫০ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও এই আন্দোলনের প্রভাব সুদূরপ্রসারী এবং কোথাও যেন কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-যুবকদের চেতনে বা অবচেতনে আন্দোলনকে পুনর্জীবিত করার অসীম প্রয়াস চলছে। সত্তর দশকের ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তি তো বর্তমান সমাজেও পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং হকের দাবীতে জনগণ একদিন নকশাল আন্দোলনের ঝড় তুলবে; যা শাসকশ্রেণির মতো গোষ্ঠীদের পরিণতি কি হতে পারে তা কল্পনার বাইরে। এই পরিবর্তন এলেও বিপ্লবী আন্দোলনে যে পরিবার তাঁর আত্মীয়স্বজন, কাছের মানুষদের হারিয়েছে তাঁর মর্মান্তিক যন্ত্রণার স্মৃতি আজও চির অম্লান। গল্পকার এই পূর্বস্মৃতির কথাই তুলে ধরেছেন 'বেদি আর বুড়ি' গল্পটিতে। সমকালীন মালিক শ্রেণির অত্যাচার, মহাদেবের মতো সহজ সরল পরিবারে কীভাবে শাসকদের দানবীয় অত্যাচারে জনশূন্য হয়ে যায়, এক কাঁচামাটির বেদির ৫০ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও অতীতকে কতটা প্রাণবন্ত করতে পারে তার ইতিহাস, আন্দোলনে যুবকদের আত্মবলিদানের কাহিনি গল্পকার তুলে ধরেছেন আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে।

মহাদেবের পরিবারে দুঃখকষ্ট থাকলেও, ইজ্জতটাই আসল কথা। মাঠে কাজের সময় মহাদেব দেখতে পান তিনটি কমবয়সী ছেলেমেয়ে। মেয়েটি এগিয়ে এসে তাদের আসল পরিচয় মহাদেবের কাছে বলে— 'নকশাল জানো কাকা ? আমরা নকশাল। কাল অইদিকের একটা গাঁয়ে যাবার ছিল, অন্ধকারে এই খেতের মধ্যে দিয়ে আমরা আর পারিনি।' নকশাল সম্পর্কে মহাদেবের ধারণার পরিবর্তন ঘটে। সে বলেছে— 'এই হল নকশাল ? তবে মালিক বলছিল গুন্ডা, খুনি ? এতো ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে! নিজেদের ঘরদুয়ার ছেড়ে গাঁয়ের চাষিবাসির দুঃখ শুনতে এসেছে ?' মহাদেব মালিকের বিপক্ষে গিয়ে তাদেরকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, মহাদেব তাদের যথাসাধ্য সহযোগিতাও করে। সে জানত এই পথেই তার মতো সহজ সরল নিরীহ মানুষেরা প্রকৃত

স্বাধীনতার স্বাদ পাবে। কিন্তু বন্দুকবাজেরা মহাদেবকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে শারীরিক অত্যাচার করে। শেষে রক্তবমি করে মহাদেব মারা যায়। নকশাল আন্দোলন এভাবেই হাজার হাজার পরিবারের যবনিকা টেনেছিল। কিন্তু ৫০ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও তিরু তার ঠাকুমার কাছে বসে বুঝতে পারে— '...নকশালের পঞ্চাশ বছর। হ্যাঁ ঠাকমা, সত্যি গো, আমার দাদু পঞ্চাশ বছর আগে মইরেছিল, তবু তুমি মনে করে রাখেছ ? তাথেই আমার মা রোজ দীপ দেয় ?' এভাবেই নকশাল আন্দোলন বর্তমান নগরায়নের যুগেও মানুষের মনে চিরলালিত একটা বিষয়। জয়া মিত্র ব্যক্তিগত জীবনে ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক বিভিন্ন স্থান থেকে আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। যা সাহিত্য রচনার অন্যতম মূল উপাদান। সুতরাং সেই সাহিত্য আরো জীবন্ত, ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজের থেকেও বেশি মূল্যবান।

তথ্যসূত্র

১. মিত্র জয়া, হন্যমান, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ— অগ্রহায়ণ ১৩৯৬, নভেম্বর ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-৭

২. চট্টোপাধ্যায় ভবানীপ্রসাদ, দেশবিভাগ পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনি, আনন্দ পাবলিশার্স , পঞ্চম মুদ্রণ জুন ২০১৩, পৃষ্ঠা-১২

৩. বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণ (সম্পাদনা) ও মুখার্জি শুভাশিস (সংকলক), নকশাল আন্দোলনে মেয়েরা, পিপলস বুক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ— জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা-৫৬

৪. বিশ্বাস অধীর (সম্পাদক), গাঙচিল পত্রিকা (নকশাল সংখ্যা), বইমেলা ২০১৮, পৃষ্ঠা-২০৮

৫. বিশ্বাস অধীর (সম্পাদক), গাঙচিল পত্রিকা (নকশাল সংখ্যা), বইমেলা ২০১৮, পৃষ্ঠা-১২৮

৬. মিত্র জয়া, হন্যমান, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ— অগ্রহায়ণ ১৩৯৬, নভেম্বর ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-১৭

৭. মিত্র জয়া, গল্পসমগ্র, পুনশ্চ, প্রথম প্রকাশ— জানুয়ারি ২০১৮ (গল্প থেকে গৃহীত সমস্ত তথ্যগুলি আলোচ্য গ্রন্থ থেকে গৃহীত)

সহায়ক গ্রন্থ

১. ভট্টাচার্য অমর, লাল তমলুক, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ জুন, ২০১৩

২. ঘোষ সেমন্তী (সম্পাদনা), দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ-১ মার্চ, ২০০৮

সাময়িক পত্রে ব্রিটিশ বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক : (১৯০০-১৯৪৭)

প্রভাত দাস

ব্রিটিশ বাংলায় প্রচলিত বাংলা সাময়িক পত্রের উপর ভিত্তি করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, শিক্ষা এবং হিন্দু ও মুসলিম লেখকদের লেখা বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থসমূহের উপর ভিত্তি করে তৎকালীন সময়ে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক কেমন ছিল তা তুলে ধরার প্রচেষ্টা করেছি মাত্র।

সাময়িক পত্রে ব্রিটিশ বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক কেমন ছিল, তাঁদের মধ্যে আদৌ কোন ভালো সম্পর্ক ছিল কি না, যদি ভালো থাকে তবে কেমন ভালো, যদি মন্দ থাকে তবে কেমন মন্দ— এইসমস্ত আলোচনা অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে তৎকালীন ব্রিটশ বাংলায় প্রচলিত যে সমস্ত সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রচলিত ছিল তার উপর আমাদের বিশেষ ভাবে আলোকপাত করতে হবে। সুতরাং আমরা ব্রিটিশ বাংলায় প্রচলিত সাময়িক পত্রের উপর নির্ভর করেই হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক কেমন ছিল সে সম্পর্কিত আলোচনায় অগ্রসর হব।

তৎকালীন ব্রিটিশ বাংলায় প্রচলিত একাধিক সাময়িক পত্রের নাম আমরা পাই। যে সাময়িক পত্রগুলি তৎকালীন সময়ে জনমত প্রকাশের বিশিষ্ট মাধ্যমে রূপে প্রচলিত হয়েছিল। এই পত্র-পত্রিকাগুলি পাঠের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক কেমন ছিল তার ধারণা অনেকটাই স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। এই পত্র-পত্রিকাগুলি পাঠের মধ্য দিয়ে আমরা দেখেছি যে ব্রিটিশ বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সুসম্পর্ক যে ছিল না তা বলা যায় না। তবে সে সম্পর্কে এতটাই নগন্য যে তা দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো নয়। যে সম্পর্ক চোখে পড়ে তা প্রীতিকর নয়, অপ্রীতিকর-অর্থাৎ বিরোধের। আর এই বিরোধ নানান দিক দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছিল।

সামাজিক শ্রেণিভেদ কালক্রমে এতটাই প্রকট হয়ে উঠেছিল যে হিন্দু-মুসলমান এর দূরত্বের সৃষ্টি করেছিল।তৎকালীন প্রচলিত 'ইসলাম প্রচারক'[১] নামক পত্রিকায় উল্লেখ

আছে— 'হিন্দু দিগের মধ্যে যেমন কুলীন আছে মুসলমান দিগের মধ্যেও সেই রকম শরীফ আছেন।' আবার 'সাম্যবাদী'[২] পত্রিকাতে উল্লেখ আছে—"...ভাবিবার বিষয়, পশ্চিম অঞ্চলে হিন্দু সন্ন্যাসীরা বহু মুসলমানকে হিন্দু করিয়া লইতেছে। মুসলমানদের অনুদারতার জন্য এই সান্দারগণ যদি খোদা না করুন হিন্দু হইয়া যায়, তবে মুসলমানগণই সে জন্য দায়ী হইবেন।"

বিভিন্ন সামাজিক রীতি নীতি নিয়ে ও সমকালীন প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় নানান চিন্তা চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। নামের আগে 'শ্রী' শব্দের ব্যবহার নিয়ে হিন্দু-মুসলমান এর মধ্যে বিতর্ক ছিল। পক্ষে-বিপক্ষে মুসলমানদের মধ্যেও দু-দল ছিল। মোহাম্মদ আবদুল হাকিম মুসলমানের নামের আগে 'শ্রী' ব্যবহার যুক্তি যুক্ত মনে করেন নি। ১৩২৬ সালে একটি প্রবন্ধে [৩] তিনি বলেন— "মুসলমানদের নামগুলিই যখন হিন্দুর নামসমূহ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন ভাষার শব্দ দ্বারা গঠিত তখন হিন্দু রীতি অনুসারে জীবিতের লক্ষণ স্বরূপ তাঁহাদের নামের পূর্বে 'শ্রী' ব্যবহার কখনই শোভন বা সঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষতঃ 'শ্রী'র আভিধানিক অর্থসমূহ মুসলমান জাতির ধর্ম সংস্কারের বিরোধী বলিয়া ও মুসলমানের নামের পূর্বে 'শ্রী' ব্যবহার করা কর্তব্য নহে।"

পক্ষান্তরে তৎকালীন সমাজের গন্যমান্য হিন্দুসাহিত্যিকেরা মুসলমানদের নাম-ধামাদি লিখতে গিয়ে হিন্দু সাহিত্যিকেরা যে সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড করে থাকেন সে সব দেখে লজ্জাও হয়, হাসিও পায়। তাঁরা ইংরেজী শেখেন, ফরাসী, গ্রীক, ল্যাটিন সমস্ত বিদ্যায় তাঁরা খ্যাতি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে থাকেন, কিন্তু প্রতিবেশী মুসলমানদের নাম বা তাঁদের নিত্য ব্যবহৃত শব্দ শুদ্ধ করে লিখতে পারেন না। তাঁরা ইচ্ছাকৃতই হোক বা অন্য কোন দুরভিসন্ধি প্রসূতই হোক এমন ব্যাপারে অবলীলাক্রমে অবহেলা করে যান। তার জন্যই তারা 'মোখেলেসুর রহমান' লিখতে গিয়ে লেখেন 'মুকুলেশ্বর রহমান', 'আবদুল রহিম'কে 'আবদার রহিম', 'সুলতান আহমদ'কে 'সুলতান আমেদ', যা হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের মধ্যে কালিমালিপ্ত করতে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে।[৪]

শুধু সামাজিক রীতিনীতিই নয়, বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সমস্যাও হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ককে কলুষিত করে তুলেছিল। সংবাদপত্র মহলে নারী হরণ আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। অসহযোগ আন্দোলনের পর থেকে নারী হরণকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণির হিন্দু-সংবাদপত্রে প্রবল আন্দোলন ও প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে যাচ্ছিল।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হিন্দু সংবাদপত্র মুসলমান দিগের প্রতি অহেতুক হামলা ও কথার বোমা বৃষ্টি করতে পিছুপা হয়নি। 'আল ইস লাহ'[৫] নামক পত্রিকায় সম্পাদক মহাশয় লিখেছেন—"আজ কাল সংবাদপত্র পাঠ করিতে বসিলেই নারী হরণের সংবাদ প্রায়ই দৃষ্ট হয়। ইহাতে বড় বড়

হেডিং দিয়ে লেখা থাকে 'মুসলমান গুণ্ডার নারী হরণ'। পূর্বে এই নারী হরণ সংবাদটি পত্রে এত জোরে শোরে প্রচার হইত না। কিন্তু মুসলমানগুণ্ডার জাতি, ইহা প্রতিপন্ন করাইবার জন্য বর্ত্তমান এক শ্রেণীর হীন মানসিকতা সম্পন্ন হিন্দু সাংবাদিকেরা আদাজল খাইয়া লাগিয়াছেন, তাহা বিশেষ আপত্তিজনক। নারী হরণকারি গুণ্ডা হিন্দু হউক বা মুসলমান হউক, তাহার উপযুক্ত শাস্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই শ্রেণীর গুণ্ডা উভয় সমাজেই আছে। কিন্তু মুসলমানের ঘাড়ে সব দোষ চাপাইলে চলিবে কেন ? যে হেতু দুর্ব্বৃত্তগণের হস্ত হইতে অবলা নারী জাতির উদ্ধার হেতু উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু তা না করিয়া এক শ্রেণির হিন্দুরা মুসলমানের ঘাড়ে সব দোষ চাপাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে চান।"

সামাজিক সমস্যা হিসাবে শুধু নারী হরণই নয়,আরো অনেক সমস্যা সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল, যা হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের ফাটল ধরিয়েছিল। ১৯৩২-১৯৩৩ সালের একটি শাসন বিবরণী নিয়ে বাংলার সরকার একটি রিপোর্ট বের করেছিলেন। সেই রিপোর্টে উল্লেখ ছিল ১৯২৬-১৯৩১ পর্যন্ত মোট ৬ বছরের অত্যাচারিতা হিন্দু নারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩২৪,৩২৫,৩০৪,৩৬৭,৩৬২ ও ৩৩৮ এবং অত্যাচারিতা মুসলমান নারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৪৯৪,৫০৯,৬৫৭,৫৩৮ এবং ৫৮২ এবং ঐ ৬ বছরে মুসলমান দ্বারা অত্যাচারিতা হিন্দু নারীদের সংখ্যা যথাক্রমে ১১৪,১২২,১০৫,১১৪ ও ১২৫ এবং হিন্দু দ্বারা অত্যাচারিতা হিন্দু নারীর সংখ্যা ২০৫,১০২,১৯৮,২৩১ ও ১৯৪। এই বিবরণের উপর ভিত্তি করেই 'প্রবাসী পত্রিকা'য় সম্পাদক মহাশয় লিখেছিলেন—"কিন্তু রিপোর্টে দেখানো উচিৎছিল যে মুসলমানদের দ্বারা অত্যাচারিতা মুসলমান নারী ঐ দুই বৎসরে কত এবং হিন্দুদের দ্বারা অত্যাচারিতা মুসলমান নারীই বা কত। তাহইলে বুঝা যাইত মুসলমান বদমাসেরা কত নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে এবং হিন্দু বদমায়েসারাই বা কত নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে।"[৬]

সামাজিক রীতি নীতি-ই বা বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সমস্যাই যে তৎকালীন সময়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়েছিল তা নয়, শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রেও সম্পর্কের ব্যবধানকে আরো জটিল করে তুলেছিল। শিক্ষা হল দেশ ও জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়েই একজন মানুষ নিজেকে সর্বাঙ্গিন ভাবে সমাজের বুকে তুলে ধরতে পারে, সমাজের দশজনের মধ্যে এক জন হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। সেই শিক্ষাগ্রহণ নিয়ে ও সাম্প্রদায়িকতার বাতাবরণ প্রবল আকার ধারণ করেছিল। শিক্ষাগ্রহণকে কেন্দ্র করে তৎ কালীন সাময়িক পত্রে যে সব লেখালেখি হয়েছিল তা দেশ ও জাতির পক্ষে হিতকর ছিল না। আমাদের ভবিষ্যৎ আশার ভরসার স্থল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ।

কিন্তু এই সকল ছাত্রগণ শিক্ষা বিভ্রাটের পরে জাতীয় ধর্মে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা লাভ করেছে। তারা ছাঁকা ইংরাজী ও ছাঁকা বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করে স্বধর্মে উন্নত জ্ঞানার্জন হতে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু কি কারণে মুসলমান জাতি রাজ ভাষা শিক্ষা নিতে এতো তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে 'মিহির ও সুধাকর' [৭] পত্রিকায় আমরা দেখেছি যে— ক. রাজ ভাষা শিক্ষা করাকে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কার্যরূপ কুসংস্কার মনে করা, খ. অভিভাবকের অবহেলা ও অদূরদর্শিতা, গ. অর্থের অনটন, ঘ. রাজ ভাষা শিক্ষিত মুসলমানদের ধর্ম্মকার্য্যে অনিচ্ছা ও বীতশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, ঙ. হিন্দুদিগের বিদ্বেষ, চ. গবর্ণমেন্টের উৎসাহের অভাব, ছ. বিলাসিতা, জ. শ্রমবিমুখতা, ঝ. শিক্ষা বিভাগে মুসলমান কর্ম্মচারীর অল্পতা, ঞ. কর্মচারীর নিয়োগের দ্বারা হিন্দুদিগের হস্তে ন্যস্ত থাকা।

আবার আমরা 'বসন্ত সহচর' [৮] নামক পত্রিকায় লক্ষ্য করেছি যে সেখানে রাজ ভাষাকে নিয়ে কবিতাও লেখা হয়েছে মোসলমানদের সাবধান করার জন্য। পত্রিকাতে উল্লেখিত কবিতাটি হল—

'ভারতের মোস্লেমগণ হও সচেতন,
চেয়ে দেখ ঘটিয়াছে কিবা অঘটন,
দেখিছ না হিন্দুগণ,
পেয়েছে কি উচ্চাসন,
পড়িতেছে রাজভাষা করি প্রাণপণ
ইহাই ত উন্নতির প্রধান কারণ।
... ...
করি সবে প্রাণপণ,
কর এবেঅধ্যয়ন,
রাজভাষা ইংরাজীতে দাও সবে মন।
সমুজ্জ্বল কর ভাই ভারত গগন।'

ইংরাজী বা বাঙ্গালা শিক্ষা দান করাকে কিছু কিছু মুসলমান অভিভাবক প্রথম দিকে মতামত দিলে ও পরবর্তীকালে তাঁরা এই শিক্ষার প্রতি আপত্তি তুলেছেন এবং তাঁরা মনে করেছেন যে এইশিক্ষা গ্রহণ হল নিজের পায়েই নিজে কুঠারাঘাত করা। এই মনোভাব থেকেই মুসলমান শিক্ষার্থীগণ পিছিয়ে পড়তে থাকে এবং ভ্রমের শোচনীয় পরিণাম ভোগ করতে হয় এবং বাঙ্গালী মুসলমানদের শিক্ষার পথ দারুণভাবে অন্তরায় হয়ে ওঠে। ফলে হিন্দুদের যে স্থানে দুটি বা তিনটি ভাষাশিক্ষা গ্রহণ করতে হয় সেখানে বঙ্গীয় মুসলমানদের পাঁচটি ভাষা আয়ত্ত না করলে উপায় থাকে না। বঙ্গীয় হিন্দুদের মাতৃভাষা 'বাঙ্গালা'।

সুতরাং তাহারা বাঙ্গালা ভাষা অতিসহজেই আয়ত্ত করতে পারেন এবং তার সঙ্গে সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করলেই হিন্দু সন্তানদের পক্ষে যথেষ্ট। হিন্দুস্থানী যে সমস্ত মুসলমান বসবাসকরে তাদের ভাষা হল উর্দু। তার ফলে তাদের উর্দু শেখার তেমন দরকার হয় না, শুধু আরবী,পারসী ও ইংরাজী শিক্ষা করাই তাদের পক্ষে যথেষ্ট। অন্যদিকে বঙ্গীয় মুসলমানদের পাঁচটি ভাষা শিক্ষাই আবশ্যক। প্রথমত বাঙ্গালা এদের মাতৃভাষা হলেও বিশুদ্ধ খাঁটিবাঙ্গালা নয়। উহা আরবী পারসী মিশ্রিত এক প্রকার মুসলমানী বাঙ্গালা।তার ফল স্বরূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মুসলমানদের বাঙ্গালা ভাষা ভালো করে শেখা চায়। আরবী বেশী না হলেও কোরাণ শরীফ বিশুদ্ধ ভাবে পাঠ করার উপযোগী হওয়া চায়। জাতীয় আচার ব্যবহার উন্নত করণের জন্য আদব কায়দা শিক্ষার জন্য ভালো ভালো জাতীয় কাব্য ও ইতিহাসের রসাস্বাদনের জন্য অতিসুমধুর ও স্মৃতি সুখকর পারসী ভাষা শিক্ষা নিতে হবেই। তার পর আসি উর্দূ ভাষার কথায়। এই ভাষাতেই প্রয়োজনীয় ধর্মগ্রন্থাদি অনুবাদিত হয়েছে। তাই এই ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ না করলে নাগরিক সম্ভ্রান্ত মুসলানদের সঙ্গে বাক্যালাপ করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুতরাং উর্দু ভালো করে শেখা দরকার। আর অবশেষে রাজ ভাষা ইংরাজী শেখা চাই ই চাই। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বঙ্গীয় মুসলমান প্রকৃত পক্ষে পাঁচটি ভাষা যদি তাঁরা শিখতে পারেন তবেই প্রকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে বলে পরিগণিত হবে। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষাগ্রহণ নিয়ে ও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সুসম্পর্কের অভাব ছিল।

লর্ড বেন্টিঙ্কের শাসনকালে আইন আদালতে প্রচলিত পারস্য ভাষা লোপ, ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন করা হয়। এর ফলস্বরূপ আমরা দেখেছি যে, এই প্রচলিত ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষার হিন্দুগণ এত উন্নতি দেখালেন যে তন্দ্রাভিভূত মুসলমান বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। ইংরাজী যে হেতু বিজাতীয় ভাষা, কাফেরের ভাষা, তাই ইংরাজী শিখলে 'দোজখে' যেতে হবে এবং ইংরাজী ভাষাকে 'এলমে বেদিন' বলে চিহ্নিত করে। এই সকল কুসংস্কার তাদের মনে অধিকার স্থাপন করলে জীবন সংগ্রামে তারা হেরে যায়। জঠোরের জ্বালায় তারা প্রকৃত বাস্তব বুঝতে সক্ষম হয় এবং বুঝতে পারে যে এই সকল ধারণা হৃদয়ে পোষণ করা অন্যায়। তারা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখেছে যে হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাজারে,শয়নে, স্বপনে সাংসারিক কার্যকলাপে ইংরাজী-ই ইংরাজী। তাঁরা আরো বুঝতে পারেন যে ইংরাজী ভাষার শান্তি প্রদায়িনী ছায়ায় না এলে পদে পদে লাঞ্ছিত হতে হবে। মাননীয় আবদুল হক চৌধুরী 'ইসলাম প্রচারক' [৯] নামক পত্রিকায় উল্লেখ করেছেন— "শিক্ষিত মুসলমান মাত্রেই প্রেরিত পুরুষের নীতি বিশেষ অবগত আছেন...বিদ্যা যদি চিন দেশে থাকে, তবে যাইয়া শিক্ষা কর অর্থাৎ বিজাতীয় ভাষায় বিদ্যা থাকিলেও সেই ভাষা হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিতে হইবে।"

এই প্রসঙ্গে মাননীয় শেখ আবদুল গফুল জানালী মহাশয় তাঁর 'আল্-এসলাম্'[১০] নামক পত্রিকায় উল্লেখ করেছেন– "সমাজের সুশিক্ষিত চিন্তাশীল নেতৃগণের বিচারে বাঙ্গালার মোছলমানদের পক্ষে সর্ব্বপ্রথমে মাতৃভাষা বাঙ্গালা ও তৎপরে ধর্ম্মভাষা আরবী ও বিজ্ঞান বা রাজভাষা ইংরাজী শিক্ষাই যথেষ্ট। পারসী ও উর্দূ ভাষার কোন বিশেষ আবশ্যকতা নাই। প্রথমতঃ বাঙ্গালা, আরবী ও ইংরাজী এই তিন ভাষা শিক্ষা করিয়া পরে যার ইচ্ছা হয় সমগ্র জগতের ভাষা শিক্ষা করুক, তাহাতে কাহারো আপত্তি হইতে পারে না। ফলতঃ এই প্রকারের ব্যবস্থা দ্বারা ভাষার গুরু বোঝা না কমাইলে মোছলমান শিক্ষার্থীগণ শিক্ষাক্ষেত্রে আর মেরুদণ্ড সোজা করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না।"

তৎকালীন সরকারি আর্থিক সহায়তার বৈষম্যের প্রভাবও পড়েছিল হিন্দু-মুসলমানের শিক্ষাগ্রহণের উপর। এই বৈষম্যই মুসলমানদের শিক্ষায় অনগ্রসরতার একমাত্র কারণ বলে বিবেচিত করা যায়। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি সরকারের পক্ষপাতিত্বের কারণে মুসলমানেরা শিক্ষায় পশ্চাতে পড়ে যায়। শিক্ষা গ্রহণ কিংবা শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার মুসলমানদের জন্য অবারিত ছিল না। ১৩৩১ সালে প্রকাশিত আবদুল হাকিম 'ইসলাম দর্শন'[১১] নামক পত্রিকায় লিখেছিলেন—"বঙ্গীয় গভর্নমেন্ট এদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য রাজস্ব হইতে ১ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। জাতি ও জনসংখ্যা হিসাবে মুসলমানেরা উহার মধ্যে অন্ততঃ ৭০ লক্ষ টাকা পাইবার অধিকারী। কিন্তু মুসলমানেরা পায় মাত্র ২৯ লক্ষ টাকা। স্ত্রী শিক্ষার জন্য গভর্নমেন্ট বার্ষিক ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। তন্মধ্যে মাত্র ৪৫ হাজার টাকা মুসলমান এবং অবশিষ্ট ৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা সমস্ত ই হিন্দু সমাজের উপভোগ্য। . . .কলেজ সমূহের লেকচারার, প্রফেসর এবং হাইস্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা অতি নগন্য। মুসলমান ছাত্ররা সরকারী বৃত্তি হইতে প্রায়ই বঞ্চিত হইয়া থাকে।"

মহাশয় আবদুল হাকিমের মতে শিক্ষার ন্যায় চাকরির ক্ষেত্রেও হিন্দু-মুসলমানের বৈষম্য লক্ষ্য করার মতো। এ সম্পর্কেআবদুল হাকিমের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"গভর্নমেন্ট এই দেশের রাজস্ব হইতে রাজকীয় কর্মচারীদের জন্য চাকুরীর বেতন স্বরূপ বার্ষিক ৭ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। জাতি ও জনসংখ্যার হিসাবে মুসলমানেরা উহার মধ্যে প্রায় ৪ কোটি টাকা পাইবার ন্যায়সঙ্গত অধিকারী, কিন্তু সকলে শুনিলে স্তম্ভিত হইবেন যে, মুসলমানেরা উহার কুড়ি ভাগের মাত্র ৩৫ লক্ষ টাকাও পায় কিনা সন্দেহ। অবশিষ্ট ৬ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার প্রায় সমস্তই হিন্দুরা গ্রাস করিয়া থাকে।[১২]

তবে আবদুল হাকিম মহাশয় যে অভিযোগ এখানে দর্শিয়েছেন তা সামগ্রিক ভাবে সঠিক নাও হতে পারে। কারণ যেখানে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে এতো বৈষম্য আছে সেখানে

চাকুরির ক্ষেত্রে, চাকুরির বেতনের ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তবুও উক্ত তথ্য হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি করেছিল।

জ্ঞান আহরণের সোপান হিসাবে পাঠ্য পুস্তকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সঠিক বা ত্রুটিমুক্ত পাঠ্যপুস্তকের প্রভাবে যেমন সঠিক জ্ঞান বিস্তার সম্ভব তেমনি পাঠ্যপুস্তক যদি ত্রুটিযুক্ত হয় তবে সে ক্ষেত্রে জ্ঞান আহরণে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী যে সমস্ত শিক্ষাসংক্রান্ত লেখালেখি যে সমস্ত পত্র-পত্রিকাতে বেরিয়েছিল সেগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেই সময় হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য পুস্তক সঠিকভাবে নির্বাচিত হলেও মুসলান ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তক সে অর্থে যুগোপযোগী ছিলনা। ফলে মুসলান ছাত্ররা হীনমন্যতার বশবর্তী হয়ে সঠিক শিক্ষা গ্রহণে তারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। 'নুর-অল-ইমান' [১৩] নামক পত্রিকাতে হেমায়েত এসলাম মহাশয় উল্লেখ করেছেন— "আমাদের দেশেও মুসলমান সন্তানের শিক্ষাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ক. প্রাথমিক বাঙ্গালা পাঠশালার শিক্ষা, খ. মোক্তব মাদ্রাসার শিক্ষা, গ. ইংরাজী স্কুল কলেজের শিক্ষা।"

বাঙ্গালা পাঠশালার ছাত্রদের কে বাঙ্গালা ভাষা শিখতে ও তার সঙ্গে দৈনন্দিন সাংসারিক কারবারের দেনা পাওনা, হিসাব নিকাশ, ওজন পরিমাপ ইত্যাদি ব্যবহারিক বিদ্যা শিক্ষা করতে হয়, সেই সঙ্গে সামান্য ধরণের স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মূল নিয়ম, কৃষি বিজ্ঞানের সরল জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। অন্যদিকে বাঙ্গালা পাঠশালায় মুসলমান সন্তানদেরকে বিভিন্ন প্রকার রীতিনীতি, আদব তমিজ ও ধর্ম সংক্রান্ত কোন বিশেষ পুস্তক পড়ানো হয় না। ভাষা শিক্ষার পুস্তকে ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ সৎনীতি ও সৎগুণের শিক্ষা অর্জন করে থাকলেও সেই শিক্ষা কখনই এসলামী নীতির শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই পাঠশালাগুলোতে যে সকল পাঠ্য পুস্তক হিসাবে পড়ানো হয় তাতে হিন্দুগণের পৌরাণিক কাহিনী, রাম রাবণের যুদ্ধ, কুরু-পাণ্ডবের লীলা পড়তে হয়। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের রীতি-নীতি, আচার ব্যবহার মুখস্থ করতে হয়। এই সব থেকেও মুসলমান ছাত্র সমাজ রেহায় পায় না। কোমল মতি বালকদের পাঠ্যপুস্তকে মোসলমানের নিন্দা, এসলামী আচার ব্যবহারের কুৎসা, মোসলমান জাতিকে ম্লেচ্ছ, যমন ইত্যাদি নামে ঘৃণা প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। তাছাড়া মোসলমানদের মধ্যে বাঙ্গালা গ্রন্থ কর্ত্তা বেশি না। যে দুই চারিজন আছেন তাঁদের পুস্তক সিলেক্টকমিটির হিন্দু মেম্বারগণের সুবিচারে পাঠ্যপুস্তকের তালিকায় স্থান পায় না। এই জন্যই হেমায়েত এসলাম মহাশয় অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে 'নুর-আল-ইমান'[১৪] নামক পত্রিকায় উল্লেখ করেছেন—" ...এই জন্য আমাদের বঙ্গ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের চক্ষে মুসলমান গ্রন্থকর্ত্তার পুস্তক পড়ে না এবং দুনিয়াতে মোসলমান লেখক আছেন বলিয়া আমাদের বালকগণ বুঝিতে পারেন না।"

পাঠ্য পুস্তকের প্রকৃত বাস্তব চিত্র কি ছিল সেই সম্পর্কিত আলোচনা আর একটু বিষদভাবে আলোচনা করলে আমাদের মোহাম্মদ ফকির উদ্দীন সরকার—মহাশয়ের 'বাসনা'[১৫] পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের কথা না বললেই নয়। সেই পত্রিকায় তিনি যা তথ্য তুলে ধরেছিলেন তা হল— "আজ কাল বিদ্যালয়াদিতে যে সকল সাহিত্য ও ঐতিহাসিক পুস্তকাদি পঠিত হইতেছে, তাহা হিন্দুর দেবদেবী, মুণি-ঋষি, সাধু-সন্ন্যাসী, রাজা-মহারাজা, বীর-বীরাঙ্গনা ইত্যাদির উপাখ্যান ও জীবন চরিত আদিতেই পরিপূর্ণ, হিন্দুর ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ব্রত-অর্চ্চনা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদির মাহাত্ম্য বর্ণনাতেই সেই সব পাঠ্য গ্রন্থ অলংকৃত। মুসলমানের পয়গাম্বর-পীর,অলি দরবেশ, নবাব-বাদশাহ, পণ্ডিত ব্যবস্থাপক, বীর-বীরাঙ্গনা আদির উপাখ্যান বা জীবন-বৃত্তান্ত অথবা ইসলামের নিত্য কর্তব্য ধর্ম্মাধর্ম্ম, ব্রত-উপাসনা, খয়রাত-জাকাত ইত্যাদির মহাত্মারাজির নামগন্ধো ঐ সকল পুস্তকে নাই, বরঞ্চ মুসলমান ধর্ম্মের ও ধার্মিকদের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষের ভাবই বর্ণিত আছে।...প্রথম বর্ণ পরিচয় কাল হইতেই আমাদের বালগকগণ রামের গল্প, শ্যামের কথা, হরির কাহিনী, কৃষ্ণের চরিত্র ইত্যাদি পড়িতে থাকে। যদু-মধু, শিব-ব্রহ্মা, রাম-হরি ইত্যাদি নামেই পাঠ আরম্ভ হয়, কাজে কাজেই আমাদের সরলমতি কোমল প্রকৃতি শিশুগণ বিদ্যালয়ে পঠিত হিন্দুগণের উল্লেখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসী হয় এবং আমাদের জাতীয় পবিত্র শাস্ত্র ও ইতিহাস উপাখ্যান ধর্ম্মকর্ম্মাদির অপরিজ্ঞাত হইয়া থাকে....যাহাতে মুসলমানী ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর কথা, বীর-বীরাঙ্গনার বিবরণ, সাধু দরবেশের আখ্যান, পয়গাম্বরগণের উপাখ্যান, ধার্ম্মিক-ধার্ম্মিকাদের বৃত্তান্ত, নবাব বাদশাহের জীবনী, সতী রমণীগণের গুণ কাহিনী, ইসলাম ধর্ম্মের সারতত্ত্ব, হাদিস দলিলের সার সংগ্রহ, নামাজ রোজার উপকারিতা, মুসলমানী, পব্বাদির কথা ইত্যাদির আবশ্যকীয় বিষয় সকল বঙ্গভাষায় প্রকাশিত বিদ্যালয়ের পাঠ্যভুক্ত হয়, তৎপক্ষে চেষ্টা করা মুসলমান মাত্রেরই উচিত।"

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ব্রিটিশ বাংলায় যে সমস্ত হিন্দু সাহিত্যিকদের আবির্ভাব হয়েছিল তাঁরা প্রত্যেকেই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হল এই যে এই সমস্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন তা অতুলনীয় হলেও তা বেশিরভাগই পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। কারণ তাঁদের লেখনিতে যে সমস্ত পাত্র পাত্রীর সৃষ্টি হয়েছে সেখানে হিন্দু চরিত্রদের উচ্চমাত্রা দেওয়া হলেও মুসলমান চরিত্রের অবমূল্যায়ন ঘটানো হয়েছে, যা মুসলমান সমাজকে অপমানিত করা হয়েছে। তৎকালীন প্রকাশিত ও প্রচলিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার সমালোচনা আমরা লক্ষ্য করেছি।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়েরলেখা 'দুর্গেশনন্দিনী' নামক উপন্যাসে আমরা দেখেছি যে কৎলু খাঁ চরিত্র উর্ব্বর কল্পনার সাহায্যে অতি কদর্য্যরূপে আঁকা হয়েছে। কৎলু

খাঁ নিষ্ঠুর ও লম্পট চূড়ামণি ছিলেন তা আমাদের বিশ্বাসকরতে কষ্ট হয়। ইতিহাসেও কৎলু খাঁ চরিত্র সম্পর্কে কিছু লেখা নেই। অথচ বীরেন্দ্র সিংহকে আমরা দু দুবার লম্পট চূড়ামণি রূপে দেখতে পাই। তিলোত্তমার মাতা বিমলার সহিত বীরেন্দ্র সিংহের সম্পর্ক তো লাম্পট্যেরই সামিল তবুও তাদের মহান করে আঁকা হয়েছে। আর কৎলু খাঁ চরিত্রের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমবাবু মুসলমান সমাজের উপর শ্লেষবাণ নিক্ষেপ করেছেন।" [১৫]

বঙ্কিমবাবু শুধু যে মুসলমান পুরুষ চরিত্রকেই হীন করে অঙ্কন করেছেন তা নয়, নারী চরিত্র-চিত্রণে যে রূপ সংকীর্ণতা ও একদেশ দর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তা ভাবলে সত্যই লজ্জায় ও ঘৃণায় মুসলমান সমাজের মাথা নত হয়ে যায়। তিনি দয়া করে তাঁর উপন্যাসে যে সমস্ত মুলমান রমণীকে স্থান দান করে তাঁদেরকে অমর করেছেন তাঁদের একজনকেও কুলরমণী রূপে দেখা যায় না। তাঁর আয়েসা, দলনী বেগম, রোশেনারা, জাহানারা, সর্বোপরি তাঁর জেবুন্নিসা প্রভৃতি রমণী চরিত্রগুলি অমর লেখনি প্রসূত উদ্ভট কল্পনা বিজরিত প্রত্যেক মুসলমান রমণীই মাতৃভূমির আবহাওয়ারগুণে এমনই অদ্ভুত আকার ধারণ করেছে যে তাঁদেরকে চিনে বের করা অতীব দুঃসাধ্য। [১৬]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যদি প্রকৃতই স্বদেশ প্রাণ হতেন তা হলে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে মীরকাশিমের গৌরব মণ্ডিত চরিত্র উৎকৃষ্ট রূপে অঙ্কন করে পাঠকের চোখ ঝলসে দিতে পারতেন ও বাঙালি প্রেমের নিদর্শন প্রদর্শন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে স্বদেশ দ্রোহির মতো মীরকাশিমের তথা মুসলমানের চরিত্র বিকৃতভাবে অঙ্কন করেছেন। এমনকি মীরকাশিমের সেনাপতি তকি খাঁ যাঁর মোহনীয় চরিত্রকে বিকৃতভাবে অঙ্কন করেছেন। মাননীয় আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন মহাশয় 'আল্-এসলাম' [১৭] নামক পত্রিকায় উল্লেখ করেছেন—"যাঁহারা বঙ্কিম গ্রন্থাবলী ভালমতে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে বঙ্কিমবাবুর বাঙ্গালী-প্রীতি আসল নহে, নিতান্তই মেকি। বঙ্কিমবাবুর দেশ-প্রীতি একটি 'অশ্বডিমের' ন্যায়— তাহার কোনই অস্তিত্ব নাই। যাঁহারা এ বিষয়ে সন্দিহান হন, তাঁদের প্রতি আমার অনুরোধ, একবার বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর', 'আনন্দমঠ', 'কমলাকান্ত' ও 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থ চতুষ্টয় একটু সূক্ষ্মভাবে পাঠ করবেন। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন বাঙ্গালীর পূজ্য দেশভক্ত বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গালী প্রীতি কতটুকু।"

বাংলা সাহিত্যে কবি ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি হেমচন্দ্র, কবি নবীনচন্দ্র থেকে শুরু করে তাঁদের শিষ্যান-শিষ্যগণ প্রত্যেকেই তাঁদের মূল্যবান রচনা সমূহের মধ্য দিয়ে মুসলমান চরিত্রদের অত্যন্ত হীনভাবে অঙ্কন করেছেন। এই প্রসঙ্গে মাননীয় সৈয়দ আবুল মোহাম্মদ এস মাইল হোসেন সিরাজী মহাশয় 'ইসলাম প্রচারক' [১৮] নামক পত্রিকায় উল্লেখ করেছেন—"হিন্দু লেখক,হিন্দু বক্তা,হিন্দু কবি, হিন্দু ঔপন্যাসিক মাত্রই যেন যবনের

মুণ্ডুপাত করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 'যবন' শব্দ লিখিয়াই হিন্দু লেখককে লেখনী ধারণ করিতে হয়, নতুবা হিন্দু কলম মোটেই চলে না। সুতরাং মুসলমান, তুমি যতই আপত্তি কর না কেন, হিন্দু 'যবন' ছাড়িবেন কি করিয়া' . . ."

এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথা না বলিলেই নয়। ইনি হলেন বিশ্ব পরিচিত নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত মহাকবি মহাদার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাুর। মুসলমানদের নিয়ে তার চিন্তা ধারার মূল্যবোধ কেমন ছিল সেটাও আমাদের জানা দরকার। 'রবিঠাকুর আতঙ্ক' শিরোনামে 'ছোলতান' [১৯] নামক পত্রিকায় সম্পাদক মহাশয় উল্লেখ করেছেন— "সম্প্রতি একটা অতি ভয়ঙ্কর রোগ দেখা দিয়েছে। এই রোগের নাম 'মোছলেম আতঙ্ক'। আমরা মনে করিয়াছিলাম 'মোছলেম আতঙ্ক' রোগে কেবল বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, লালা লাজপৎ রায় এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দই ভুগিতেছেন; কিন্তু এখন দেখিতেছি বিশ্ব-পরিচিত নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত মহাকবি মহাদার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই রোগে গুরুতর রূপে আক্রান্ত হইয়াছেন। . . .তিনি এক দফা বলিয়াছেন, ভারতে স্বরাজ হইলে এখানে মোছলেম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। অবশ্য তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে এইটুকুও বলিয়াছেন, ভারতে স্বরাজ হইলে, সেটা মন্দের ভাল বলিতে হইবে। তারপর তিনি— বলিয়াছেন, খেলাফতে হিন্দুর যোগদান মারাত্মক ভুল হইয়াছে এবং এ জন্য তিনি মহাত্মাকে দায়ী করিয়াছেন। মহাত্মাজী মোছলমানের হাতে কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ ঘুরিতেছেন বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। . . .তিনি আরো বলিয়াছেন, খেলাফৎ ও তুরস্কের সহিত হিন্দুর কোন স্বার্থ জড়িত নাই, হিন্দুর পক্ষে খেলাফৎ আন্দোলনে যোগদান করা ভুল হইয়াছে। . . .রবিবাবু কবি- খুব বড় কবি—জগৎ প্রসিদ্ধ কবি তাহা স্বীকার করি। কিন্তু ইহা স্বীকার্য্য যে রাজনীতি বিদ নহেন, রাজনীতির সহিত তাঁহার কোন দিন কোন সম্বন্ধ হয় নাই— ছিল না। . . .তিনি যেমন বড় কবি, তাঁহার কল্পনা রাজ্যের সীমাটাও তেমনি প্রশস্ত। তাই তিনি ভারতে মোছলেন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দুঃস্বপ্ন দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছেন।"

হিন্দু লেখকদিগের গ্রন্থাদির পাশাপাশি মুসলিম লেখক দিগের গ্রন্থাদি রচনার প্রসঙ্গ ও উত্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। তৎ কালীন সময়ে কয়েকজন বিখ্যাত মুসলিম লেখকদের পরিচয় ও তাঁদের রচনাবলী সম্পর্কে জানতে পারি। মোহাম্মদ লুৎফর রহমান একজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ছিলেন। তাঁর লেখা 'রায়হান' [২০] উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আমরা দেখেছি যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতির প্রচণ্ড অভাব ছিল। পারস্পরিক বিদ্বেষ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদির নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। উপন্যাসে উল্লেখ আছে— "হিন্দুপাড়ায় গুজব উঠিয়াছিল, মুসলমানেরা বহু লাঠিয়াল লইয়া হিন্দুদের বাড়ীঘর লুঠ করিবে। তাহাতে স্ত্রী-কন্যার সম্মান নষ্ট করা হইবে। ফলে হিন্দু পাড়ার ভদ্র-অভদ্র, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়পুরুষ-

রমণী এবং বৃদ্ধদের দারুণ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। এই গুজবের মূল, ভিন্নদেশে, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা।"

এই উপন্যাসের মধ্যে দুই শ্রেণীর মুসলমানের লক্ষ্য করা যায়। এক শ্রেণীর মুসলমান প্রবল হিন্দু বিদ্বেষী, কট্টর সাম্প্রদায়িক এবং অন্য শ্রেণী মিলনে প্রত্যাশী। এই উপন্যাসে খোরশেদ চরিত্রটি প্রথম শ্রেণিভুক্ত। তার মনে হিন্দুর প্রতি প্রবল ঘৃণা। তার দৃঢ় বিশ্বাস মুসলমানের পাপ হবে হিন্দুর সংস্পর্শে এলে। উপন্যাসে খোরশেদ বলেছেন— "মোসলমান অন্যায় করলেও সে মোসলমান। সে যদি চুরি করে তাহলে আমি ক্রুদ্ধ হইনা। সে যদি বিধর্মীকে হত্যা করে তাকে আমি ধন্যবাদ দেই। হিন্দুকে জব্দ করাই মোসলমানের ধর্ম। শয়তান-প্রতিম কলকাতার মোসলমান গুণ্ডাকে আমি ভালবাসি। হিন্দু ঋষি হলেও আমার শ্রদ্ধালাভ করবে না।"

'রায়হান' উপন্যাসে নিজেকে চূড়ান্ত হিন্দুবিদ্বেষী বলে খোরশেদ যেমন প্রমাণ করেছেন তেমনি ঠাকুর জমিদারের নায়েক গণেশ মুখার্জী হল মুসলিম বিদ্বেষী গোঁড়া হিন্দু। মুসলমান প্রজা আজিজ তাকে নত হয়ে সেলাম করেনি বলে আজিজকে সে ছোটলোক নেড়ে বলে তিরস্কার করেছে। আজিজ প্রতিবাদ করলে পরিণামে তার মৃত্যু হয়। এই খোরশেদ নায়েবের মতো লোক সমাজে বসবাস করে বলেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ বাঁধে— তারা মিলতে পারে না। তবে এই উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলন কামনা করা হলেও সংস্কার বিশ্বাসকে অতিক্রম করতে পারেনি— এ ত্রুটি মূলত ঔপন্যাসিক লুৎফর রহমানের।

নাট্যকার মোহাম্মদ ইয়াসিন মহাশয়ের মধ্যেও হিন্দু-মুসলান সম্পর্ক বিষয়ে ভিন্নতর চেতনার লক্ষ্য করা যায়। তাঁর 'জীবন তারা'[২১] নামক ঐতিহাসিক নাটকে চরিত্রচিত্রণে মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য ও চারিত্রিক বলিষ্ঠতার পাশাপাশি হিন্দু চরিত্র সমূহের কাপুরুষোচিত আচরণের চিত্র অতি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, যা হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে কলুষিত করেছে।

শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে চরিত্রের ছোট বড় অঙ্কনই নয়, তার পাশাপাশি ধর্মকেও শ্রেষ্ঠত্বর আসন দেওয়ার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। মাননীয় নূরুল হল মহাশয়ের লেখা বিখ্যাত উপন্যাস 'কালাপাহাড়'[২২] এর মধ্য দিয়ে হিন্দু ধর্মের চেয়ে ইসলাম ধর্মকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হয়েছে। কালীকৃষ্ণ ফকির সাহেবের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধতার সুরে বলেছেন— "আমি আর কাহারও কোন কথায় ভ্রুক্ষেপ করিব না। এতদিনে আমার সংশয় দূর হইল। আমি একমাত্র পবিত্র সনাতন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া পরকালের পথ মুক্ত করিব।" মোহাম্মদ রেজা খাঁ নাম নিয়ে কালীকৃষ্ণ ইসলাম ধর্মগ্রহণ করলেন এবং ইতিহাসে কালাপাহাড় নামে খ্যাত হলেন। তিনি প্রবল ভাবে হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে

শ্রীক্ষেত্রের মন্দির ধ্বংসে যোগ দিলেন। হিন্দু কন্যা কমল কুমারী বিজয় কৃষ্ণের সাথে বিবাহের ঠিক হওয়ার পরেও কালাপাহাড়কে বিবাহ করে সাকিনা খাতুন নাম ধারণ করে। ঔপন্যাসিকের এহেন ঘটনার সমাবেশ থেকেই বোঝা যায় যে হিন্দু ধর্ম অপেক্ষা ইসলাম ধর্ম শ্রেষ্ঠ। আর এই শ্রেষ্ঠত্বই হিন্দু-মুসলমানের ব্যবধানকে স্পষ্টতর করে তুলেছে।

তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে আরো স্পষ্টতর করে তুলেছিল। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর প্রান্তরে লর্ড ক্লাইভের হাতে বাংলার মহাবিচক্ষণ শক্তিশালী নবাব সিরাজদৌল্লার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে সোনার ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের বীজ অঙ্কুরিত হয়। এই ইংরেজ ভারতবাসীর যতই কল্যাণ করুক না কেন তাদের ভেদ নীতিই হিন্দু মুসলমানকে এতটাই দূরে সরিয়ে দিয়েছে—যে পাশাপাশি বসবাস করে ও যেন তারা লক্ষ্য কোটি যোজন দূরে অবস্থান করছে। এই প্রসঙ্গে মৌলভী মোহাম্মদ হেদায়েতউল্লা মহাশয় 'স্বদেশী আন্দোলন' শিরোনামে 'নবনূর'[২৩] পত্রিকায় উল্লেখ করেছেন— "ইংরাজ ভারতে নানা কল্যাণের অবতারণা করিয়াছেন ইহা অস্বীকার করা অকৃতজ্ঞতা। কিন্তু আমাদের পুরুষ গৌরব বজায় রাখিয়া যদি আমাদের জাতীয়তার মূলে কুঠারাঘাত করিতে প্রয়াস না পাইতেন, তাহা হইলে তিনি আমাদিগের পূর্ণ কৃতজ্ঞতা লাভ করিতেন।"

১৯০৫সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলেও এতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা হলে ১৬ই অক্টোবর তা কার্যকর করা হয়। স্যার ব্যাম্পফিল্ড ফুলার সাহেব নতুন প্রদেশের লে. গভর্নর নিযুক্ত হয়ে প্রথম দিনের দায়িত্বভার গ্রহণকালে মুসলমানেরা তাঁকে স্বাগত জানালেও অসন্তুষ্ট চিত্তে হিন্দুরা আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা প্রদানে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে উভয় সম্প্রাদযের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা, সন্দেহ ও অবিশ্বাস জন্ম নেয় এবং অনেক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় পূর্ববঙ্গে। হিন্দুরা এই দিনটিকে শোক দিবস হিসাবে পালন করে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি তোলে এবং সমগ্র ব্রিটিশ সামগ্রী বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯০৭ সালে স্বদেশি আন্দোলন বলিষ্ঠ আকার ধারণ করলেও ১৯০৮ সালে তা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের রূপ নেয় এবং এই সময়েই হিন্দু-মুসলমান বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন লর্ড মিন্টোর সমগ্র শাসনকালেই অব্যাহত ছিল। ১৯১০ সালে মিন্টোর পর ভাইসরয় হয়ে আসেন দ্বিতীয় লর্ড হার্ডিঞ্জ। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর ভ্রমণরত রাজা পঞ্চম জর্জ দিল্লীর দরবারে ঘোষণার মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গ রোধ করে দেন এবং যার ফলস্বরূপ হিন্দুরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেও সরকারের প্রতি মুসলমানদের অসন্তোষ দেখা যায়। ঠিক এই সময়েই কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয় ভারতের রাজধানী। বঙ্গভঙ্গ এবং বঙ্গভঙ্গ রোধ দুটি ঘটনাই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি করেছিল।

১৯২৫ সালের জুলাই মাসের বকরী ঈদে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে দাঙ্গা বাঁধে কলকাতার খিদিরপুরে তা ১৯২৬ সালে বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। একজন মুসলিন আততায়ীর হাতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিহত হন। খেলাফত আন্দোলনের সময় যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মৈত্রী হয়, পরবর্তীকালে তা ভেঙ্গে যেতে থাকে এবং সাম্প্রদায়িক আক্রোশ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। শুদ্ধি এবং সংগঠন নেতৃত্ব মুসলমানদের ভারত থেকে তাড়িয়ে দেবার স্বপ্ন দেখে। হিন্দু জাতীয়তাবাদের এই নতুন চেহারা দেখে মুসলমান নেতারা ভয় পেয়ে যান। তবে ১৯২৪, ১৯২৫ ও ১৯২৬ সালের বার্ষিক নিখিল ভারত মুসলীম লিগ সাম্প্রদায়িক বিরোধিতার অবসানের জন্য প্রবলভাবে চেষ্টা চালান। শুধু তাই নয় ১৯২৭ সালে কংগ্রেস হিন্দু মুসলমান সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে এবং স্বরাজ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রস্তাব পাস করে সকলের সর্ব-সম্মতিক্রমে। পরপর তিনবার ১৯২৮সালে সর্বদলীয় সম্মেলন হলেও তা সফলতা পায় নি। মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে নয় সদস্যের কমিটি গঠন করে হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা সমাধানের একটি খসড়া শাসনতন্ত্র তৈরি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই কমিটি মুসলমানদের ন্যায্য স্বার্থ, আশা-আকাঙ্খার কথা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে অসমর্থ হয় বলে নেহরু রিপোর্ট মুসলমানদের নিরাশ করে।

আলোচনা প্রসঙ্গে 'ইসলাম দর্শন'[২৩] নামক পত্রিকায় 'বিবিধ প্রসঙ্গ' শিরোনাম এ সম্পাদক মহাশয় যা লিখেছেন তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি পত্রিকায় লিখেছেন— "সমগ্র ভারতবর্ষে গত বড় দিনের অবকাশে যে সকল সভা-সমিতি অধিবেশন হইয়াছে, তন্মধ্যে কানপুরে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' এবং আলিগড়ে 'অল ইন্ডিয়া মোসলেম লীগে'র অধিবেশন সমধিক উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেস ভারতীয় হিন্দু জাতির সর্ব্বপ্রধান জাতীয় মহাসভা এবং মোসলেন লীগ ভারতবাসী মুসলমানদিগের শ্রেষ্ঠতম রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং এই দুইটি মহাসভার অধিবেশন ও রাজনৈতিক মতামতের সহিত ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের জাতীয় জীবন ও ভবিষ্যৎ হিতাহিতের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে।

...বহুদিবস অন্তে 'অল ইন্ডিয়া মোসলেন লীগে'র অধিবেশনে যে নব-জীবনে সুবাতাস প্রবাহিত হইয়াছে, উহারা সুযোগ্য সভাপতি যশস্বী স্যার আবদুল রহিম কে .সি. এস. আই, মহোদয় যে সুচিন্তিত গবেষণাপূর্ণ সুদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহাতে ব্যক্তিত্ব, অভিজ্ঞতা, রাজনীতি জ্ঞান, স্পষ্টবাদিতা ও দূরদর্শিতা অতি সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।...অসহযোগ, স্বরাজ শুদ্ধি ও আন্দোলনের আড়ালে হিন্দু নেতৃবর্গ সারা দেশে যেরূপ মোসলেম বিদ্বেষের আগুন জ্বালাইয়া বেড়াইতেছেন, মুসলমান দিগকে 'শুদ্ধ' করিয়া হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত অথবা তাহাদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য একদল হিন্দু নেতা যেরূপ অধীর ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছেন, স্যার আবদুর রহিম তাদের সমস্ত কপটতা ও ভণ্ডামীর ভেদ করিয়া তাহা দেশবাসীকে দেখাইয়া দিয়াছেন।"

সামগ্রিক দিক পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে হিন্দু-মুসলমান গণ কখনো কখনো নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মিলিত হয়েছে। তা ছাড়া সামাজিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, শিক্ষা ক্ষেত্রে, সমাজের বিভিন্ন রীতি নীতির ক্ষেত্রে, ধর্মীয় ক্ষেত্রে, পাঠ্য পুস্তকের ক্ষেত্রে, ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, হিন্দু লেখক গণের দ্বারা মুসলিম চরিত্র-চিত্রণ অঙ্কনে এবং মুসলমান লেখকগণের দ্বারা হিন্দু চরিত্র চিত্রণে—অর্থাৎ সামগ্রিক ক্ষেত্রেই হিন্দু-মুসলমান বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করেছে। এই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের পেছনে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই ত্রুটি আছে। ব্রিটিশ বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক যে ছিল না সে কথা অস্বীকার করা যাবে না, তবে ঈর্ষা এতটাই প্রবল আকার ধারণ করেছিল যে সে সম্পর্ককে ছাপিয়ে গেছে। তাই ব্রিটিশ বাংলায় সাময়িকপত্রের উপর ভিত্তি করে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক কেমন ছিল এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে মোটের উপর সম্পর্ক কখনই প্রীতিকর ছিল না।

তথ্যসংগ্রহ

১. ‘সমাজ’ : কালিমা ‘ইসলাম প্রচারক’, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯, ‘সাময়িক পত্রের জীবন ও জনমত’—মুস্তফা নূরউল ইসলাম (১ম খণ্ড, ৬১ পাতা)।

২. ‘সান্দারদের প্রতি অবিচার’ : মৌলবী আহ্ছান উল্লা ‘সাম্যবাদী’, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা; কার্ত্তিক, ১৩৩০ ‘সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত’—মুস্তফা নূরউল ইসলাম (১ম খণ্ড, ৬৩ পাতা)।

৩. ‘শ্রী সমস্যা’: মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ‘বঙ্গানূর’, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা; মাঘ, ১৩২৬, ‘সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত’—মুস্তফা নূরউল ইসলাম (১ম খণ্ড, ১৩১ পাতা)।

৪. ‘ইচ্ছাকৃত না অজ্ঞানতা প্রসূত’ : সম্পাদক ‘মাসিক মোহাম্মদী’ ৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা; ১৩৪২, পৌষ ‘সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত’—মুস্তফা নূরউল ইসলাম (২য় খণ্ড, ১৪০ পাতা)।

৫. ‘যত দোষ নন্দ ঘোষ’ : সম্পাদক ‘আল্-ইস্লাহ’, ২য় বর্ষ, ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা; ১৩৪১, ভাদ্র-আশ্বিন (২য় খণ্ড, ১৩৮-১৩৯)।

৬. ‘নারীনিগ্রহ’ : সম্পাদক ‘ছায়াবিথী’, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা; ১৩৪১, জ্যৈষ্ঠ, ‘সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত’—মুস্তফা নূরউল ইসলাম (২য় খণ্ড, ১৩৭-১৩৮ পাতা)।

৭. ‘প্রেরিত পত্র’ : শ্রী সৈয়দ আব্দুল আগফার ‘মিহির ও সুধারকর’, ৮ই পৌষ, ১৩০৬, ‘সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত’—মুস্তফা নূরউল ইসলাম (১ম খণ্ড, ১৫ পাতা)।

৮. ‘বসন্ত সহচর’ : খাদেমোল মোস্লেমীল শ্রী কাজি গোলাম মোওলা ‘প্রচারক’, ২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা : আশ্বিন, ১৩০৭ ‘সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত’—মুস্তফা নূরউল ইসলাম (১ম খণ্ড, ১৫-১৬ পাতা)।

৯. 'মুসলমান সম্প্রদায় ও তাহার পতন' : আবদুল হক চৌধুরী 'ইসলাম প্রচারক', ৮ম বর্ষ, ১১ সংখ্যা, 'সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত'—মুস্তফা নূরউল ইসলাম (১ম খণ্ড, ১৮ পাতা)।

১০. 'শিক্ষা বিস্তারের উপায়' : শেখ আবদুল গফুল জালালী 'আল্-এসলাম' ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা; আষাঢ়, ১৩২৬ 'সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত'—মুস্তফা নূরউল ইসলাম (১ম খণ্ড, ১৯ পাতা)।

১১. 'ভারতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা': মোহাম্মদ আবদুল হাকিম 'ইসলাম দর্শন', ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা; আশ্বিন, ১৩৩১, 'সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত'—মুস্তফা নূরউল ইসলাম (১ম খণ্ড, ৫৫ পাতা)।

১২. পূর্বের ১১।

১৩. হেমায়েত এসলাম, 'নূর-অল-ইমান', ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩০৭ 'সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত'—মুস্তফা নূরউল ইসলাম (১ম খণ্ড, ৩২ পাতা)।

১৪. পূর্বের ১৩।

১৫. ছাত্রজীবনের নৈতিক শিক্ষা : মোহাম্মদ ফকির উদ্দীন সরকার 'বাসনা', ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬ 'সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত'—মুস্তফা নূরউল ইসলাম (১ম খণ্ড, ৩৬ পাতা)।

১৬. 'বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান রমণীর স্থান' : আবদুল মালেক চৌদুরী 'আল্-এস্লাম, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা; বৈশাখ, ১৩২২ 'সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত'—মুস্তফা নূরউল ইসলাম (১ম খণ্ড, ২৭৬ পাতা)।

১৭. 'সাহিত্যগুরুর বাঙ্গালী-প্রীতি'—আবুল কালাম মোহাম্দ শামসুদ্দীন আল্-এস্লাম, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪
'সাহিত্যগুরুর বাঙ্গালী-প্রীতি' : আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন 'আল্-এল্সাম', ৩য় বর্ষ, ২য়সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ 'সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত'—মুস্তফা নূরউল ইসলাম (১ম খণ্ড, ২৭৬-২৭৭ পাতা)।

১৮. সলমান ও হিন্দু লেখক : সৈয়দ আবুল মোহাম্মদ এস মাইল হোসেন সিরাজী 'ইসলাম প্রচারক, ৫ম বর্ষ ১১শ-১২শ সংখ্যা; অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩১০ 'সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত'—মুস্তফা নূরউল ইসলাম (১ম খণ্ড, ২৭৯-২৮০ পাতা)।

১৯. 'রবিবাবুর আতঙ্ক' : সম্পাদক 'ছোলতান', ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০; ১লা জুন, ১৯২৩ 'সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত'—মুস্তফা নূরউল ইসলাম (১ম খণ্ড, ২৮৫-২৮৬ পাতা)।

২০. 'বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা (১৯১৯-১৯৪০), শাহজাহান মনির (১২২ পা পাতা)।

২১. 'জীবন তারা' (১৩২৬), মোহাম্মদ ইয়াছিন। (নাটক)

২২. 'কালাপাহাড়' (১৩২৬), নূরুল হক চৌধুরী। (উপন্যাস)

২৩. 'স্বদেশী আন্দোলন : মৌলভী মোহাম্মদ হেদায়েতউল্লা' 'নবনূর', ৩য় বর্ষ, ৭ সংখ্যা, কার্ত্তিক সংখ্যা, ১৩৩২, 'সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত'—মুস্তফা নূরউল ইসলাম (১ম খণ্ড, ১৬১ পাতা)।

এর সঙ্গে—

ক. 'মুসলিম সমাজ চিত্র সাম্যবাদী সাময়িক পত্রে'—সুনীল কান্তি দে।

খ. 'বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা (১৯১৯-১৯৪০), শাহজাহান মনির।

মিথ ও পুরাণের আলোকে ভদ্রার্জুন

ধ্রুবজ্যোতি পাল

পুরাণ ও মিথ বাংলা নাট্যসাহিত্যের একটি অন্যতম অবলম্বন। সেই মিথ পুরাণকে কেন্দ্র করে যখন পৌরাণিক নাটক রচিত হয় তখন দর্শক তাতে আপ্লুত হয়। বিশেষত ঊনিশ শতকের বাঙালি দর্শক পৌরাণিক নাটকের নামে ও রসতৃষ্ণায় বিশেষভাবে আবেগতাড়িত। এই শতকের শেষভাগে গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২), বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৯০১), রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪), অতুলকৃষ্ণ মিত্র (১৮৫৭-১৯১২), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) প্রমুখের রচিত পৌরাণিক নাটক বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল। এই পৌরাণিক নাটক রচনার সূত্রপাত হয়েছিল তারাচরণ শিকদারের হাতে। তাঁর 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২) নাটক বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রথম মৌলিক পৌরাণিক নাটক। এরপর প্রায় সত্তর বছর ধরে অবিশ্রান্তভাবে পৌরাণিক নাটক রচিত হয়েছে। যদিও পৌরাণিক নাটকের সংজ্ঞার নিরিখে এগুলির মধ্যে অনেক নাটকই পৌরাণিক নাটক শ্রেণিভুক্ত নয়। তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' নাটককেও যথার্থ পৌরাণিক নাটক বলতে কুণ্ঠা হয়, যদিও পৌরাণিক কাহিনি এখানে নাটকের বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে। এই নাটকের বিষয়বস্তু হলো অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রাহরণ। নাটকটি মিলনাত্মক।

ভদ্রার্জুন নাটকের কাহিনি মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্গত সুভদ্রাহরণ পর্বাধ্যায় থেকে নেওয়া হয়েছে। কাহিনিটি এদেশীয় পুরাণ নির্ভর কিন্তু নাট্য রচনার আদর্শটি পাশ্চাত্য নাটক নির্ভর। বিজ্ঞাপন অংশে নাট্যকার তারাচরণ শিকদার জানিয়েছেন— "এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে...। এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাস্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইওরোপীয় নাটক প্রায় হইয়াছে, কিন্তু গদ্য পদ্য রচনার নিয়মের অন্যথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটকসম্মত কয়েকজন নাট্যকারের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই; যথা, প্রথমে নান্দী, তৎপরে সূত্রধার ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহারদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য্য এবং বিদূষক ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায় ইওরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে। সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইঙ্গরাজি ভাষায় (Act) এক্ট কিন্তু কহে, কিন্তু প্রত্যেক (Act) এক্ট যেরূপ (Scene) সিনে বিভক্ত আছে,সংস্কৃত নাটক

তাদৃশ নহে, তন্মিলিত্ত (scene) সিন্ শব্দের পরিবর্ত্তে সংযোগস্থল ব্যবহার করা গেল। ... অতএব এই গ্রন্থ ইওরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম।[১] নাট্যকারের এই স্বীকারোক্তি থেকে বোঝা যায় যে তারাচরণ শিকদার পাশ্চাত্য নাট্যরচনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং সেই আদর্শ অনুযায়ীই তিনি নাটক রচনায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। সেই চেষ্টা অনেকটাই ফলবতী হয়েছিল। কাহিনির সুসংহত ক্রিয়াশীলগতি, নাটকীয় কৌতূহল ও আবেগের সঞ্চার এবং সংলাপের আড়ম্বরহীন স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যের ফলে ভদ্রার্জুন নাট্যপদবাচ্য হয়ে উঠেছে।[২] নাট্যকার এখানে বিষয় হিসাবে পুরাণ কাহিনির নির্বাচন ও ব্যবহারে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

মহাভারতে অর্জুন-সুভদ্রার প্রেমকাহিনিটি সুপরিচিত। দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের বিবাহের পর দ্রৌপদী-সংক্রান্ত নিয়ম ভঙ্গ করার জন্য অর্জুন বারো বছরের জন্য তীর্থ পর্যটনে যান। ঘুরতে ঘুরতে অর্জুন প্রভাসে উপস্থিত হন। তাছাড়া বহুকাল দেখা হয়নি সখা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেও। বনবাস জীবনের অভিজ্ঞতা তিনি তাঁকে বলবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। এই প্রভাসতীর্থ দ্বারকা নগরীর খুব কাছে অবস্থিত। এখানে অর্জুনকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। দীর্ঘ পথশ্রমে অর্জুন ক্লান্ত। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পাশাপাশি শয্যায় শুয়ে বার্তালাপ ও বনবাস জীবনের কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়েন। পরদিন ভোরে তাঁরা দ্বারকানগরীর উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। হাজার হাজার দ্বারকাবাসী তাঁদের দেখবার জন্য রাজপথে উপস্থিত হয়। দ্বারকানগরীতে একদিন মাত্র অবস্থান করেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিয়ে চলে গেলেন রৈবতকে। কোনো এক পূজা ও ব্রত উপলক্ষ্যে এক মহোৎসব হবে রৈবতকে। সে কারণে যাদব প্রধানরাও সস্ত্রীক ও সবান্ধব উপস্থিত হয়েছেন সেখানে। সেখানকার আবহাওয়া ও পরিবেশ অত্যন্ত মনোরম। এই মনোমুগ্ধকর পরিবেশে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দর্শকরূপে ভ্রমণ করতে লাগলেন।

সহসা গতি স্তব্ধ হয়ে গেল অর্জুনের। সখী পরিবৃতা সুন্দরী সদ্যযুবতী সুভদ্রাকে দেখে অর্জুন হয়ে উঠলেন প্রেমোন্মত্ত। এই যুবতীর পরিচয় তখনও জানেন না অর্জুন। সমগ্র বিষয়টি শ্রীকৃষ্ণও লক্ষ্য করলেন। অর্জুন তাঁর হৃদয়োচ্ছ্বাস গোপন করলেন না। এবার সুভদ্রার পরিচয় উন্মোচিত হল— তিনি বসুদেব-দুহিতা, শ্রীকৃষ্ণভগিনী। অর্জুন তাঁর রূপের বর্ণনা করে জানালেন, সুভদ্রাকে লাভ না করলে তাঁর— জীবনধারণ নিরর্থক। শ্রীকৃষ্ণ এ ব্যাপারে তাঁর পিতার সঙ্গে কথা বলে বিবাহের ব্যাপারে সর্বতোভাবে প্রয়াস করার আশ্বাস দিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ মহিষী সত্যভামা সুভদ্রাকে জানালেন যে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন তাঁর প্রেমে আত্মবিস্মৃত। লজ্জায় রক্তিম আভা স্ফুরিত হয় সুভদ্রার মুখমণ্ডলে। স্মিত হাসি উদ্ভাসিত হয় তাঁর সুকোমল অধরে। তাঁর মনোভাব অনুধাবন করে সত্যভামা বলেন যে তাঁদের প্রণয় সার্থক হোক।

পরদিন ঊষালগ্নে দেব-আরাধনার উদ্দেশ্যে রৈবতকের মন্দিরে উপস্থিত হলেন সুভদ্রা। দেব আরাধনা শেষ হবার পর মন্দির থেকে বেরিয়ে তিনি সামনে দেখতে পেলেন কান্তিমান বলদীপ্ততনু সুপুরুষ অর্জুনকে। অর্জুন তাঁকে প্রেম নিবেদন করলে সুভদ্রা তাঁকে প্রথাগতভাবে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্য প্রয়াস করতে বলে স্মিতহাস্যে ধীর পদক্ষেপে প্রস্থান করেন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন সুভদ্রার বিবাহ বিষয়ে আলোচনা করেন পিতা ও অগ্রজের সঙ্গে। কিন্তু বহুগুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অর্জুনকে পাত্ররূপে স্বীকার করতে সম্মত হলেন না তাঁরা। কারণ অর্জুন রাজা নন—রাজভ্রাতা। তাছাড়া গৃহে দ্রৌপদীর মতো প্রবলা সপত্নীও রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছে উপস্থিত হয়ে জানালেন যে তাঁর পিতা ও অগ্রজ সুভদ্রাকে তাঁর হাতে সমর্পণ করতে সম্মত নন। এমত অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে পরামর্শ দেন সুভদ্রাকে হরণ করার জন্য। এটি ক্ষত্রিয়োচিত আচরণ। পরদিন প্রভাতে প্রতিদিনের মতো রৈবতকের দেবালয়ে দেব আরাধনা সম্পন্ন করে বেরিয়ে এলেন সুভদ্রা। ঠিক সেই সময়ে সবেগে রথ নিয়ে উপস্থিত হলেন অর্জুন। সুপৌরুষ আলিঙ্গনে সুভদ্রাকে তুলে নিলেন রথে এবং রওনা দিলেন ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে।

এদিকে সুভদ্রাহরণের সংবাদ দ্বারকায় পৌঁছানো মাত্র ক্রুধোন্মত্ত হয়ে উঠলেন যাদবরা। বলরাম তখনই পরিকল্পনা করলেন অর্জুনের পশ্চাদ্ধাবন করার। সেই সময় পরিস্থিতির রাশ নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট হলেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি বোঝালেন যে অর্জুনের বংশগৌরব, শিক্ষা, শৌর্য, অস্ত্রকুশলতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, বিনয় ইত্যাদি সমগ্র ভারত-ভূখণ্ডের আদর্শ। আর বিবাহার্থে কন্যাহরণ ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে শাস্ত্রসম্মত। সর্বোপরি অর্জুন-সুভদ্রা পরস্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত। এই অবস্থায় যদি যাদবরা অর্জুনের সঙ্গে সংগ্রামে পরাজিত হন তাহলে যাদবদের মানসম্মান কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না। বরং এই মুহূর্তে উচিত সুভদ্রা ও অর্জুনকে ফিরিয়ে এনে উভয়ের বিধিপূর্বক বিবাহের ব্যবস্থা করা। শ্রীকৃষ্ণের এই কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করে তাঁরা তাঁদের ফিরিয়ে আনেন। শুভলগ্নে সম্পন্ন হল অর্জুন ও সুভদ্রার পরিণয়। পূর্ণ হলো সুভদ্রা-অর্জুনের প্রেম। মহাভারতের এই কাহিনি নাট্যকার গ্রহণ করেছেন 'ভদ্রার্জুন' নাটকে।

নাটকের প্রথমে দেখা যায় যে, নারদ গান গাইতে গাইতে যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় প্রবেশ করে জানায় তাঁদের গৃহের মধ্যেই বিবাদের অঙ্কুর আছে। ভবিষ্যতে দ্রৌপদীকে কেন্দ্র করে তা হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তাই নারদ তাঁদের মঙ্গলার্থে একটি নিয়ম করে দেন। সেটি হলো— "তোমরা এক এক জন দ্রৌপদী সহিত কালক্ষেপণ করিবে, এবং একের সময়ে অন্য যিনি দ্রৌপদীর গৃহে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে দ্বাদশ বৎসর তীর্থ

পর্য্যটন করিতে হইবেক; নতুবা সে পাপ ধ্বংস হইবেক না।" (১ম অঙ্ক / ১ম সংযোগস্থল) এরপরই এক ব্রাহ্মণ রাজদ্বারে আবেদন জানায়, তস্করে তাঁর গাভি চুরি করে পালাচ্ছে, অর্জুন যেন তা রোধ করেন। অর্জুন পড়লেন মহাবিপদে। যুধিষ্ঠির-দ্রৌপদী যে ঘরে কালক্ষেপণ করছেন সেঘরে অস্ত্রাদি আছে। অর্জুনের পক্ষে এখন সে ঘরে প্রবেশ করা নিয়মবিরুদ্ধ। তাই ক্ষণেক বিলম্ব করার কথা বললে ব্রাহ্মণ তা প্রবঞ্চনা জ্ঞান করে অভিসম্পাতের ভয় দেখান। তখন বাধ্য হয়ে অর্জুন সে ঘরে প্রবেশ করে। ব্রাহ্মণের গাভি উদ্ধার হলো ঠিকই কিন্তু নিয়মভঙ্গের জন্য অর্জুনকে যেতে হলো দ্বাদশ বৎসর তীর্থ পর্যটনে। ঘটনাটি সাধারণ কিন্তু নাট্যঘটনার দিক থেকে এর ফল সুদূরপ্রসারী। এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে নাট্যকার অর্জুনের গৃহত্যাগের কারণটি তৈরি করেছেন।

অর্জুনের দ্বাদশ বৎসর তীর্থ পর্যটন এবং পাশাপাশি দ্বারকায় সুভদ্রার বিবাহ নিয়ে আলোচনা যেন নাট্যকাহিনির মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করেছে। সুভদ্রা বিবাহযোগ্যা হয়েছেন। তাঁর বিবাহ দেওয়া জরুরি। একথা শুনে বসুদেব তাঁর জ্যৈষ্ঠ পুত্র বলরামকে পাত্রের সন্ধান করতে বলেন। বলরাম রাজা দুর্যোধনকে আগে থেকে মনে মনে পাত্র স্থির করে রেখেছিলেন কিন্তু এ ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের আপত্তি লক্ষ্য করা যায়। তিনি দুর্যোধনকে পাত্র হিসাবে ভীষণ অপছন্দ করেন। এটি পুরাণসম্মত। সুভদ্রার বিবাহ নিয়ে দেবকী রোহিণী সহচরী ও প্রতিবেশীদের নানারকম আলোচনা পুরাণসম্মত না হলেও নাট্যবিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে অর্জুন প্রভাসে উপস্থিত হন। অর্জুনের আগমন সংবাদ পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে অভ্যর্থনা করে আনতে যান। রৈবত পর্বতের উপরে মনোরম উপবনের অট্টালিকাতে অর্জুনের থাকার ব্যবস্থা করা হয় এবং তাঁর অভ্যর্থনার জন্য সত্যভামা সুভদ্রাসহ দ্বারকার অন্য পুরমহিলারা সেখানে যান। পুরাণের এই কাহিনি নাট্যকার গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে অর্জুনকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসে গমন করেন। এখানে নাট্যকার অর্জুনের প্রভাস থেকে দ্বারকায় যাওয়ার বিষয়টিকে বর্জন করেছেন। মহাভারতে দেখা যায়, অর্জুনকে প্রভাস থেকে দ্বারকায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে একদিন থাকার পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে রৈবতক পর্বতে নিয়ে যান। অন্যান্য পুরনারীদের মতো সুভদ্রা ও সত্যভামা অর্জুনকে দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন এবং ছাদ থেকে তাঁকে দেখার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। অর্জুনকে সুভদ্রা পূর্বে দেখেননি। তাই তাঁর আগ্রহ একটু বেশি। কিছুক্ষণের মধ্যে রথে করে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন এসে পৌঁছান। ছাদের উপর থেকে অর্জুনকে দেখে সুভদ্রার চিত্তচঞ্চল হয়। সত্যভামা বারবার গৃহের মধ্যে প্রবেশ করতে বললেও অর্জুন-দর্শনে তাঁর মন বিকল হয়েছে। 'অর্জুনে হেরিয়া আজি বুঝি প্রাণ যায়' সুভদ্রার। সমস্ত লজ্জা শরম বিসর্জন দিয়ে অর্জুনের প্রতি তাঁর

চিত্তচাঞ্চল্য ও পূর্বরাগের কথা ব্যক্ত করেন। অবস্থা এমন হয় যে অর্জুনকে ছাড়া তাঁর জীবন ব্যর্থ বলে মনে হয়। এ ব্যাপারে তিনি সত্যভামাকে কিছু একটা উপায় বা প্রতিকার করার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান। সত্যভামা শেষ পর্যন্ত সুভদ্রার 'মনের তাপ' দূর করার জন্য ক্ষণকাল ধৈর্য ধরতে বলেন। নাটকের এই বিষয়টি মহাভারত অনুসারী।

সত্যভামা সমস্ত ঘটনা শ্রীকৃষ্ণকে জানান। এও বলেন, যে ক্ষণে অর্জুনকে দেখেছেন তখনই তাঁকে তিনি জীবন যৌবন সমর্পণ করেছেন। তাই ধনঞ্জয় ছাড়া সুভদ্রা বাঁচবেন না। শ্রীকৃষ্ণও জানান অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহে তাঁর অমত নেই। শুধু তাই নয় তিনি সত্যভামাকে বলেন—

তুমি গিয়া অর্জুনে কহিয়া যথোচিত।
সুভদ্রার বিবাহের করহ বিহিত।।
(৩য় অঙ্ক / ৭ম সংযোজন স্থল)

এরপর সত্যভামা তাঁর কর্মকুশলতার পরিচয় দেন। তিনি সুভদ্রাকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে অর্জুনের শয়ন গৃহে উপস্থিত হন। শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি আছে জেনে অর্জুন তাঁকে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করেন। এই অংশে অর্জুনের পূর্বরাগ কিংবা প্রেমোন্মত্তার কোনো প্রকাশ লক্ষ্য করি না। অর্জুন-সুভদ্রার বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে মূলত সুভদ্রার আগ্রহ ও প্রেমোন্মত্তায়। অথচ মহাভারতে লক্ষ করা যায় যে সুভদ্রাকে রৈবতক পর্বতে দেখে অর্জুন মুগ্ধ হন। সেই মুগ্ধতার কথা তিনি শ্রীকৃষ্ণকে জানান। সৌম্যকান্তি সুপুরুষ অর্জুনকে দেখে সুভদ্রাও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। সেকারণে অর্জুন প্রেম নিবেদন করলে সুভদ্রা তাঁকে প্রথাগতভাবে বা সামাজিকভাবে বিবাহের কথা বলেন। এখানে আমরা সুভদ্রারও ইতিবাচক মনোভাবের পরিচয় পাই। কিন্তু নাটকে পারস্পরিক পূর্বরাগ কিংবা বিবাহের ব্যাপারে অর্জুনের কোনো সক্রিয় ভূমিকা দেখতে পাই না। সত্যভামার সঙ্গে সুভদ্রা অর্জুনের শয়নাগারে এলেন এবং বিবাহের ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি আছে জেনে অর্জুন সুবোধ বালকের মতো সুভদ্রাকে বিবাহ করে ফেললেন। নাট্যকার এখানে মহাভারতে বর্ণিত সুভদ্রার প্রতি অর্জুনের আকর্ষণ অনেকটাই সংক্ষিপ্ত করেছেন, এমন কী অর্জুন-সুভদ্রার পারস্পরিক কথাবার্তাও বর্জন করেছেন অনেকাংশে। এই বিষয়টি কাশীরাম দাসের মহাভারতেও লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ অর্জুন-সুভদ্রার পূর্বরাগ ও গান্ধর্ববিবাহ নাট্যকার এখানে গ্রহণ করেছেন কাশীরাম দাস থেকে।[৩]

এরপর নাট্যকাহিনি বেশ খানিকটা জটিল হয়ে পড়েছে। বলদেব সুভদ্রার বিবাহের জন্য দুর্যোধনকে পাত্র হিসাবে মনোনীত করেন। সে সংবাদ নারদ হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রসহ কৌরবপক্ষকে জানিয়ে যান। ইতিমধ্যে বলদেবেরও পত্র এসে পৌঁছায়। এতে কৌরবপক্ষ একপ্রকার নিশ্চিত হন যে দুর্যোধনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহ হচ্ছেই। অথচ অর্জুনের সঙ্গে

সুভদ্রার বিবাহ হয়ে গেছে এ সংবাদ তখন পর্যন্ত বলদেবের কাছে অজ্ঞাত রয়েছে, কৌরবপক্ষও সে সংবাদ জানে না। তাই দুর্যোধনসহ কৌরবপক্ষ বিবাহের ব্যাপারে আর বিলম্ব করতে চান না। তাঁরা অবিলম্বে দ্বারকায় গিয়ে বিবাহ সম্পন্ন করতে চান। এ বিষয়ে যাবতীয় আয়োজনও সম্পূর্ণ। বরযাত্রী যাবার জন্য যুধিষ্ঠিরকেও নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে। যুধিষ্ঠির ভীমকে দুর্যোধনের সঙ্গে বরযাত্রী হিসাবে যাওয়ার জন্য আদেশ করলে ভীম বিস্মিত হয়—

অর্জুন সংবাদ দিল পঞ্চ দিন গত।
আজি দুর্যোধন হৈল গমনে উদ্যত ।।
কৃষ্ণের আদেশে ভদ্রা বরেছে অর্জুনে।
বলদেব কিরূপে অর্পিবে দুর্যোধনে ।।

(৪র্থ অঙ্ক / ২য় সংযোগস্থল)

শেষ পর্যন্ত যুধিষ্ঠিরের পরামর্শ মতো এক অক্ষৌহিনী সেনা দিয়ে ভীম কৌরবপক্ষের সঙ্গে বরযাত্রী যাবার জন্য প্রস্তুত হন। স্পষ্টবক্তা ভীম জানিয়ে দেন যে দ্বারকাপুরী অনেক দূরে অবস্থিত,তাই হস্তিনা থেকে বরবেশে দুর্যোধনের যাওয়া উচিত নয়। কেননা কী ঘটনা ঘটবে তা কেউ জানে না। দ্বারকার কাছাকাছি গিয়ে প্রকৃত সংবাদ নিয়ে বরসজ্জায় সজ্জিত হওয়া উচিত। তা না হলে দুর্যোধনকে হয়তো মুখে কালি মেখে ফিরে আসতে হবে। কাশীরাম দাসের মহাভারতে দুর্যোধনের বরবেশে দ্বারকায় গমন লক্ষ্য করা যায়। সেখানে ভীম এক অক্ষৌহিনী সৈন্যের পরিবর্তে পাঁচ অক্ষৌহিনী সৈন্য দিয়ে বরযাত্রী হিসাবে গিয়েছিলেন। কাশীরাম দাসের বর্ণনায় সঙ্গে এখানে নাট্যবিষয়ের সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।[৪]

স্বাভাবিকভাবে সংকট ঘনিয়ে ওঠে। অর্জুন সুভদ্রাকে বিবাহ করেছেন, আবার দুর্যোধনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহের আয়োজন চলছে। এটি সম্পন্ন হলে অর্জুন প্রলয় কাণ্ড করবেন। এটি স্বাভাবিক। সংকটমোচনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনকে পরামর্শ দেন, 'কুলাঙ্গনাগণ যৎকালে সুভদ্রাকে হরিদ্রাদি মর্দ্দন করাইয়া স্নানার্থে লইয়া যাইবে' তখন অর্জুন তাঁকে হরণ করে অন্যত্র গমন করবেন। সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রথটি অর্জুনকে ব্যবহার করতে দেন। অন্যদিকে দুর্যোধন দ্বারকার কাছাকাছি এসে পৌঁছান। দূত বলদেবকে জানায় যে, দুর্যোধন আগামীকাল সদলবলে দ্বারকায় উপস্থিত হবেন। বলদেবও অন্তঃপুরে সংবাদ পাঠান, আজই কুলাচারাদি করতে হবে, আগামীকাল সুভদ্রার সঙ্গে দুর্যোধনের বিবাহ। কাশীরাম দাস তাঁর গ্রন্থে অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহে বলরামের অসম্মতি সংযোজিত করেছেন। তিনি সুভদ্রার সঙ্গে দুর্যোধনের বিবাহ দিতে চান।[৫]

এই বিবাহের কথা শুনে সুভদ্রা বিমর্ষ হয়ে পড়েন, তাঁর বাঁচার ইচ্ছেটাই নষ্ট হয়ে যায়। তাই তিনি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে চান। এখানে তাঁর সংলাপটি লক্ষণীয়—

কালকূট দেও সখি করি আমি পান।
নিশার সহিত প্রাণ হউক অবসান ।।
কাল সম কাল রাত্রি মম পক্ষে কাল।
চাহি কাল নাহি ইচ্ছা দেখিতে সকাল ।।
(৫ম খণ্ড / ৪র্থ সংযোগস্থল)

সত্যভামা তাঁকে আশ্বাস দেন যে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই কিছু একটা উপায় করবেন। তাছাড়া অর্জুন মহাবীর, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পক্ষে আছে। তাই সত্যভামা সুভদ্রাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন— ভদ্রে ব্যগ্র হও কেন ? যাঁহার নাম শ্রবণ মাত্রে রবিসুত ত্রাসান্বিত হয়, ও যাঁহার নামোচ্চারণে তাহার দূতেরও অধিকার থাকে না, সেই বিপত্তি ভঞ্জন ভগবান তোমার স্বপক্ষ, তোমার চিন্তার বিষয় কি ভদ্রে ? তুমি কি সকল বিস্মরণ হইলে ? যখন দ্রৌপদীর কারণ লক্ষ লক্ষ বীর অর্জুনের বিপক্ষে বাণ ক্ষেপ করিয়াছিল, তখন অর্জুনকে রক্ষা করিয়াছিলেন ? অর্জুনের বীরত্ব বার্ত্তা কি তোমার হৃদয় হইতে বহির্ভুত হইয়াছে ? একা ধনঞ্জয়েই রক্ষা নাই, তাহাতে কৃষ্ণ তোমার স্বপক্ষ। (৫ম অঙ্ক / ৪র্থ সংযোগস্থল)

সুতরাং সুভদ্রার কোনো ভয় নেই। তিনি অর্জুনকে অবশ্যই লাভ করবেন। এখানে সুভদ্রার হৃদয়-আলোড়ন ও মানসিক দ্বন্দ্ব সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। কাশীরাম দাসের মহাভারতে দেখা যায় যে সত্যভামা সুভদ্রার বিবাহের জন্য হস্তিনায় অর্জুনের কাছে দূত পাঠিয়েছেন। নাটকে এই বিষয়টি নেই। বিবাহের ব্যাপারে গোলোযোগ সৃষ্টি হলে শ্রীকৃষ্ণ পরামর্শ দেন যুদ্ধের কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি অর্জুনকে জানান—

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন।
লুকাইয়া ভদ্রা লয়ে করহ গমন ।।
সম রথে চড়ি যাহ মৃগয়ার ছলে।
সুভদ্রা পাঠাব আমি স্নানহেতু জলে ।।
সেই কালে লয়ে তুমি করিবে গমন।
পশ্চাতে করিব শান্ত রেবতীর মন ।।[৬]

এরই মাঝে অন্তঃপুরে সুভদ্রার বিবাহ নিয়ে হৈ চৈ পড়ে যায়। সত্যভামা রুক্মিনী প্রতিবেশিনী ও কুলকামিনীগণ সুভদ্রার গায়ে হলুদ ও স্নানের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। নানারকম বাদ্যধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি করতে করতে সুভদ্রাকে স্নান করতে নিয়ে যাওয়া হয়। এমন সময় অর্জুন সেখানে রথ নিয়ে উপস্থিত হন। সত্যভামা ও সুভদ্রা যেন অর্জুনের

আগমনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এখানে সত্যভামা ও সুভদ্রার সংলাপগুলি লক্ষণীয়—

সত্য— আর ভাবনা কি ভদ্রে, ঐ দৃষ্টি কর তোমার মনোমোহন ধনঞ্জয় আগমন করিতেছেন, তোমার আশা এখনই সফলা হইবে।

শুভ— সত্যভামে, আমি তোমার চরণে বিক্রীত হইয়া রহিলাম, জীবন অর্পণ করিলেও তোমার এ ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারিব না।

সত্য— সুভদ্রে, তুমি ত এই ক্ষণেই তোমার প্রিয়নাথ অর্জুনকে পাইবে, কিন্তু আমাদিগকে ভুলিও না।

শুভ— সখি, আমি তোমারই, তোমা হইতেই অর্জুন ধন পাওয়া, তোমারে বিস্মৃত হইলে তপন তনয় আমাকে কোন্ নরকে স্থান দিবেন, তাহা কহিতে পারি না।

(৫ম অঙ্ক / ৭ম সংযোগস্থল)

অর্জুন এলেন, সুভদ্রার হাত ধরে তাঁকে রথে তুললেন ও অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এই ঘটনায় রুক্মিণীসহ অন্যান্য কুলনারীরা আশ্চর্য হলেও সত্যভামা এর জন্য প্রস্তুতই ছিলেন এবং এমন আচরণ করলেন যেন তিনি কিছুই জানতেন না। যাইহোক, অর্জুনকে বাধা দিতে অপারগ হওয়ায় তারা সকলে সিদ্ধান্ত করলেন— "চল এই বেলা পুর মধ্যে সংবাদ দেওয়া যাউক, বাটীর পুরুষেরা যাহা উচিত হয় তাহাই করিবেন; এখনও অর্জুন বহু দূর যাইতে পারেন নাই।" (৫ম অঙ্ক / ৭ম সংযোগস্থল)

কাশীরাম দাসের মহাভারতে অর্জুনের সুভদ্রাহরণ যেভাবে বিন্যস্ত হয়েছে নাটকেও প্রায় সেভাবেই বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। কাশীরাম দাস লিখেছেন—

কৃষ্ণরথে আরোহন করি মহাবীর।
চালাইয়া দেন রথ সরস্বতী তীর ।।
যথা ভদ্রা করে স্নান নারীগণ মাঝে।
ধীরে ধীরে পার্থ তথা গেল পদব্রজে ।।
ধরিয়া ভদ্রারে তুলি চড়াইয়া রথে।
চালাইয়া দেন রথ ইন্দ্রপ্রস্থ-পথে ।।[৭]

এই ঘটনায় দুর্যোধনসহ কৌরবপক্ষ বিশেষভাবে অপমানিত হন। দুঃশাসন অর্জুনের সুভদ্রাহরণকে নিন্দা করে তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার আস্ফালন করেন—

কর্ণ তুমি শীঘ্র চল অর্জুনে বধিব।
ভদ্রা উদ্ধারিয়া দুর্যোধনেরে অর্পিব ।।

(৫ম অঙ্ক / ৮ম সংযোগস্থল)

ভীমও ছেড়ে দেবার পাত্র নন। দুঃশাসনের অর্জুন-বধের কথা শুনে স্থির থাকতে পারেন না ভীম। স্বাভাবিকভাবে তিনি বলেছেন—

আমার সম্মুখে হেন উক্তি করে কেটা।
মরণের ভয় বুঝি নাহি রাখে সেটা ।।

(৫ম অঙ্ক / ৮ম সংযোগস্থল)

শেষ পর্যন্ত ভীষ্মের আদেশ মেনে কৌরবপক্ষ হস্তিনায় ফিরে যায়। কিন্তু দুর্যোধন তাঁর অপমান ভুলতে পারেন না—

নয়নের নীর আমি কি রূপে নিবারি।
দুঃখের বচন আর কহিতে না পারি ।।
জ্ঞানে কভু হয় নাই হেন অপমান।
ইচ্ছা হয় এই ক্ষণে ত্যাজি ছার প্রাণ ।।
ভীম মোরে কটু বাক্য করিছে বর্ষণ।
তাহাতে হতেছে আজ দ্বিগুণ দাহন ।।
এই কথা দেশে দেশে হইবে প্রকাশ।
শুনি মোরে সকলে করিবে উপহাস ।।

(৫ম অঙ্ক / ৮ম সংযোগস্থল)

এই দুঃখের দিনে দুঃশাসন ও কর্ণের সান্ত্বনা বাক্যেও তাঁর অপমান কিছুমাত্র লাঘব হয়নি। কাশীরাম দাসের মহাভারতে যেভাবে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে 'ভদ্রার্জুন' নাটকে আমরা সেভাবেই দেখতে পাই।[৮]

সুভদ্রাহরণের সংবাদটি দূত বলরামকে জানালে বলরাম তা বিশ্বাসই করতে পারেন না—

কি কথা কহিলে দূত বল পুনর্ব্বার।
সুভদ্রা হরিয়াছে এ কি শুনি আর ।।

(৫ম অঙ্ক / ৯ম সংযোগস্থল)

অর্জুনের বাণে বহু যাদব সৈন্য নিতে হয়েছে জেনে তিনি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তিনি নিজেকে আর স্থির রাখতে পারেন না। অর্জুনকে তিনি উপযুক্ত শাস্তি দিতে চান কিন্তু প্রকৃত ঘটনা অবগত হয়ে কিছু করার নেই জেনে তিনি নিরস্ত্র হন। পিতা বসুদেবের কাছে গিয়ে তিনি তাঁর মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অনুযোগ ও যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পিতাকে বলেন যে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর (পিতা বসুদেব) জ্ঞাতসারে অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করেছে।

তাঁদের সম্মতি ছাড়া অর্জুন একাজ করতে কখনোই সাহস করতেন না। তাই অভিমানে বলরাম বলেন— এ চক্রে সকলেই আছেন, ভাল,— আজ অবধি আমি তোমারদিগের পুত্র নহি, এমত জ্ঞান করিবেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, বন্ধু, ভৃত্য প্রভৃতি যে ব্যক্তির বিপক্ষ, তাহার পক্ষে গৃহবাস অপেক্ষা অরণ্যবাসই উত্তম কল্প। অতএব সকলে আমার আশা ত্যাগ কর। (৫ম অঙ্ক / ১০ম সংযোগস্থল)

নাটকের এই শেষ 'সংযোগস্থল'-এ বলরামের ক্ষোভ, যন্ত্রণা, অভিমান, গ্লানি, অপমানবোধ সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অতৃপ্ত যন্ত্রণা নিয়ে তিনি বলেছেন—

এত অপমান যার জীবনে কি সুখ তার
ধিক ধিক আমার জীবন।
আছিল যতেক সুখ লজ্জায় গুঁজিয়া মুখ
হলধরে করেছে বর্জন।।
এখন দুঃখের পাশে কি করিব গৃহ বাস
লোকালয়ে না রহিব আর।
ছাড়ি সবে মম আশ সুখে কর গৃহবাস
সব আশা ঘুচেছে আমার।।
(৫ম অঙ্ক / ১০ম সংযোগস্থল)

কাশীরাম দাসের মহাভারতে অর্জুনের সুভদ্রাহরণ, যদু সৈন্যদের পরাজয়, গান্ধর্ব বিবাহের পর সুভদ্রার অর্জুনের বিবাহ ইত্যাদি বিষয়গুলি লক্ষ্য করা যায়। 'ভদ্রার্জুন' নাটকে অর্জুনের সুভদ্রাহরণ পুরোপুরি মহাভারত অনুসারী। সুভদ্রাহরণের পর অর্জুন-সুভদ্রাকে দ্বারকায় ফিরিয়ে আনা হয়েছিল এবং বিধিসম্মত বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু নাটকে তাঁদের ফিরিয়ে এনে বিবাহের বিষয়টি নাট্যকার বর্জন করেছেন। নাটকের শেষে সুভদ্রাহরণের জন্য বলরামের দীর্ঘ ক্ষোভ-অভিমান সংযোজনে নাট্যকার অনেকখানি স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন।

নাট্য উপাদানের মধ্যে চরিত্রের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণতি বিষয়ে নাট্যকারের কৃতিত্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। 'ভদ্রার্জুন' নাটকে অনেকগুলি ছোটো বড়ো চরিত্র আছে। সেগুলির রূপায়ণে পৌরাণিক পরিবেশ রক্ষিত হলেও কোনো কোনো চরিত্রে বাঙালিয়ানার মাত্রা সংযোজিত হয়েছে।[৯]

এই নাটকের নামকরণ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে এই নাটকে সুভদ্রা ও অর্জুনের উপর নাট্যকার জোর দিয়েছেন। সুভদ্রা এই নাটকের নায়িকা কিন্তু নায়িকা চরিত্রের বিকাশ দ্বন্দ্ব তেমনভাবে লক্ষ্য করা যায় না। নাটকে সুভদ্রাকে প্রথম লক্ষ্য করা যায় তৃতীয় অঙ্কের

চতুর্থ সংযোগস্থলে। প্রভাসে অর্জুনকে সুভদ্রা প্রথম দেখেন ছাদের উপর থেকে এবং দেখার সঙ্গে সঙ্গে সুভদ্রা তাঁর প্রেমে পড়ে যান। অবশ্য আগে থেকে তিনি সত্যভামার মুখ থেকে অর্জুন সম্পর্কে কিছু কথা শুনেছেন। সেটি তাঁর মনকে কিছুটা প্রস্তুত করেছে। তবে একে আর যাইহোক পূর্বরাগ বলা যায় না। তাঁর প্রণয় ও প্রণয়ের পরিণামে কোনো বাধা জটিলতা দ্বন্দ্ব কিছুই নেই— থাকলে চরিত্রটি আকর্ষণীয় হতো।

অর্জুন এ নাটকে নায়ক। তিনি মহাবীর। কিন্তু তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অন্তত নাটকে যেভাবে তাঁকে আঁকা হয়েছে। সত্যরক্ষার জন্য তিনি তীর্থযাত্রা করেছেন। এতে তাঁর চরিত্রের মহত্ত্ব প্রকাশিত কিন্তু প্রভাসে সুভদ্রাকে দেখামাত্র যে আচরণ করেছেন তা সমর্থনযোগ্য নয়। অর্জুন সুভদ্রার হাত ধরে বলেছেন— "এসো প্রিয়তমে, আমার দুঃখরাশি নাশ কর। মন্মথ বাণানল আমার বক্ষঃস্থল দগ্ধ করিতেছে, এসো— স্পর্শ করিয়া শীতল হই।" (৩য় অঙ্ক / ৮ম সংযোগস্থল)

অবশ্য পরক্ষণে সুভদ্রার প্রকৃত পরিচয় জেনে অর্জুন নিজেকে গুটিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভয় ছিল কৃষ্ণ ক্রোধান্বিত হলে পাণ্ডব কুলের নিধন হবে। তাই তিনি বলেছেন— 'কৃষ্ণের অনুমতি ব্যতিরেকে ভদ্রার অঙ্গ স্পর্শও করিব না।' স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে হয় কৃষ্ণ অনুগৃহীত অর্জুনকে যথার্থই বীর বলা যায় কী না। নাট্যকার এখানে নাট্য পরিবেশটি সঠিকভাবে নির্মাণ করতে পারেননি বলে মনে হয়।

সত্যভামা চরিত্রটি ছোট চরিত্র নয়। সে শ্রীকৃষ্ণ মহিষী। চরিত্রটির নাটকীয় বিকাশ প্রায় লক্ষ করা যায় না। সুভদ্রা ও অর্জুনের মধ্যে মিলন সংঘটনে তাঁর একটি ভূমিকা রয়েছে। তিনি অনুমতিক্রমে সুভদ্রাকে নিয়ে অর্জুনের শয়নাগারে গেছেন এবং গান্ধর্ব মতে তাঁদের বিবাহ সম্পন্ন করিয়েছেন।

এই নাটকে স্বল্প পরিসরে বলদেব (বসুদেবের জ্যৈষ্ঠপুত্র) চরিত্রটি অনেক বেশি সজীব ও আকর্ষণীয়। বসুদেব তাঁর উপর সুভদ্রার বিবাহের ভার অর্পণ করেন। বলদেব দুর্যোধনকে পাত্র হিসাবে মনোনীত করেন। অথচ তার আগেই অর্জুন সুভদ্রার বিবাহ হয়ে গেছে। অথচ বলদেবের কাছে তা অজ্ঞাত ছিল। পরে তিনি জানতে পারেন যে কৃষ্ণসহ তাঁর পরিবারের সকলের এই বিবাহে সম্মতি ছিল। তখন বলদেব তাঁর অপমান-অভিমান আর চেপে রাখতে পারেন না।তাদের সাহস না পেলে অর্জুন কখনোই একাজ করতে সাহস করতেন না। তাই অভিমানাহত কণ্ঠে তিনি পিতাকে বলেন— "এ চক্রে সকলেই আছেন, ভালো,— আজ অবধি আমি তোমারদিগের পুত্র নহি, এমত জ্ঞান করিবেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, জাতি, বন্ধু,ভৃত্য প্রভৃতি যে ব্যক্তির বিপক্ষ, তাহার পক্ষে গৃহবাস অপেক্ষা অরণ্যবাসই উত্তম কল্প, অতএব সকলে আমার আশা ত্যাগ কর।" (৫ম অঙ্ক /

১০ম সংযোগস্থল)

কনিষ্ঠ কর্তৃক অপমান তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না। তাঁর এই ব্যক্তিত্ব আমাদের স্পর্শ করে। অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে ভীম ও দুর্যোধন চরিত্র আমাদের কিছুটা আকর্ষণ করে।

তারাচরণ শিকদার ইউরোপীয় নাট্যকলার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। নাট্যদ্বন্দ্ব ও চরিত্রের বিকাশের উপর যে নাটকের সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভর করে এ বিষয়টি তার অজানা ছিল না। এ বিষয়ে তিনি আর একটু নজর দিলে নাটকের শিল্পগুণ আরো বৃদ্ধি পেত বলে মনে হয়। তবে প্লট নির্মাণে তাঁর কৃতিত্বকে অবহেলা করা যায় না। এই প্লট নির্মাণে তিনি মহাভারতের মূল কাহিনিতে প্রায় হুবুহু অনুসরণ করেছেন, বিচ্যুতি প্রায় চোখেই পড়ে না। বিশেষত কাশীরাম দাসের স্পষ্ট অনুসরণ এই নাটকে দেখা যায়। এখানে নাট্যকারের অবলম্বন প্রাচীন ভারতীয় পুরাণ কাহিনি। আর সেই কাহিনির রূপায়ণের প্রণালীটি আধুনিক ইউরোপীয় নাট্যকলার অনুসারী। অন্ততঃ নাট্যকার সে-রকমই দাবি করেছেন 'বিজ্ঞাপন' অংশে। যদিও সেই দাবি অনেকাংশে সঠিক নয় বলে আমরা মনে করি। কেননা ভদ্রার্জুন, নাটকের মধ্যে আমরা সংস্কৃত নাটকের প্রতিধ্বনি ও অনুসরণ কিছুটা হলেও অনুভব করি। তাহলেও 'ইওরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলানুসারে শ্রেণীবদ্ধ' করে 'ভদ্রার্জুন' নাটকের প্রকাশে নাট্যকারের কৃতিত্ব স্মরণীয় এবং পুরাণ কাহিনি ও পৌরাণিক চরিত্রের যথাযথ অনুসরণ ও রূপায়নের সাফল্য প্রশংসনীয়।

তথ্যসূত্র

১. পুরাতন বাংলা নাটক সংকলন—সম্পা. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৮২, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৭।

২. বাংলা নাটকের ইতিহাস— অজিতকুমার ঘোষ, পরিবর্ধিত ৭ম সং. ১৯৮৫, জেনারেল, কলকাতা, পৃ.৪৪।

৩. মহাভারত— কাশীরাম দাস, ষষ্ঠ রাজ সং, ২০১৪, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ২১৬।

৪. মহাভারত— কাশীরাম দাস, ঐ, পৃ. ২২৪।

৫. মহাভারত— কাশীরাম দাস, ঐ, পৃ. ২১৭।

৬. মহাভারত— কাশীরাম দাস, ঐ, পৃ. ২২২।

৭. মহাভারত— কাশীরাম দাস, ঐ, পৃ. ২২৫।

৮. মহাভারত— কাশীরাম দাস, ঐ, পৃ. ২২৯।

৯. বাংলা নাটকের ইতিহাস— অজিতকুমার ঘোষ, ঐ, পৃ. ৪৫।

নারীর অধিকার ও বৈদিক সাহিত্য

ড. বিপুল চন্দ্র বেপারী

সারাংশ : বেদ পরমজ্ঞান। "বেদ: অখিলধর্মমূলম্।" ধর্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদক অপৌরুষেয় শ্রুতিবচন বেদ প্রবহমান ধারায় গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে শ্রবণবিধৃত ও স্মৃতিসঞ্চিত। বেদমূলক বর্ণাশ্রম ধর্মে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও বেদে অধিকার ছিল কিন্তু শূদ্র পুরুষ বা নারীর ছিল না। বৈদিক যুগে পুরষরা গুরুগৃহে থেকে শিক্ষা লাভ করলেও নারীদের ক্ষেত্রে তেমন কোনো ব্যবস্থা না থাকলেও নারী শিক্ষার ব্যবস্থা বৈদিক যুগে ছিল। নারীদের শিক্ষার পাশাপাশি অধ্যাপনা, রাজনীতি, ধর্মনীতি, সামরিক কার্যকর্মাদি নানা ক্ষেত্রে পারদর্শী ও পদমর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। এছাড়াও বৈদিক যুগের নারীরা বুদ্ধিনিষ্ঠ, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, ললিতকলাবিষয়ক, যুদ্ধবিদ্যা, শরীরচর্চ্চাদি নানাবিধ শিক্ষায় ছিলেন অগ্রগণ্যা। বৈদিক যুগে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটলেও ধর্মসূত্র ও মনুসংহিতার সময় থেকেই নারী শিক্ষার ক্রমাবনতির চিত্র চোখে পড়ে। উপনয়ন ও বেদপাঠে তারা অধিকার হারায়। যা আজও প্রবহমান ধারায় বয়ে চলেছে। আজও নারীদের গায়ত্রী মন্ত্র জপ করার কোনো অধিকার নেই। নারী সমাজের এই যে ক্রমাবনতি, এটি মূলত: সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে মহাব্যাধির আকার ধারণ করেছে। শূদ্র নারী-পুরুষদের মতোই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নারীদের দুর্দশাও শিক্ষাদি নানাবিধ ক্ষেত্রে প্রকটরূপ ধারণ করেছে। নারী সমাজকে এই দুরূহ ব্যাধির কবল থেকে মুক্তি পেতে হলে সকল নারী সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সচেতন হতে হবে, এছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

মূলশব্দ : পরমজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, অপৌরুষেয়, শ্রুতিবচন, শ্রবণবিধৃত, শিক্ষা, রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি, আধ্যাত্মিকতা, ললিতকলা, যুদ্ধবিদ্যা, সঙ্ঘবদ্ধতা, বেদপাঠ, গায়ত্রীমন্ত্র প্রভৃতি।

ভূমিকা : ধর্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদক অপৌরুষেয় শ্রুতিবচন হল বেদ। বেদ পরমজ্ঞান। "বেদ: অখিলধর্মমূলম্।" বেদ প্রবহমান ধারায় গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে শ্রবণবিধৃত ও স্মৃতিসঞ্চিত। বেদের অপর নাম 'শ্রুতি'। বর্ণাশ্রম ধর্ম বেদমূলক। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পুরুষের পাশাপশি নারীদেরও বেদ পাঠে অধিকার ছিল কিন্তু শূদ্র পুরুষ বা নারীর ছিল না।

বৈদিক যুগে পুরুষরা গুরুগৃহে থেকে শিক্ষা লাভ করলেও নারীদের ক্ষেত্রে তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিল না। পুরুষদের শিক্ষার জন্য শিক্ষালয় থাকলেও নারীশিক্ষার জন্য শিক্ষালয় ছিল কিনা তার কোনো স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় না। তবে নারী শিক্ষার ব্যবস্থা যে বৈদিক যুগে ছিল এবং নারীরা যে অধ্যাপনা করতেন তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। শিক্ষার পাশাপাশি রাজনীতি, ধর্মনীতি, সামরিক কার্যকর্মাদি নানা ক্ষেত্রে যে নারীর পদমর্যাদা ছিল, নারীরা যে পারদর্শী ছিলেন তার বহুল তথ্যসম্বলিত প্রমাণ বৈদিক সাহিত্য থেকে আমরা জানতে পারি। বৈদিক যুগে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটলেও ধর্মসূত্র ও মনুসংহিতার সময় থেকেই নারী শিক্ষার ক্রমাবনতির চিত্র চোখে পড়ে। শূদ্র নারী-পুরষদের মতোই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নারীদের দুর্দশা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকটরূপ ধারণ করে।

মন্ত্রদ্রষ্টা নারী : বৈদিক যুগে মন্ত্রদ্রষ্টা নারী, অধ্যাপিকা, শিষ্যা, তপস্বিনী, ব্রহ্মচারিণী ও ব্রহ্মবাদিনীর নাম দৃষ্টিগোচর হয়। তন্মধ্যে অন্যতমা বিশ্ববারা, রোমশা, লোপামুদ্রা, অভ্রণীবাক্, অপালা, জুহু, পৌলমী, কাক্ষীবতী, ঘোষা, জরিতা, শ্রদ্ধা, কামায়ণী প্রভৃতি। বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে এই সকল নারীদেরকে 'ব্রহ্মবাদিনী' আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। "বৃহস্পতিপুত্রী রোমশা ব্রহ্মবাদিনী।" বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে এরকম ২৭ জন নারী ঋষির নাম দৃষ্টিগোচর হয়। ঋগ্বেদের সংবাদসূক্ত থেকে যমী, উর্বশী, সর্পরাজ্ঞী, ইন্দ্রাণী এবং সামবেদ থেকে নোধা, গোপায়না, শিকতা, নিবাবরী প্রভৃতি নারী ঋষির কথা জানা যায়।

বেদে অধিকারী ত্রি-বর্ণের নারী : সংহিতার যুগ থেকে সূত্রসাহিত্যের যুগ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের নারী পবিত্র সূত্র দ্বারা অর্থাৎ উপনয়নে দীক্ষিত হোত। এছাড়া ব্রহ্মগায়ত্রী উচ্চারণ, অগ্নি আধান, বেদ পাঠাদি করতে পারত। স্মৃতিকার যম-এর মতে—

"পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনম্ ইষ্যতে।
অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা।।"

নারীর উপনয়ন : ব্রহ্মসূত্র দ্বারা উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হয়ে নারীরা বেদ পাঠ ও সাবিত্রী মন্ত্র উচ্চারণের অধিকারী হোত। স্মৃতিকার যম-এর অভিমত কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে স্মৃতিকার হারীত যম-এরই কথার প্রতিধ্বনি করে বলেছেন—

"পুরাকল্পে তু নারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনম্ ইষ্যতে।
অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা।।"

বৈদিক যুগে নারীর দুটি বিভাগ ছিল— ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ। ব্রহ্মবাদিনীদেরই উপনয়ন সংস্কার হোত। আবার উৎসবের মাধ্যমে ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা উপনীত করে সদ্যোবধূদের বিবাহ দেবার রীতিও প্রচলিত ছিল। এই উপনীত হওয়াকে বলা হোত নবজন্ম।

অবিবাহিতা ব্রহ্মবাদিনী নারী : নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী পুরষদের মতো ব্রহ্মবাদিনী নারীরা বিবাহে আবদ্ধ না হয়ে চিরকৌমার্য ব্রত পালন করত। নারীদের উপনয়ন বিষয়ে গৃহ্যসূত্রে বলা হয়েছে— "প্রাবৃতাং যজ্ঞোপবীতিনীম্ অভ্যুদানয়ন্ জপেৎ সোমো দদৎ গন্ধর্বায়েতি।" অর্থাৎ বর উপবীতধারিণী নববধূর হাত ধরে "সোমো দদৎ গন্ধর্বায়" মন্ত্র পাঠ করত। কেউ কেউ এই প্রথাটিকে পৌরাণিক যুগের স্মারক বলেছেন। মহাভারতের বনপর্বে দৃষ্টিগোচর হয়, পাণ্ডবমাতা কুন্তীকে একজন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মসূত্র দ্বারা ভূষিত করে অথর্ববেদোক্ত গায়ত্রী শিরসমন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করেছিলেন—

"ততস্তাম্ অনবদ্যাঙ্গীং গ্রাহয়ামাস স দ্বিজ:।
মন্ত্রগ্রামং তদা রাজন্ অথর্ব-শিরসি শ্রুতম্।।"

ব্রহ্মসূত্র দ্বারা উপনীত নারী : কবি বাণভট্ট একজন নারীর কথা বলেছেন, যিনি ব্রহ্মসূত্র দ্বারা উপনীত হয়েছিলেন। খ্রি. সপ্তম শতকেও ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, কবি বাণভট্টের কথায় তার ইঙ্গিত মেলে। কবির ভাষায়— "ব্রহ্মসূত্রেণ পবিত্রীকৃতায়াং কন্যায়াম্।"

দ্বিজ রমণীগণের উপনয়ন : দ্বিজ পুরুষের পাশাপাশি দ্বিজ নারীগণও বৈদিক যুগে উপনয়নে উপনীত হতেন এবং বেদাধ্যয়ন করতেন— একথা স্মৃতিচন্দ্রিকা, নির্ণয়সিন্ধু ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রসমূহ থেকে জানা যায়। আচার্য মনুরও একথা জানা ছিল। তবে মনুর সময় নারীর উপনয়ন প্রথা প্রায় বিলুপ্তির পথে, যা আজও প্রবহমান।

পত্নী শব্দের ব্যুৎপত্তি : 'পত্নী' শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে মহামতি পাণিনী অষ্টাধ্যায়ীতে বলেছেন— "পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে।" স্বামীকে যজ্ঞকর্মে সাহায্য করার জন্যই 'পতি' শব্দের সঙ্গে 'ন' প্রত্যয় যুক্ত হবে। বোঝা যায় যে, 'স্ত্রী' শব্দের সমানার্থক 'পত্নী' শব্দের অর্থ যজ্ঞকর্মে পতির সহযোগিনী। তবে বিপত্নীকের যজ্ঞকর্মে অধিকার ছিল না। উদাহরণ হিসেবে রামচন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞের কথা বলা যায়। সীতা নির্বাসনে থাকার সময় রামচন্দ্র স্বর্ণময় মূর্তি নির্মাণ করে রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন। স্ত্রী হল যজ্ঞের এক অর্ধাংশ। শতপথ ব্রাহ্মণের ভাষায় বলা যায়— "অর্ধো হ বা এষ যজ্ঞস্য যৎ পত্নী।" 'পত্নীসংযাজ' যাগে যজমান পত্নী বেদমন্ত্র পাঠ করতেন ও পুরোহিতদের সঙ্গে আসন গ্রহণ করতেন। শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে— "ন বৈ অপত্নীকস্য হস্তাৎ দেবা বলিং গৃহ্নন্তি।" অর্থাৎ অবিবাহিতদের কাছ থেকে দেবতারা আহুতি গ্রহণ করেন না। অশ্বমেধ যজ্ঞে রাজার চারজন রানী অংশগ্রহণ করে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিলেন।

নারীর অধিকার : বিবাহে নববধূকে অনেক বেদমন্ত্র পাঠ করতে হয়। কেননা, পুরোহিত, বর বা বধূর পিতা ঐ মন্ত্রগুলি পাঠ করলে মন্ত্রের অভিপ্রায় ব্যর্থ হবে। কুশণ্ডিকাতে নববধূর

ধ্রুবনক্ষত্রকে উদ্দেশ্য করে মন্ত্র পাঠ দেখা যায়— "ধ্রুবং দ্যৌ: ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবেয়ম্, ধ্রুবাহং পতিকূলে ভূয়াসম্।" অর্থাৎ এই মন্ত্রটি হল স্বামী গৃহে স্ত্রীর স্থির থাকার প্রতিজ্ঞা মন্ত্র। আচার্য গোভিল-এর ভাষায়— "ইমং মন্ত্রং পত্নী পঠেৎ।"

ব্যাকরণে নারীবাচক শব্দের ব্যুৎপত্তি : আচার্য পাণিনী তার অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে কয়েকটি সূত্র করেছেন, যেখানে নারীবাচক কঠী, কলাপী বহ্বৃচী প্রভৃতি শব্দগুলি স্থান পেয়েছে। বেদের কঠ শাখায় সুপণ্ডিত নারীকে কঠী, বহ্বৃচ শাখায় সুপণ্ডিত নারীকে বহ্বৃচী ও কলাপ শাখায় সুপণ্ডিত নারীকে কলাপী বলা হোত। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, বেদে নারীদের পূর্ণ অধিকার ছিল।

নারীর পেশা ও বিদুষী নারী : বৈদিকযুগে নারীরা সম্মানজনক পেশায় নিযুক্ত হতেন, পাণিনীর ব্যাকরণ থেকে গৃহীত আচার্যা ও আচার্যাণী, উপাধ্যায় ও উপাধ্যায়ানী এই দুটি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত সূত্র তা প্রমাণ করে। আচার্যা ও উপাধ্যায়া এই শব্দদ্বয়ের অর্থ হল নারী অধ্যাপিকা। আর আচার্যাণী ও উপাধ্যায়ানী এই শব্দদ্বয়ের অর্থ হল অধ্যাপকের স্ত্রী। এরা শিক্ষিত নাও হতে পারেন। মহর্ষি পতঞ্জলির মহাভাষ্যেও আচার্যা ও উপাধ্যায়া শব্দের ব্যাখ্যা আছে। তিনি এ প্রসঙ্গে আপিশালা ও ঔদমেধা নমক দুজন বিদূষী নারীর উল্লেখ করেছেন। নারীরাও যে ব্যাকরণ শাখায় পারদর্শী ছিলেন তার প্রমাণ সুস্পষ্ট। কাশিকাবৃত্তিকার কাশকৃৎস্নব্রাহ্মণী নামে একজন নারী অধ্যাপিকার উল্লেখ করেছেন যিনি কাশকৃৎস্ন ব্যাকরণে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

বিদুষী নারীর পরিচয় : বৈদিক সাহিত্যে, সংহিতায়, ব্রাহ্মণে, উপনিষদে অনেক বিদুষী নারীর পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বৃহদারণ্যকোপনিষদে দেখা যায়, বিদুষী নারীর মধ্যে গার্গী ছিলেন অন্যতমা। বচক্নুর কন্যা গার্গীজ্ঞানী, বিদুষী ও তপস্বিনী ছিলেন। জনকরাজার রাজসভায় জ্ঞানীগুণীর বিতর্কানুষ্ঠানে সকল ঋষিরা যখন যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে পরাজিত হন, গার্গী তখন সেই বিতর্কানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বিতর্কানুষ্ঠানে উভয়ে সমান পারদর্শিতা দেখান। জয়-পরাজয় অঘোষিত থাকে।

সাংসারিক ও ব্রহ্মবাদিনী নারী : যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী— মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়ণী। মৈত্রেয়ী আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন ও ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন কিন্তু কাত্যায়ণী ছিলেন সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দে বিশ্বাসী। যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন। তিনি পার্থিব বিত্ত দুই পত্নীকে ভাগ করে দেবার অভিলাষ পোষণ করলে কাত্যায়ণী তা গ্রহণ করার বাসনা পোষণ করলেন কিন্তু মৈত্রেয়ী অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। যা থেকে অমৃতত্ত্ব লাভ সম্ভব নয়, এরূপ পার্থিব বিত্তে মৈত্রেয়ীর কোনো বাসনা নেই। "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্।" মৈত্রেয়ীর কথায় মানবাত্মার চিরন্তন বাণী ঘোষিত। ভিন্টারনিৎস ভারতীয় নারীর উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

মেথিউ আরনল্ড বলেছেন— "Divine Discontent." অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রদত্ত অসন্তোষ।

প্রথিতযশা নারী : অগ্নিহোত্র হোম দুইদিনে না একদিনে সম্পন্ন হবে এ নিয়ে পুরোহিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। অগ্নিহোত্র হোম সকালে ও বিকালে সম্পন্ন হোত। প্রত্যুষের হোম ও সায়ন্তন হোম এরকম ধরলে হোমটি একদিন নিষ্পাদ্য। আবার পূর্বদিবসের সায়ন্তন হোম থেকে আরম্ভ করে পরের দিনের প্রত্যুষ হোম পর্যন্ত ধরলে দুইদিনে নিষ্পাদ্য ধরতে হয়। এই মতবিরোধের অবসানের জন্য পুরোহিতগণ 'কুমারী' নামে এক বিদূষী নারীর নিকট উপস্থিত হলে তিনি 'দুইদিনে নিষ্পাদ্য' মতটি সমর্থন করেন এবং পুরোহিতগণ তা মেনে নেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে যে, সায়ন্তন হোম সূর্যাস্তের পর এবং প্রত্যুষ হোম সূর্যোদয়ের পর হয়। আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্রে 'বড়বা প্রাতিথেয়ী' নামে এক বিদূষী নারীর উল্লেখ দৃষ্টগোচর হয়।

বিদূষী কন্যার অভীপ্সা : পিতা-মাতা বিদ্বান্ পুত্রের পাশাপাশি বিদূষী কন্যাও কামনা করতেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে— কেউ যদি দীর্ঘায়ুযুক্তা বিদূষী কন্যা লাভ করতে চান, তাহলে তিনি তার পত্নীকে আজ্য মিশ্রিত তিল তণ্ডুল রান্না করে সেবন করান। "অথ য ইচ্ছেৎ দুহিতা মে পণ্ডিতা জায়তে।"

শাস্ত্র নিষ্ণাত নারী : বৈদিক যুগের নারীরা নানাশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। নারীরা তপস্বী জীবন যাপন করতে পারতেন। মহাভারতে দেখা যায়, শাস্ত্র নিষ্ণাত তপস্বিনী ভিক্ষুণী সুলভা রাজা জনকের নিকট আধ্যাত্মিক আলোচনা করেছিলেন। রামায়ণে দেখা যায়, সিদ্ধা তাপসী ঋষি শবরী রামচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। দ্রৌপদীর রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের কথা মহাভারত থেকে জানা যায়। যোগাবশিষ্ঠ রামায়ণে উল্লেখ আছে, স্বামী শিখিধ্বজের মোহমগ্ন আত্মাকে উদ্দীপিত ও জাগ্রত করতে রানী চুড়ালা নানা তত্ত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছিলেন। সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত 'পরিব্রাজিকা' শব্দ বলে দেয় যে, বৈদিক পরবর্তী যুগেও নারীদের প্রাচুর্য্য বজায় ছিল। মেগাস্থিনিসের ভাষায়— "বহু নারী বিদ্বান্ চিরকুমার পুরুষ ঋষিদের মতো চিরকৌমার্য অবলম্বন করে শাস্ত্রচর্চ্চা করতেন এবং ঋষিদের সঙ্গে শাস্ত্র বিচারে প্রবৃত্ত হতেন।"

ব্রহ্মচারিণী নারী : বৈদিক সাহিত্য, মহাভারত, পুরাণাদিতে ব্রহ্মচর্য পালনরতা বহু নারীর কথা আছে। ব্রহ্মচর্য শেষে যুবতীদের যোগ্য পাত্রে বিবাহ দেওয়া হোত। যজুর্বেদে উক্ত হয়েছে— "ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্।" অথর্ববেদে বলা হয়েছে— রমণীগণ গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশের আগে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে ব্রহ্মচর্য পালন করতেন। মহাভারতে শাণ্ডিল্য ও গর্গ্যের কন্যারা ব্রহ্মচারিণী নামে ভূষিত হয়েছিলেন।

বহুপেশায় নিযুক্তা নারী : বৈদিক যুগের নারীরা নৃত্য-গীতাদি শিক্ষায় পারদর্শী ছিলেন।

ললিতকলা ছিল নারীদের শিক্ষণীয় বিষয়। "নৃত্যং গীতং স্ত্রীণাং কর্ম।" শতপথ ব্রাহ্মণের একটি মনোজ্ঞ কাহিনির উপস্থাপন করা যায়— "গন্ধর্বগণ দেবতাদের সোমরস অপহরণ করলে দেবতাগণ চিন্তা করলেন যে, গন্ধর্বগণতো সঙ্গীত প্রিয় ও নারীর প্রতি আসক্তিপরায়ণ, তাই দেবতাগণ সঙ্গীত ও নৃত্যকলা সৃষ্টি করে বাগ্‌দেবীকে শিক্ষা দিলেন। বাগ্‌দেবী নৃত্য-গীত ও বীণার ঝঙ্কারে গন্ধর্বগণকে মুগ্ধ করে, তাঁদের নিকট থেকে অপহৃত সকল সোমরস ফিরিয়ে আনেন।"

যজ্ঞে সামগানরতা নারী : সামবেদের উদ্‌গাতা পুরোহিতগণের পত্নীরা যজ্ঞে সামগান করতেন। তৈত্তিরীয় ও মৈত্রায়ণী সংহিতায় এর সমর্থন মেলে। সীবন, বয়ন, পশমের কাজ, বস্ত্রালঙ্করণ প্রভৃতির বিদ্যায় নারীরা সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অলঙ্করণ শিল্প ব্যাপক সমৃদ্ধি ও খ্যাতি লাভ করেছিল। নারীর অপর নাম হয়েছিল 'পেশস্করী'। পরবর্তীকালে এই শব্দটির নাম হয় 'রঙ্গীন পতঙ্গ' এবং গৌণার্থে 'বারবণিতা'।

কর্মকারী নারী : নারীরা সূতা ও বস্ত্রাদি রঙ্ করার কাজে পারদর্শী ছিল। তাই তাদের পরিচয় হল 'রজয়িত্রী' নামে। এছাড়া মঞ্জুষা নির্মাণ, রজ্জু তৈরী, তুলা থেকে সূতা তৈরী প্রভৃতি নানা রকম কুটির শিল্প কর্মে নারীরা ছিল সিদ্ধহস্ত। শুক্লযজুর্বেদে নারীদের এরূপ ৭০টি পেশার উল্লেখ পাওয়া যায়।

সামরিক ক্ষেত্রে নারী : সামরিক শিক্ষা বৈদিক যুদে নারীরাও লাভ করত। যুদ্ধক্ষেত্রে নারীর অবদান ছিল অতুলনীয়। রাজমহিষীরাও যুদ্ধে অংশ নিতেন। রাজা নমূচির পত্নী দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। আশ্বিনসূক্ত থেকে রাজা খেলের রানী বিশ্‌পলার বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনি জানা যায়। রণপণ্ডিত বীরাঙ্গণা মুদ্‌গলানীর নাম চিরভাস্বর হয়ে রয়েছে। মহাভারতের সুভদ্রার নামও বীরত্বব্যঞ্জক। দাসবর্ণের অনার্যদের সৈন্যবাহিনীতেও নারী সৈন্য থাকত। কথিত আছে— "স্ত্রিয়ো হি দাস আয়ূধানি চক্রে কিং মকরন্নবলা অস্য সেনা ?" ইন্দ্রসূক্তেও কথিত আছে— অসুর বৃত্রের মতা ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে ইন্দ্রের হাতে নিহত হয়েছিলেন। এছাড়াও ঋগ্বেদের অনেক সূক্তে আর্যনারীদের বীরত্বব্যঞ্জক কার্যকলাপ ও যুদ্ধবিদ্যার দক্ষতার কথা পরিদৃষ্ট হয়।

অন্যান্য কর্মে নিযুক্তা নারী : বৈদিকোত্তর যুগেও নারীরা সামরিক ও শারীরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করত। চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদরক্ষী তরবারি ধারিণী ও ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী নারী বাহিনী ছিল। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে শাক্তিকী নামে বর্শা ও বল্লম নিক্ষেপকারিণী নারীর উল্লেখ আছে।

উপসংহার : বৈদিক যুগের নারীরা বুদ্ধিনিষ্ঠ, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, ললিতকলাবিষয়ক, যুদ্ধবিদ্যা, শরীরচর্চ্চাদি নানাবিধ শিক্ষালাভ করত। বৈদিক যুগে নারীর শিক্ষার সর্বাধিক

প্রসার লাভ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তা আস্তে আস্তে ম্লান হতে থাকে। মনুসংহিতা ও ধর্মসূত্রের কালে তা সবিশেষ তলানিতে নেমে আসে। শূদ্রদের ন্যায় উচ্চবর্ণের নারীদেরও চরম দুর্দশার দিন ঘনিয়ে আসে। উপনয়ন ও বেদপাঠে তারা অধিকার হারায়। যা আজও প্রবহমান ধারায় বয়ে চলেছে। আজও নারীদের গায়ত্রী মন্ত্র জপ করার কোনো অধিকার নেই। নারী সমাজের এই যে ক্রমাবনতি, এটি মূলত: সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে মহাব্যাধির আকার ধারণ করেছে। জানিনা নারী সমাজ এই মহাব্যাধির কবল থেকে কবে মুক্তি লাভ করতে পারবে ?

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. অথর্ববেদ সংহিতা, শ্রীপাদ দামোদর ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত, 'স্বাধ্যায় মণ্ডল' পারণ্ডী (বি. সুরত) ১৯৫৭।

২. অষ্টাধ্যায়ীসূত্রপাঠ, গোপাল দত্ত পাণ্ডে সম্পাদিত, চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, তৃতীয় সংস্করণ, বারাণসী, ১৯৮৭।

৩. উপনিষদ (অখণ্ড সংস্করণ), অতুল চন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী, পুনঃমুদ্রণ, জানুয়ারি, কলকাতা, ১৯৯৪, ১৯৯৮।

৪. ঋগ্বেদ সংহিতা, অশোক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৬-১৯৭৭।

৫. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, বিনায়ক গণেশ আপটে সম্পাদিত, সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, আনন্দাশ্রম, ১৯৩১।

৬. বাল্মীকি রামায়ণ, ভি, রামস্বামী শাস্ত্রলু সম্পাদিত, মাদ্রাজ, বাবিল্লা যন্ত্রে, ১৯২৮।

৭. বাল্মীকি রামায়ণ, শ্রী অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত, মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং পাবলিশিং হাউস লি:, কলকাতা, ১৩৩৮।

৮. বাল্মীকি রামায়ণ, শ্রী হেমন্ত কুমার কাব্যব্যাকরণ তর্কতীর্থ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত, মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লি:, কলকাতা, ১৩৪২।

৯. মনুসংহিতা, মাধব দাস চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত, কমলা বুক ডিপো লি:, কলকাতা, ১৯১৬।

১০. মহাভারত, শ্রী হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত, সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়, কলকাতা, ১৩৪৬।

১১. যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, বাসুদেব শর্মা সম্পাদিত, নির্ণয় সাগর প্রেস, কোলভাট্ লেন, বোম্বে, ১৯১৮।

১২. স্মৃতিতত্ত্ব, শ্রী জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত, নারায়ণ যন্ত্রে মুদ্রিত, কলকাতা, ১৩১২।

১৩. স্মৃতিচন্দ্রিকা, এস. শ্রীনিবাসাচার্য্য সম্পাদিত, গভর্ণমেন্ট ওরিয়েন্ট্যাল সিরিজ, মহীশূর, ১৯০৪।

স্মৃতিগ্রন্থে নারীদের সামাজিক অবস্থান

শ্রী রঞ্জন মাহাত

সামাজিক প্রাণী হিসাবে মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমাজের মধ্যে অবস্থান করে থাকে। সামাজিক পরিস্থিতিকে বজায় রাখার জন্য নরনারী উভয়েই মহত্ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয়েই একে অপরের পরিপূরক। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্ত্রী পুরুষের প্রেরক শক্তি হিসাবে কাজ করে। বিশ্বের সবথেকে বড় সফলতার পেছনে নারীর ভূমিকা অপরিহার্য, সে কবি হোক বা সাহিত্যিক বা অন্য যে কোনো সফলতার পেছনে নারীর অবদান আছে। কালিদাসের মতো প্রভাবশালী কবি, নেপোলিয়নের মতো বিজেতা, মাইকেল ফ্যারাডের মতো বিজ্ঞানবেত্তাও বা অনেক বিশ্ব নির্মাণকারী এবং সংসারধর্মত্যাগ-কারীদের জীবনশৈলীতে নারীদের মহত্ত্বপূর্ণ যোগদান সর্বজন বিদিত।[১]

নারী শব্দটি নৃ-ধাতুর সহিত ঙীন্ প্রত্যয় করে উৎপন্ন হয়েছে। যার অভিপ্রায়, মানুষ জাতীয় নারী।[২]

কোথাও স্ত্রী শব্দ— 'সত্যায়াতি গর্ভোহস্যামিতি' অর্থাৎ গর্ভধারণরূপ যোগ্যতা অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে নারী মূলতঃ হয় পুরুষের শিক্ষক। কেননা— পিতা পুনরায় নিজ পত্নী থেকে আবির্ভূত হয়ে থাকে। (জায়তে পুত্রঃ) এই জন্যই তাকে জায়া বলা হয়ে থাকে। তাই বলা হয়— "তজ্জায়া জায়া ভবতি যদস্যাং জায়তে পুনঃ"

অথর্ববেদের অন্তর্গত গোপথব্রাহ্মণে নারীদের আদি শক্তিরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। নারীদের দেবী এবং মাতৃশক্তির প্রতীকরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৩]

স্মৃতিকারদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন মনু। মনুর বচন ভেষজের ন্যায় সমাজোপযোগী। তিনিও স্ত্রী এবং লক্ষ্মীর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ স্বীকার করেননি। কেননা তারা সন্তান সৃষ্টি করেন, শুভ, পূজনীয়া এবং গৃহের শোভাবর্ধন করে থাকেন। যে সমস্ত কূলে নারীদের অবমাননা করা হয়, সেসমস্ত সমাজের সকলপ্রকার কর্ম নিষ্ফল হয়ে থাকে।[৪]

নারী শিক্ষা

প্রাচীনকালে নারীদের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল উন্নততর। পুত্রের ন্যায় কন্যা সন্তানদেরও শিক্ষা গ্রহণে সমান অধিকার ছিল। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের আখ্যানভাগে উল্লেখ আছে যে— তৎকালীনযুগে নারীদের ধার্মিক শিক্ষা গ্রহণে অভিরুচি ছিল। ঋগ্বেদে আমরা অনেক বিদূষী ঋষিকাদের উল্লেখ পাই— অদিতি (ঋ.১০.৭২.১-৯), অপলা (ঋ.৯.৯১.১-৭), ইন্দ্রাণী (ঋ.১০.১৪৫.১-৬), উর্বশী (ঋ.১০.৯৫.২-৪), গোধ (ঋ.১০.১৩৪.৬-৭), লোপামুদ্রা (ঋ.১.১৭৯.১-৯), সূর্যা— সাবিত্রী (ঋ.১০.৮৫.১-৪৭)।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে দুজন বিদূষী পত্নীর বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে নারীরা শিক্ষিকারূপে নির্বাচিত হতেন। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে আচার্যা তথা উপাধ্যায়া পদের উল্লেখ থেকে আমরা শিক্ষিকাদের পরম্পরার কথা অবগত হই। বাৎস্যায়নের কামসূত্র-গ্রন্থে পিতাকে তাদের কন্যাদের চৌষট্টি কলা শেখানোর উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। সেই সমস্ত কলাগুলোর মধ্যে প্রমুখ হল— প্রহেলিকা, পুস্তকবচন, কাব্য সৃজন ইত্যাদি। এর থেকে অনুমিত হয় যে তদানীন্তনে নারীদের বিদ্যাচর্চার অধিকার ছিল।

মহর্ষি ভৃগু নারী এবং শূদ্রদের প্রতি উচ্চ বিচার ধারার কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন বালকের অনুরূপ বালিকাদেরও পাঁচ বছর বয়সে উপনয়ন সংস্কার, বেদাধ্যয়ন এবং গুরুগৃহে প্রেরণ করা উচিত।[৫] কিন্তু নিকৃষ্টমূলক কাজে নারী এবং পুরুষদের বেদাধ্যয়নের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হত। মহর্ষি ভৃগু নারী এবং পুরুষদের অধ্যয়ন করার নির্দেশ দেন, কেননা অধ্যয়ন ব্যতীত জ্ঞানের বিকাশ সম্ভব নয়। জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না। অতএব এই জন্য শিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

পাত্র চয়নে স্বতন্ত্রতা

নর ও নারী এবং পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই একে অন্যের পরিপূরক। এরা একে অপরের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। এই সম্বন্ধের আধারশীলতাই হল বিবাহ বন্ধন।

মনুসংহিতা গ্রন্থে মনু উল্লেখ করেছেন— যদি সুযোগ্য পাত্র না পাওয়া যায়, তাহলে রজোদর্শনের পর তিন বছর পর্যন্ত কন্যাদের অবিবাহিত রাখা যেতে পারে। যদি তারুণ্য লাভের পর তিন বছর পর্যন্ত কন্যার অভিভাবক উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান না পেয়ে থাকে, তাহলে কন্যা স্বয়ং পাত্র চয়ন করতে পারে।[৬] যাজ্ঞবল্ক্য উল্লেখ করেছেন— কন্যা দানকারী ব্যক্তি যদি কন্যা দানে ব্যর্থ হয় তাহলে তার সেই কন্যার প্রত্যেক ঋতুকালের ভ্রূণ হত্যার পাপ তার লেগে থাকে।[৭] যদি ধর্ম রক্ষার্থে কোন ব্যাঘাতের সৃষ্টি হয়, তাহলে অল্প বয়সেই কন্যার বিবাহ দেওয়া যেতে পারে। যদি সুযোগ্য পাত্রের সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহলে

কন্যা আজীবন পিতৃগৃহে থাকতে পারে, অযোগ্য পাত্রের হাতে কন্যা দানের চেয়ে সম্পূর্ণ জীবনকাল পিতৃগৃহে বসবাস করাই যথার্থ।[৮] আচার্য মনু এবং পরাশর তথা অন্যান্য স্মৃতিকারেরাও— বিবাহ সম্পর্কে এই প্রকার মত পোষণ করেন।

পুনর্বিবাহ

'পূনর্ভূ' শব্দ সাধারণতঃ বিধবা নারীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়ে থাকে। যাজ্ঞবল্ক্য পুনর্ভূ শব্দকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা— প্রথমতঃ যারা স্বামীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়নি এবং দ্বিতীয়তঃ যারা সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে এই দুই প্রকার বিধবা নারীদের পুনর্ভূ বলা হয়।

যে নারী স্বামীকে ছেড়ে অন্য কোন পুরুষের সাথে চলে যায়, তাকে 'স্বৈরণী' বলে সম্বোধন করা হয়।[৯] নারদীয় স্মৃতি ও পরাশরস্মৃতি অনুযায়ী স্বামী সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করলে, বিদেশে থাকলে, কোন খবর না পাওয়া গেলে নারী আবার দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারেন। বশিষ্ঠ বলেছেন— প্রবাসী স্বামীর জন্য ৫ বছর প্রতীক্ষা করা প্রয়োজন। তারপর সে দ্বিতীয় বারের জন্য আবার বিবাহ করতে পারে। যদি পতি ধর্ম বিষয়ক কাজে বিদেশে গিয়ে থাকে, তাহলে পত্নীকে ৮ বছর, বিদ্যা গ্রহণের জন্য গিয়ে থাকলে ৬ বছর, ব্যবসার জন্য গিয়ে থাকলে ৩ বছর প্রতীক্ষা করা উচিত।[১০] যাজ্ঞবল্ক্য উল্লেখ করেছেন— পতি বিদেশে থাকাকালীন পত্নীদের ক্রীড়া বিষয়ক ক্ষেত্রে এবং সামাজিক উৎসবে অংশগ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ কামের প্রতি আসক্ত পুরুষেরা পতির অনুপস্থিতিতে পত্নীর পথ ভ্রষ্ট করতে পারে।

বিধবা বিবাহ

ঋগ্বেদে বিধবাদের পুনর্বিবাহের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় সংহিতাকে বিধবা পুত্রদের 'দৈধিবব্য' শব্দের দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। কৌটিল্য বিধবা নারীদের সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন—পতির মৃত্যুর পর যে পত্নী ধার্মিক জীবন যাপন করতে চায়, তাকে ধনরাশি, আভূষণ প্রদান করা উচিত। কিন্তু সে যদি আবার দ্বিতীয় বিবাহ করতে চায়, তাহলে তাকে পতি বা শ্বশুর কর্তৃক প্রাপ্ত ধনসম্পদ উপহার স্বরূপ প্রদান করা উচিত। কিন্তু যদি যে শ্বশুরের পছন্দ করা পাত্র বিবাহ না করে, তাহলে সে সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে। মনুর মতে— কোন কারণ বশতঃ যদি পতির মৃত্যু হয়, তাহলে সেই পত্নীর সম্মতি নিয়ে তার বিবাহ আবার মৃত ব্যক্তির ভাই এর সাথে করে দেওয়া যেতে পারে।[১১]

মনু বিধবা নারীদের পরিস্থিতির বিষয়ে বলেন রাজা বেনের শাসন কাল থেকে বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল।[১২] মহর্ষি মনু বিধবা বিবাহ স্বীকার করেন, কিন্তু পুনর্বিবাহকে অধর্ম রূপে মান্য করেন। কেননা পতিব্রতা নারীদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিবাহের বিধান নেই।

স্ত্রী'দের প্রাপ্ত অধিকার

১. বৃদ্ধহারিতে নারীদের যজ্ঞ ও বেদ পঠন পাঠনের অধিকারের বিধান দিয়েছেন।[১৩] কিন্তু মনুসংহিতা গ্রন্থে দেখা যায় যে— অবিবাহিত কন্যা, উপনয়ন সংস্করা হীন নারীদের অগ্নিহোত্র বিষয়ক যাগ করার নিষিদ্ধ বিধান আছে।

২. মনুসংহিতা এবং বিষ্ণুসংহিতা অনুযায়ী স্ত্রী কে পৃথক্ রূপে ব্রত, যজ্ঞ করার প্রয়োজন নেই, কেননা পতি ও স্ত্রী সমান রূপে যদি ধর্মানুষ্ঠান করে তাহলে উভয়রেই স্বর্গ প্রাপ্ত হয়।

৩. যাজ্ঞবল্ক্য গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে— পিতার জীবিত থাকাকালীন পুত্র যদি সম্পত্তির ভাগ চায় তাহলে পত্নীও পুত্রতুল্য ভাগ পেয়ে থাকে। পত্নী থাকা অবস্থায় যদি কোন পুরুষ আবার বিবাহ করতে চায় তবে প্রথম পত্নীকে তার ধন-সম্পত্তি প্রদান করবে।[১৪]

৪. মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় বলা হয়েছে যে— বিবাহ যোগ্যা যুবতী, কুমারী কন্যা এবং গর্ভবতী নারীদের প্রারম্ভে ভোজন প্রদান করা উচিত।[১৫]

৫. নদীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গমনেচ্ছু গর্ভবতী নারী, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ এবং ব্রহ্মচারীদের কাছ থেকে শুল্ক নেওয়া উচিত নয় একথা মনুসংহিতায় বিবৃত রয়েছে।

৬. মনু নারীদের প্রতি কর্তব্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন রাজা বন্ধ্যা, পুত্রহীন, বংশজাত, রোগী, পবিত্র এবং বিধবাদের সম্পত্তি রক্ষা করবেন।[১৬]

৭. যদি কেউ নারীর সম্মানহানি করে তাহলে রাজা তাকে শাস্তি দিবেন, কারণ চতুর্বর্ণের নারীদের রক্ষার দায়িত্ব রাজার উপর ন্যস্ত।[১৭]

৮. সব রকম অপরাধেই নারীদের মৃত্যুদণ্ড নিষিদ্ধ। সে যদি ব্যভিচারিণীও হয় তাহলেও তাকে ত্যাগ করা যাবে না। শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তের পর পুনঃ গ্রহণ করতে হবে। মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্য— এই অভিমত স্বীকার করেন।[১৮]

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা আমরা বলতে পারি যে— স্মৃতিকালীন সমাজে নারীদের স্থান ছিল উন্নততর। যে সমাজে নারীদের সম্মান করে সেই সমাজে দেবতারাও আনন্দিত হয়ে থাকেন। স্মৃতিকালীন সমাজে নারীরা ধার্মিক অনুষ্ঠান, উচ্চ শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতেন। সর্বত্র নারীরা সক্রিয় ছিল, বৈদিক রমণীরা নিজেদেরকে তেজস্বিনীরূপে স্থাপন করেছিল। বর্তমানেও তার-ই প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই।

পাদটিপ্পনী

১ অর্দ্ধা ভার্যা মনুষস্য ভার্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্যা মূলং তরিষ্যতঃ।। মহাভারত, আদিপর্ব ৭৪.৪১

২. নৃনরয়োর্বৃদ্ধিশ্চ, ইতি শাঙ্গখাদি (৪.১.৭৩) গণে পাবন্ ঙীন্ জাতিলক্ষণস্য (৪.১.৬৩)
ঙীষোঽপবাদঃ। আকৃতিগ্রহণা জাতিঃ ইতি নৃশব্দোঽং জাতিবাচক।

৩. সবিতা শ্রিযা স্ত্রিয়ং সমদধাত্। স্ত্রী সাবিত্রী। জৈমিনীয় উপ. ব্রা. ৪.২৭.১৭

৪. যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।। মনু. ৩.৫৬

৫. বেদাঃ সর্বৈঃ সদাঽধ্যেযা, বালিকাভিশ্চ বালকৈঃ।
শৈশবে কৃতযজ্ঞোপবীতৈস্তৈঃ পঞ্চমাব্দতঃ।। ভৃগু-৩.৪০

৬. ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত্ কুমার্যৃতুমতী সতী
উর্ধ্বং তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্।। মনু ৯.৮৯

৭. অপ্রযচ্ছন্নমাপ্নোতি ভ্রূণহত্যামৃতাবৃর্তৌ।
গম্যং ত্বভাবে দাতৃণাং কন্যা কুর্যাৎ স্বয়ংবরম্। যাজ্ঞ ১-৬৪

৮. উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তাং অপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্যথাবিধি।। মনু ৯.৮৮

৯. অক্ষতা ত ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতাঃ পুনঃ।
স্বৈরিণী যা পতিং হিত্বা, স্ববর্ণং কামতঃ শ্রয়েত্। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি

১০. প্রোষিতো ধর্মকার্যার্থং প্রতীক্ষ্যোঽষ্টৌ নরঃ সমাঃ।
বিদ্যার্থং ষড্যশোঽর্থং বা কামার্থং ত্রীংস্তু বৎসরান্।। মনু ৯.৭৬

১১. অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্মো বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যাণাং অপি প্রোক্তো বেনে রাজ্যং প্রশাসতি।। মনু ৯.৬৬

১২. পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ্দেহসংযুতা।
সা ভর্তৃলোকং আপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে।। মনু. ৫.১৬৪

১৩. নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণম্।

পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে।। মনু. ৫. ১৫৫

১৪. অধিবিন্নস্ত্রীযৈ দদ্যাদাধিবেদনিকং সমম্।
দ দত্তং স্ত্রীধনং যস্যৈ দত্তে ত্বর্ধং প্রকল্পযেত্। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি

১৫. সুবাসিনীঃ কুমারীশ্চ রোগিণো গর্ভিণীঃ স্ত্রিয়ঃ।
অতিথিভ্যোঽগ্র এবৈতাণ্ডোজয়েদবিচারয়ন্।। মনু. ৩.১১৪

১৬. দীর্ঘাধ্বনি যথাদেশং যথাকালং তরো ভবেৎ।
নদীতীরেষু তদ্বিদ্যাৎ সমুদ্রে নাস্তি লক্ষণম্।। মনু. ৮.৪০৬

১৭. বশাপুত্রাসু চৈবং স্যাদ্রক্ষণং নিষ্কুলাসু চ।
পতিব্রতাসু চ স্ত্রীষু বিধবাস্বাতুরাসু চ।। মনু. ৮.২৮

১৮. উন্মত্তং পতিতং ক্লীবং অবীজং পাপরোগিণম্।
ন ত্যাগোঽস্তি দ্বিষন্ত্যাশ্চ ন চ দায়াপর্বতনম্।। মনু. ৯.৭৯

গ্রন্থপঞ্জী

১. ঋগ্বেদ সংহিতা, সম্পা. রমেশচন্দ্র দত্ত, কলিকাতা : হরফ প্রকাশনী, ২০০০ মুদ্রিত।
২. ঘোষ, প্রবীর যুক্তিবাদের চোখে নারীমুক্তি কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪ মুদ্রিত।
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, কলিকাতা : প.ব. রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৫ মুদ্রিত।
৪. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য, কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০২ মুদ্রিত।
৫. মনু, মনুসংহিতা, সম্পা মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা : সদেশ, ১৪১৮ (বঙ্গাব্দ), মুদ্রিত
৬. যাজ্ঞবল্ক্য, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি. সম্পা. নারায়ণ শাস্ত্রী, বারাণসী : চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ১৯৯৭ মুদ্রিত।

পবিত্র প্রেমের অনুসন্ধানে কালিদাসের রচনাক্রম

ড. মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

"কুরিয়ার-মেল— যদি হাজার বছর পরে উঠে যায়
তুমি তো থাকবে, তুমি তো আবার চিঠিমুখে করে যাবে, মেঘদূত"[১]

শুধুমাত্র এই আধুনিক কালের মধ্যেই কালিদাস চর্চিত হন নি, প্রাচীন থেকে আধুনিক পর্যন্ত সমস্ত কবিদের কলমের ডগায় ঝড় তুলেছেন কালিদাস, সুন্দরভাবে জায়গা করে নিয়েছেন হৃদয়কুটিরে। মানুষ ও প্রকৃতিকে যেমন এক গোলটেবিলে বসিয়েছেন, পাশাপাশি মানুষের হৃদয়জুড়ে যে প্রেমের বৃষ্টি টুপটুপ ঝরে পড়েছে তার শব্দও তিনি শোনাতে চেয়েছেন। রাঙিয়ে দিয়েছেন বসন্তের রঙে। সংস্কৃত সাহিত্যের সমুদ্রে তিনি ভাব ভগীরথ, সমুদ্রের অতল গভীরে ডুব দিয়ে তিনি খুঁজে এনেছেন মানসী প্রতিমাকে। সাত সমুদ্র তেরো নদী পার থেকে রূপসী রাজকন্যাকে বসালেন তিনি মানবের হৃদয়মন্দিরে। সেখানে প্রেম আছে, বিরহ আছে, মিলন আছে, আছে মিলনের ফল। তবে এগুলিকে যে কাব্যরচনার মাধ্যমে অদৃশ্য সেতুবন্ধন ঘটিয়েছেন, তাই তাঁর প্রতিভাকে অবাক লাগে। এপ্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে মনীষীদের দ্বারা প্রশংসনীয় কয়েকটি সু উক্তি উল্লেখ করতেই হয়। কারণ, যাঁর রচনাগুলি অনুধাবন করলে বোঝা যায় প্রেম যেন শৈশব থেকে ক্রমাগত পূর্ণবয়স্কের দিকে ধাবিত আর মনীষীদের মানসিকতায় তিনি যেন শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর। আনন্দবর্ধন তাই বলেছেন—"অস্মিন্নতিবিচিত্রকবিপরম্পরাবাহিনি সংসারে কালিদাসপ্রভৃতয়ো দ্বিত্রা পঞ্চষা বা মহাকবয়ঃ ইতি গণ্যন্তে।"[২] আনন্দবর্ধনের এই উক্তি যেন সর্বজনগ্রাহ্য। শুধু শব্দার্থ বা অলংকার নয় বিষয়বস্তুর চিন্তাধারায় তিনি তাঁর রচনাগুলিকে এমন সজ্জায় সজ্জিত করেছেন যা পাঠক সমাজের কাছে তৈরি হয়েছে এক অবিচ্ছেদ্যতার ভাবনা। মূলত শৃঙ্গাররসাশ্রয়ী কালিদাস নায়ক নায়িকার প্রেমকে কাব্যের ধারায় ক্রমবর্ধমান করেছেন। জীবন ও জগতের যে একটি নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান তার সঙ্গে আবার ভারতবর্ষীয় এক চিরন্তন প্রেম যেন একাকার হয়েউঠেছে। শুধু নর নারীর প্রেম নয়, বাৎসল্য প্রেম ব্যতিরেকে মানবজীবনে যে পরিপূর্ণতা আসে না তাও দেখাতে ভুলে যাননি। তাই ধ্বন্যালোককার বলেছেন এরূপ

কবি জগতে দু-পাঁচজনেই আছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কালিদাসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কবি তাই লিখছেন—

হে কবীন্দ্র কালিদাস, কল্পকুঞ্জবনে
নিভৃতে বসিয়া আছ প্রেয়সীর সনে
যৌবনের যৌবরাজ্য— সিংহাসন পরে।
মরকত পাদপীঠ বহনের তরে
রয়েছে সমস্ত ধরা, সমস্ত গগন
স্বর্ণ রাজছত্র ঊর্দ্ধে করেছে ধারণ
শুধু তোমাদের পরে; ছয় সেবাদাসী
ছয় ঋতু ফিরে ফিরে নৃত্য করে আসি;
নব নব পাত্র ভরি ঢালি দেয় তারা
নব নব বর্ণময়ী মদিরার ধারা
তোমাতে তৃষিত যৌবনে; ত্রিভুবন
একখানি অন্তঃপুর বাসরভবন।
নাই দুঃখ, নাই দৈন্য, নাই জনপ্রাণী
তুমি শুধু আছ রাজা, আছে তব রাণী।

— ঋতুসংহার: চৈতালী[৩]

কি অসাধারণ ভালোবাসা কালিদাসের প্রতি। প্রাচীন সাহিত্য, মেঘদূত, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা, কাব্যের উপেক্ষিতা প্রভৃতি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্য, নাটক প্রভৃতির সমগ্র পর্যালোচনা করেছেন। প্রথম তিনটি পুরোপুরি কালিদাস সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে এবং শেষেরটিতে আংশিক আলোচনা আছে। সে যাই হোক তবে তিনি যে কালিদাসপ্রেমে মুগ্ধ তা তাঁর রচনাই প্রমাণ করে। এ জন্য তো তিনি কালিদাসের কালে জন্ম নেওয়ার জন্য অকপটে স্বীকারও করেছেন। জয়দেব কালিদাসকে বলেছেন 'কবি কুলগুরুঃ'। কবি মধুসূদন বলেছেন— 'কবিতানিকুঞ্জে তুমি পিককুলপতি।' শুধু দেশীনয় বিদেশের মনীষীরাও এ বিষয়ে নীরব থাকেননি। দার্শনিক হামবল্ডট্, উইলিয়ম জোন্স, স্যার মনিয়র উইলিয়মস্, জার্মান কবি গ্যেটে, ডক্টর রাইডার, ডক্টর সিলভিয়ান লেভি প্রমুখ পণ্ডিতগণও অকৃপণভাবে প্রশংসাসূচক উক্তি করে গেছেন। অধ্যাপক ল্যাসেন কালিদাসকে বলেছেন— The brightest star in the firmament of Indian Poetry.[৪]

তবে এতসকল প্রশংসা যে একজন কবির প্রতি প্রযুক্ত হলো, তার কারণটি কোথায় ? এরকম ভাবনার বশবর্তী হয়েই কি 'উপমা কালিদাসস্য' এটাই কি তাঁর প্রশংসার কারণ ?

শুধু তাই নয়, কালিদাসের রচনার আশ্চর্য প্রসাদগুণ ও সৌকুমার্য প্রকাশরীতির শুচিতা, স্বচ্ছতা কৃত্তিমতা, সংক্ষিপ্ত হয়েও সুস্পষ্ট, অনেকেই আবার বলেন প্রকৃতিই আবার তাঁর প্রাণকেন্দ্র, তবে এগুলি ছাড়াও তাঁর কাব্যে আরও একাধিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা লৌকিক সমাজের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে কাব্যগুলি স্থান করে নিয়েছে। যেগুলির মধ্যে একটি প্রধান বিষয় হলো— কালিদাসের কাব্যে নায়ক নায়িকার প্রেম প্রণয় ও যার সার্থক পরিণতি সন্তানাবির্ভাব।

মহাকবি কালিদাস হয়তো বিশ্বাস করতেন, ভারতবর্ষীয় প্রেম তখনই সফল হয় যখন প্রেমিক প্রেমিকার বিবাহ এবং সন্তানের জন্মরূপ আশীর্বাদে তা ধন্য। মাতৃত্বই নারী জীবনের সার্থকতার চরম লক্ষণ— এ অভিমত পোষণ করতেন মহাকবি। এর উপর ভিত্তি করে মহাকবি তাঁর নাটক ও কাব্যের নায়ক নায়িকার প্রণয়কে সন্তানের জন্মের দ্বারা সার্থক করে তুলেছেন।

কালিদাসের রচনারূপে 'পুষ্পবাণবিলাস' 'শৃঙ্গাররসাষ্টক' 'নলোদয়' প্রভৃতি অন্যান্য বহু গ্রন্থের নাম পাওয়া গেলেও ঋতুসংহার, মেঘদূত নামে দুটি গীতিকাব্য ও খণ্ডকাব্য, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব নামে দুটি মহাকাব্য এবং মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশীয়, অভিজ্ঞানশকুন্তল নামে তিনটি নাটকেই কালিদাসের রচনারূপে বহুজনস্বীকৃত ও বহুল পরিচিত। পণ্ডিতদের মতে বাকী গ্রন্থগুলি মহাকবি কালিদাসের রচনা নয়। এগুলি কালিদাস নামধারী পরবর্তী কবিদের রচনা অথবা অজ্ঞাতনামা কবিদের গ্রন্থগুলি কালিদাসের নামে প্রচলিত। তবে সর্বজনস্বীকৃত গ্রন্থগুলি থেকে উক্ত কবিপ্রতিভার অসাধারণ নিদর্শন মেলে। বিদ্বদ্‌জন কর্তৃক প্রদত্ত আনুমানিক পৌর্বাপর্যঋতুসংহার, কুমারসম্ভব (প্রারম্ভাংশ), মালবিকাগ্নিমিত্র, মেঘদূত, কুমারসম্ভব (শেষাংশ), বিক্রমোর্বশীয়, রঘুবংশ, ও শকুন্তলা।[৫] তবে কুমারসম্ভব কাব্যের শেষাংশ কাব্যাংশ হিসেবে ধর্তব্য নয়। কারণ মল্লিনাথ অরুণগিরি অষ্টম সর্গ পর্যন্ত টীকা লিখেছেন তাই অনেক পণ্ডিত অষ্টমপরবর্তী স্বর্গগুলি অস্বীকার করেন। কোনোও মতে সপ্তম পর্যন্তই কালিদাসের রচনা তাই বঙ্গদেশীয় সংস্করণগুলির সপ্তম সর্গেই সমাপ্ত।[৬] সুতরাং আলোচ্য বিষয়টি কুমারসম্ভব শেষাংশকে পরিহার করেই নির্দিষ্ট ক্রমে আলোচিত হল। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাচীন কাব্যের পরিপূর্ণতা প্রদানের মানসিকতা পরবর্তী কবি বা বংশগত কারোর মধ্যে একাধিক লক্ষ্য করা যায়। যেমন বাণভট্টের পুত্র ভূষণভট্ট বা পুলিন্দ কাদম্বরী কাব্যের উত্তরভাগ রচনা করেন। আবার অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের শেষাংশ অমৃতানন্দ নামে কোনো এক কবির রচনা।[৭] যেগুলিতে হয়তো গল্পের ধারাটা বজায় রাখতে পারে, কিন্তু রচনার কাঠামো তথা শৈলীতে ভিন্নতা এসেই যায়। আবার কোথাও কোথাও নিজস্ব ভাবেরও প্রতিফলন ঘটে। কিন্তু বিষয়ের অনুসন্ধান

করতে গেলে প্রকৃত কবির সাথে পরবর্তী কবিকে গুলিয়ে ফেললে গবেষণার যথার্থতা নষ্ট হয়। সুতরাং প্রাচীন টীকাকারদের তথ্য থেকে যে কাব্যগুলি বা কাব্যাংশগুলি কালিদাসের রচনায় সন্দেহযুক্ত সেগুলিকে এই আলোচনাতে বাদ দেওয়া হয়েছে।

ক

ষষ্ঠ সর্গে ষষ্ঠ ঋতুর বর্ণনা সম্বলিত ঋতুসংহার গীতিকাব্যটি অসাধারণ। ১৫২ শ্লোকে কবি প্রকৃতিরাজ্যের পরিবর্তন ও মানব-মানবীর অন্তরেরর কি প্রকার আকুতি কি বিলাসব্যসন কি বৈচিত্রময় তা কবির লেখনীতে যেন আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। হয়তো বা এখানে মিলন নেই, মিলনের ফল নেই তবে তিনি যে মিলনের বাতাবরণকে সজ্জিত করেছেন, মিলনের পরিবেশকে সুনিপুণভাবে নিকটে এনে দিয়েছেন একথা অস্বীকার করলে চলে না। বর্ষা ঋতুর কালো মেঘে যখন মানব মানবীর হৃদয়ের আহ্বান, শরতের সুনির্মল পরিবেশে ভোগের স্নিগ্ধ আয়োজন, হেমন্তের পক্কতায় পরিপূর্ণ পরিবেশে জীববৈচিত্র্য, শীতকালের শিশিরাচ্ছাদিত শীতল পরিবেশে ভোগের স্নিগ্ধ আয়োজন, হেমন্তের পক্কতায় পরিপূর্ণ পরিবেশে জীববৈচিত্র্য, শীতকালের শিশিরাচ্ছাদিত শীতল পরিবেশে মিলনসুখের গভীরতা ও বসন্তবিলাস যেন ধাপে ধাপে সজ্জিত। আর এখানেই কবি প্রশংসিত। কালিদাস পরবর্তী রচনার জন্য মিলনপিয়াসী বক্তব্য স্থাপন করেছেন, মানসিক পরিবেশের উদ্ভাবন করেছেন, পাঠকদের পরবর্তী বিষয় সম্পর্কে সূচনা দিয়েছেন। সত্যই কবির কাব্যগুলি যেন ক্রমপর্যায়ের গল্প। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন— এর (ঋতুসংহার কাব্যের) মধ্যে তরুণ তরুণীর যে মিলনসঙ্গীত আছে তাতে স্বরগ্রাম তালের নীচের সপ্তক থেকেই শুরু হয়েছে, শকুন্তলা কুমারসম্ভবের মতো তপস্যার উচ্চতম সপ্তকে পৌঁছায়নি। কবি যেন মুখ্যত কামিজনের চিত্তবৃত্তিতে প্রকৃতির বিলাস-বৈচিত্র্য আসক্তি উদ্দীপনা ও মৌনবৃত্তির বহুমুখী প্রকাশ উজ্জ্বল দীপ্র ভঙ্গীমায় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। শ্রী অরবিন্দ এই কাব্যের সমালোচনায় মানবজীবনে সৌন্দর্য চেতনা ও ভোগসাধনার সমন্বয়ের কথা বললেও সহজ ইন্দ্রিয়রতির প্রবণতাটি লক্ষ্য করেছেন। হরপ্রসাদ দেখিয়েছেন ২৮টি কবিতাকে আশ্রয় করে যোদ্ধা বসন্তের বর্ণনা। কালিদাসের বর্ণনায় যে চিত্র পাঠকরা বুঝতে সমর্থ হননি তা হরপ্রসাদ অত্যন্ত সরলভাবে বুঝিয়েছেন অস্ত্রধারী বসন্তকে। "ফুটে ওঠা আমের মুকুল তাহার বাণ, ভ্রমরের সার তাহার ধনুকের ছিলা। কামীগণ তাহার শত্রু, তাহাদের হৃদয় বিদ্ধ করায় তাহার কাজ।"[৮] সত্যিই যেন ঋতুসংহার কাব্যটি মিলন বা প্রণয়ের পূর্বাভাস। আর পরবর্তী কাব্যগুলি— তার শিহরণ যেন বাস্তবায়িত।

খ

এই কাব্যের পরবর্তী পর্যায়কে বাস্তবায়িত করার জন্যই কুমারসম্ভব (প্রথমাংশ)। প্রায় সপ্তম সর্গে রচিত মহাকাব্যের বিষয়বস্তুতে যেন কামবিলাসের এক অপূর্ব চিত্র পরিবেশিত। কবি কালিদাস বাস্তব জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছেন আর সেই নিরিখেই কাব্য রচনাতেও ব্রতী হয়েছেন। অনেকের মতে প্রাচীন ও আধুনিক দৃষ্টিতে কাব্যটি অশ্লীলতার পর্যায়ে উপন্যস্ত। কিন্তু রসের মাধুর্য সৃষ্টিতে তথা ক্রমপর্যায় বজায় রাখতে যেন এক আলাদা অনুরণন। যেন এক বিরাট আবেগ আর বিরাট বাধার সৃষ্টি, যেন প্রেমের সম্পূর্ণতাকে পেতে চেয়েও অসম্পূর্ণতা। কাব্যের প্রথম সর্গে—

"যত্রাংশুকাক্ষেপ— বিলজ্জিতানাং যদৃচ্ছয়া কিম্পুরুষাঙ্গনানাম্।
দরীগৃহদ্বার বিলম্বিবিম্বাস্তিরস্করিণ্যো জলদা ভবন্তি।।" প্রথম সর্গ— শ্লোক নং-১৪[৯]

এছাড়া উমার রূপবর্ণনা যেন তরুণ মনে আবেগচঞ্চল হৃদয়ে বাস্তবকে দৃশ্যপটে স্বপ্ন দেখা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। কি অসাধারণ উপমা— ৩৫ থেকে ৪০ নম্বর শ্লোক পর্যন্ত পার্বতীর উরূবর্ণনা, নিতম্ববর্ণনা, নাভিবর্ণনা, কটিদেশবর্ণনা এবং স্তনবর্ণনা যেন মানসলোকে প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকে। শুধু তাই কি ? তৃতীয় সর্গে তপোবনের অকাল বসন্তবর্ণনা ৪র্থ সর্গে মদনের জন্য রতিবিলাপ ৭ম সর্গে পরিণয় হলো, কিন্তু পরবর্তী ফলের আশা যেন সেখানেই থেমে গেল। কুমারসম্ভব রচনার সময় যদিও কবির অপক্ক হাতের আভাস পায় তবু প্রেমের পর্যায়ের যে কোনোরূপ ত্রুটি নেই তা স্বীকরণীয়। রঘুবংশও মহাকাব্য কিন্তু কুমারসম্ভবের থেকে রঘুবংশ অনেক উন্নতমানের। হরপ্রসাদের ভাষায় রঘুবংশ মহামহাকাব্য। অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্যও তা স্বীকার করেছেন এবং কুমারসম্ভবকে অনেক আগের কাব্য বলেছেন।[১০] প্রেমচঞ্চল মানসিকতায় কালিদাসের কলমের যথার্থ আবেগ যেন কুমারসম্ভবে প্রস্ফুটিত।

গ

কবি প্রেমের পরিপূর্ণতা ব্যাপারে আত্মহারা হননি। তিনি প্রেমের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এই ক্রমে এক এক করে সজ্জিত করেছেন। আর সেজন্যই বোধ হয় 'মালবিকাগ্নিমিত্র' এই পঞ্চাঙ্ক নাটকের অবতারণা। গ্রন্থটি বিদিশারাজ অগ্নিমিত্র এবং বিদর্ভরাজকন্যা মালবিকার প্রণয়কাহিনিকে উপজীব্য করে। ধারিণী ও ইরাবতী নামে রাজার দুই পত্নী থাকলেও প্রেমের পর্যায়টিকে ঠিক রাখতে মালবিকার আবির্ভাবে যে ঐতিহাসিক ঘটনাকে রোমাঞ্চিত করলেন এমন চিন্তাকে দুর্লভ কবিকৃতিত্ব স্বীকার করতেই হয়। ভাগ্যক্রমে শবরদের আক্রমণ

থেকে রক্ষা পেয়ে মালবিকা পরিচারিকা হলেও তার রূপে মুগ্ধ হয়ে রাজা অগ্নিমিত্রের প্রেমের অবতারণা এক অসাধারণ নৈপুণ্য। পরিচারিকা হলেও যোগ্যতা বলে রাজার মনমোহিনী হয়েছেন মালবিকা। আর সেই প্রেমের মানসপটে স্থান পেলেই তো প্রেমের নীতি অনুযায়ী আলিঙ্গনে উদ্যত, কিন্তু বাধা সৃষ্টিতেও যেন কবি বিশাল পটু আর সেজন্যই দৃষ্ট মহিষী ইরাবতীর আবির্ভাব ও চরমতাকে ভূলুণ্ঠিত করে মালবিকা কারারুদ্ধা। সত্যই যেন মনে হয় হস্তিপৃষ্ঠ থেকে ভূমিতে অবতরণ। তবে কবি এতসকল মানসিক চারিত্রিক কার্যকলাপ ঘটালেও তিনি প্রেমবিষয়কে আরো একটু এগিয়ে নিয়ে গেলেন। সেজন্যই মালবিকার আসল পরিচয় বিভিন্নভাবে রাজার প্রতি তথা সকলকে জ্ঞাপন করেছেন। এবং তাতেও প্রেম পরিণতিতে বাধা আসতো এই সন্দেহ নিরসন করতে বসুমিত্রের সফলতা এনে দিয়ে দুজনের মিলন ঘটিয়েছেন। এবং প্রেমকে সার্থক করে তুলেছেন। একজন কামী পুরষ নারীসৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে নারীহৃদয়ের ভালোবাসাগুলিকে একের পর এক ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে স্বহৃদয়ে একের পর অন্যকে স্থান দিতে পারে মালবিকাগ্নিমিত্র না পড়লে বোঝা যায় না। প্রেমিক জীবনের চরম আবেগে নারীদের মনকে ছিনিয়ে নেওয়াও প্রেমের একটি পর্যায়। কালিদাসের সে বাঞ্ছাও পূর্ণ করলেন এই নাটকের মধ্যে। যদিও ইরাবতীর হিংসা নেই ধারিণীর প্রতি তবে ত্রিকোণ প্রেমে যে এক হিংসার আগম হয় কালিদাস এখানে স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন।

ঘ

এরপর কবি প্রেমের গাঢ়তা সম্পাদন করতে নায়ক নায়িকাকে বিরহের পর্যায়ে নিয়ে আনতে রচনা করলেন 'মেঘদূত' নামক সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়, সম্পূর্ণ মৌলিকভাবের এক রচনা। যা রচিত গীতিকাব্য বা খণ্ডকাব্যরূপে। পূর্বমেঘ এবং উত্তরমেঘ দুটি ভাগে বিভক্ত করে একটি ভাগে যক্ষের অভিশাপ তারপর রামগিরির বিজন আশ্রম থেকে আয়াঢ়ের কালো মেঘকে দূত হিসেবে অনুরোধ জানানো এবং রামগিরি থেকে অলকা পর্যন্ত এক সুদীর্ঘপথের বর্ণনা অসাধারণ। যক্ষের মেঘকে দূতরূপে আহ্বান প্রেমকল্পনার কতটা শিখরে বাস্তবায়িত, কতটা চরমতার শিখরে উন্নিত অবাক লাগে। নদ, নদী, নগরীর বর্ণনা প্রদর্শনে কালিদাস সিদ্ধহস্ত। কামনার মোক্ষধাম অলকায় যাওয়ার পূর্বেই যেন বিরহীর দৃষ্টিভঙ্গীতে একে একে বর্ণনা দিলেন মালক্ষেত্র, দশার্ণ, বিদিশা, অবন্তি, উজ্জয়িনী, দশপুর, কুরুক্ষেত্র, কনখল, কৈলাস প্রভৃতি। সেইসঙ্গে উল্লেখ করলেন পথে পড়া নর্মদা, নির্বিন্ধ্যা, সিন্ধু, সরস্বতী, শিপ্রা, বেত্রবতী প্রভৃতি নদনদীর। একি, কালিদাসের আকাশপথে বিচরণ। সত্যই প্রেমিক কল্পনাতেও কালিদাস যেন এক সুদক্ষ, নিপুণ দার্শনিক দৃষ্টির প্রতিফলন ঘটছে এই

অংশে। এরপর বর্ণিত হয়েছে যক্ষের নিবাস অলকাপুরীর মতো সুরম্য স্থান। যেখানে লাবণ্যবতী রমণীরা বিরাজিত যেখানে প্রণয় ব্যতীত কোনো ঝগড়া নেই, আনন্দ যৌবন ছাড়া কোনো অবকাশ নেই সেখানের সুন্দরীদের বর্ণনা দিচ্ছেন, তন্বী, শ্যামা, শিখরদশনা, পক্কবিম্বোধরষ্ঠী চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা, হাতে লিলাকোমল, চুলে বালকুন্দ, মুখে লোধ্রপরাগ পাণ্ডুশ্রী আর খোপাতে কুরবক। আর যক্ষপ্রিয়ার বর্ণনায় শিশিরমথিতা মৃণালিনী, প্রাচীমূলে শীর্ণ চন্দ্রকলা মলিনবসনা একবেনীধরা। এতসকল বর্ণনা থেকে পরিস্কার পরিস্ফুট হয়েছে একজন চরম মিলনপিয়াসী, বিরহীর আর্তবেদনা ও স্ত্রী'র প্রতি কুশলসংবাদ। সুতরাং প্রেমপর্যায়ের অন্তঃদৃষ্টি কোন কিন্তু ভুলে যাননি মিলনের অবকাশ এখনও রেখে কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

ঙ

তবে পরবর্তী সমস্ত কাব্যেই প্রেমের বাস্তব পরিণতি এবং পুত্র জন্মরূপ আশীর্বাদ ধন্য হযে এক পবিত্রতার পর্যায় পরিবেশিত হয়েছে। যদিও বিক্রমোর্বশীয় নাটকে উর্বশীর অবতারণা অত্যন্ত লৌকিকভাবে— যেমন কিনা অধুনা চলচ্চিত্রে নায়িকা কোনো খলনায়কের কাছে ধরাশায়ী তখন বীরের মতো নায়কের আবির্ভাব এবং নায়িকার উদ্ধার। তবে এর পরবর্তী প্রেমের আবহ জমাট আবেগের। নাটকে উর্বশী পুরুরবার প্রেমের এরূপ এক সুন্দর উদ্ভাবনা তৈরি করে প্রমোদ উদ্যানে বিদূষকের কাছে গোপন কাহিনি প্রকাশ, ভূর্জপত্রে লেখা প্রেমপত্র, নাট্যাভিনয়কালে উর্বশীর পুরুষোত্তম শব্দের পরিবর্তে পুরুরবা শব্দ উচ্চারণ প্রভৃতি প্রেমোন্মত্ত নায়ক নায়িকার যে অনুরাগ তা যেন মেঘদূতের চরম বিরহ ভুলে মিলন আকাঙ্ক্ষার জন্য উদ্বেলিত। নাটকের কোথাও কোথাও যেন পাগল প্রেমীর মতো আবেদন আকুতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন— উর্বশী নিষিদ্ধ কুঞ্জে প্রবেশ করে লতায় পরিণত হলে পুরুরবার উন্মত্ততায় বৃক্ষ, লতা, পশু পক্ষিকে সংবাদ জিজ্ঞাসা। দৈববশে সংগমনির স্পর্শে পুনরায় স্বদেহ প্রাপ্তি। তবে অবশেষে নাটকের মিলন, এবং পুত্র আয়ুস এর লাভ ও স্বর্গে গমন— যেন প্রেম পবিত্র তো হলোই আবার স্বর্গের আহ্বানে প্রেমকে যেন এক অন্য জায়গায়— কল্পলোকে নিয়ে গেলেন।

চ

এরপর কবি যেন প্রেমের মধুরতার শেষ মিলন বর্ণনা ও পুত্রাবির্ভাব সমস্ত সফলতার কামনার পর যেন আলাদাভাবে একটি বংশবর্ণনা করতে উদ্যত হয়েছিলেন, আর সেটি

হলো রঘুবংশ। ভারতবর্ষীয় প্রেমে জীবনের পরিণামে দুঃখ গ্লানি, অগৌরব এরকম বিয়োগান্তক ভাবকে শ্রেয় মনে করে না। তাই বাৎসল্য প্রেমে মুগ্ধ করে প্রশান্ত চিত্তে স্বর্গফল আহরণ করাই প্রধান উদ্দেশ্য। আর এজন্যই বোধ হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলেছিলেন— 'রঘুবংশের আদি অবধি পর্যন্ত সর্বাংশই সুন্দর। যে অংশ পাঠ করা যায় সেই অংশই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। কিন্তু এতদ্দেশীয় সংস্কৃত ব্যবসায়ীরা এমনই সহৃদয় ও এমনই রসজ্ঞ যে সংস্কৃত ভাষার সর্বপ্রধান মহাকাব্য রঘুবংশকে অতি সামান্য জ্ঞান করিয়া থাকেন।[১১] শৃঙ্গারের ছোঁয়া এখানে আবছা হয়ে যায় বাৎসল্য প্রেমে, সাংসারিক ভাবনার এক বিশেষ প্রতিফলন ঘটেছে কাব্যে। রঘুবংশ রচনার সময় কবির আর সেই যৌবন নেই যেখানে এক আবেগঘন প্রেম থাকবে, থাকবে এক উৎফুল্লতা। তবে হ্যাঁ পিতার প্রতি পুত্রের যে এক হৃদয়মথিত স্নেহ-প্রেম তা অত্যন্ত গাঢ়। এটাই তো প্রেমের শেষ পর্যায়। যেখানে নায়ক নায়িকার প্রেমের মধ্যে এক শক্ত গ্রন্থী থাকে। সূর্যবংশীয় দিলীপ থেকে শুরু করে রাজা অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত ২৮ জন রাজার জীবনী কার্যাবলী ও বীর্যগাথা বংশীয় পরম্পরা বর্ণিত হয়েছে। তবে এসব বর্ণনা হলেও গ্রন্থশেষে যথেচ্ছ মিলনের পরিণতির কথা মনে করিয়ে দিতে ভোলেননি— রাজা অগ্নিমিত্রের ভোগসর্বস্ব জীবনে কিভাবে পরিণতির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছানো যায় তা যেন পাঠক পাঠিকাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

ছ

প্রেম প্রণয় বিরহ, বংশ প্রভৃতি ক্রমপর্যায়ে কালিদাসের বিভিন্ন গ্রন্থাবলীর আলোচনা হলেও অভিজ্ঞান-শকুন্তলা কিন্তু কবির কাছে যেন উপসংহার স্বরূপ। অর্থাৎ অভিজ্ঞানশকুন্তলে যেন সবকিছু একাকার হয়ে গেছে। স্বর্গ, মর্ত্য, অন্তরিক্ষ-দেবতা-মানব-রাক্ষস সবে মিলে আলাদা অনুভূতি এনে দিয়েছে। প্রথম অঙ্কে দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রেম, সাথে প্রকৃতি ও পরিস্থিতির সহযোগিতাই তা ক্রমাগত অগ্রসর হয়ে গান্ধর্বমতে তৃতীয় অঙ্কে বিবাহ। এখানে দুষ্মন্ত শকুন্তলার মিলন হলো তবে অন্তিম পরিণতিতে দুর্বাশার অভিশাপে চতুর্থ অঙ্কে ও পঞ্চম অঙ্কে ব্যাঘাত দেখা দিল। ষষ্ঠ অঙ্কের প্রবেশকে ধীবরের কাছ থেকে আংটি খুঁজে পেয়ে একজন প্রকৃত বিরহীর শারীরিক পরিবর্তন ও মানসিক আচরণ দেখা যায় কবি কালিদাসের সুনিপুণ লেখনীতে দুষ্মন্তের চরিত্রটি এমন চিত্রিত করে তুলেছেন যেন পাঠকের কাছে তা আধুনিক চলচ্চিত্র হয়ে ওঠে। শকুন্তলার চিত্র প্রদর্শন করতে গিয়ে বিদূষকের কাছে নিজের অবস্থা বর্ণনা করে বলেছেন—

সাক্ষাৎ প্রিয়ামুপগতামপহায় পূর্বং

চিত্রার্পিতাং পুনরিমাং বহুমন্যমানঃ।
স্রোতোবহাং পথি নিকামজলামতীত্য
জাতঃ সখে প্রণয়বান্ মৃগতৃষ্ণিকায়াম।।
অভিজ্ঞানশকুন্তলা— ৬ষ্ঠ অঙ্ক, শ্লোক নং-১৬[১২]

দর্শনসুখমনুভবতঃ সাক্ষাদিব তন্ময়েন হৃদয়েন।
স্মৃতিকারিণা ত্বয়া মে পুনরপি চিত্রীকৃতা কান্তা।।
অভিজ্ঞানশকুন্তলা— ৬ষ্ঠ অঙ্ক, শ্লোক নং-২৩[১৩]

এইবলে একজন রাজার অশ্রুবিসর্জন সত্যই বেদনাদায়ক। এরপর কবি পূর্ণাঙ্গ মিলনের জন্য মর্ত্য থেকে স্বর্গ সেখান থেকে অন্তরিক্ষে দুষ্মন্ত শকুন্তলার মিলন ঘটলো এবং সর্বশেষ পরিণতি পুত্রলাভ অর্থাৎ ভরত শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের মিলন ঘটলো। এবং সর্বশেষে ঋষি কন্বের আশীর্বাদ নিয়ে রাজধানীতে পিতা মাতা পুত্রের যাত্রা।

'কেবলি রূপের তরঙ্গ। কালিদাসের প্রকাণ্ড চিত্রশালায় রূপসীর পর রূপসীর চিত্র সুবিন্যস্ত এবং সমগ্র প্রকৃতি অনুকূল প্রেমে ও সৌন্দর্যে অভিব্যক্ত। আমাদের চক্ষের সম্মুখে কেবল একটি চিত্রার্পিত মায়ারাজ্য— রূপযৌবনাচ্ছন্ন এবং রমণীয়।'— বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর— 'কালিদাসের চিত্রাঙ্কণী প্রতিভা'।

'সুন্দর বসন্তকালের উপবন যেরূপ স্বভাবতই মধুর, কালিদাসের কাব্য যেন সেরূপ স্বভাবতই মধুর বলিয়া বোধ হয়, সে মাধুর্য্যে শরীর পুলকিত হয়, মন আনন্দিত হয়।— এক একটি চিত্র যেন এক একটি হৃদয়গ্রাহী রত্ন-কল্পনাসাগর মন্থন করিয়া মানবজাতি ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বল বা মধুর লাবণ্য বিভূষিত রত্ন অদ্যাবধি প্রাপ্ত হয় নাই'— রমেশচন্দ্র দত্ত— 'কবি কালিদাস'।

এ প্রকার কবি কালিদাস সম্পর্কিত প্রশংসাসূচক কত যে বিদ্বজন কৃত উক্তি রয়েছে তার হিসেব মেলেনা। তবে আলোচনার সমাপ্তি অংশে একথা বলতেই হয় যে, কালিদাসের প্রেমের প্রতি প্রণয়ের প্রতি তথা বিরহের প্রতি একটা আলাদা আকর্ষণ ছিল, তিনি ঋতুসংহার কাব্যে যেমন যৌবন শুরু করেছেন, কুমারসম্ভব কাব্যে যৌবনকে আরও একটু এগিয়ে নিয়ে গেছেন, তবে মালবিকাগ্নিমিত্রে মিলন দেখা গেলেও পর্যায়ক্রমে বিরহকে না ভুলে রচনা করলেন বিখ্যাত গীতিকাব্য মেঘদূত। এবার বিক্রমোর্বশীয়ে পবিত্র প্রেম-প্রণয়-পুত্রলাভ হলেও কবি কালিদাস সেখানেই না থেমে বংশচরিত রচনা করতে রঘুবংশ রচনা করলেন, কিন্তু অত্যধিক প্রণয় ব্যাপারে সর্বজনকে সাবধানবাণী দিতেও ভোলেননি। আর অভিজ্ঞানশকুন্তলে যেন প্রেম প্রণয় বিরহ, স্বর্গ, মর্ত্য অন্তরিক্ষ সকলকে একাকার করে

লৌকিক ও অলৌকিকতার সীমা লঙ্ঘন করে প্রেমের ক্রমপর্যায় এক চলচ্চিত্র তৈরি করে বোধ হয় অবসর নিয়েছিলেন।

অন্তঃটীকা

১. শ্রীজাত, আনন্দবাজার, রবিবাসরীয়/৩১শে জুলাই ২০০৫

২. শাস্ত্রী, শ্রী মহাদেব পট্টাভিরাম শাস্ত্রী (সম্পা), ধ্বন্যালোক বারাণসি : চৌখম্ভা সংস্কৃত, ২০০৯, পৃ: ৯৩

৩. ঋতুসংহার : চৈতালী

৪. শাস্ত্রী, গৌরীনাথ সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (খণ্ড-২), কোলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, ১৯৭৮, পৃ:১-২

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, কোলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৯, পৃ: ১৪৯

৬. তদেব, পৃ: ৫৮

৭. দাস, দেবকুমার, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, কোলকাতা : সদেশ ১৪০৪ বঙ্গাব্দ, পৃ:১১৩, ১৭৮

৮. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ-৫, পৃ: ২৪৭

৯. রেগ্মী, শেষরাজশর্মা, কুমারসম্ভবম-মহাকাব্যম্, বারাণসী : চৌখম্ভা সংস্কৃত সংস্থান, ২০১১, পৃ: ১১

১০. ভট্টাচার্য, সুকুমারী প্রবন্ধসংগ্রহ-২, কোলকাতা : গাংচিল, ২০১২, পৃ: ২৫১

১১. বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ-৩, পৃ: ১০৪

১২. রায়, গঙ্গাসাগর (সম্পা.), অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, বারাণসী : চৌখম্ভা সংস্কৃত সংস্থান, ২০১৫, পৃ :৩০০

১৩. রায়, গঙ্গাসাগর (সম্পা.), অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, বারাণসী : চৌখম্ভা সংস্কৃত সংস্থান, ২০১৫, পৃ: ৩১০

১৪. ত্রিপাঠী, ব্রহ্মানন্দ (সম্পা.), কালিদাস-গ্রন্থাবলী, বারাণসী : চৌখম্ভা সুরভারতী প্রকাশন, ২০১৪

১৫. https://en.wikipedia.org/wiki/kālidā sa

১৬. https://en.wikipedia.org/wiki/?tusa?hāra

১৭. https://en.wikipedia.org/wiki/Mālavikāgnimitram.

Birds in Aśokan Pillār Edicts

Smritikana Tewari

Birds play a vital role in keeping this balance of nature. Throughout the world, birds are essential seed dispersers for plants that provide us with food, medicine, timber, and recreation. In addition to being important parts of food webs, birds play other roles within ecosystems. Ecosystems such as forests and the marine environment provide us with food, medicines and important raw materials. They keep the climate stable, oxygenate air and transform pollutants into nutrients. Birds play an important role in the effective functioning of these systems. Birds eat insects. They are a natural way to control pests in gardens, on farms, and other places. In ancient India, the great emperor Aśoka also put his concerns about birds in his pillar edict.

In the fifth pillar edict, issued in the 26th year of his reign, Aśoka forbade the killing of certain animals. Regarding this, he provides a list of animals and birds which should not be killed on some days and another list of animals which have not to be killed at all occasions. Aśoka expressly says that they are the creatures which are neither eaten nor put to any use. Following species were declared exempt from slaughter, namely Œuka (parrots: *Psittaciformes*), Suka (Maina: *Acridotheres tristis*), Aruha-Chakravâka (Ruddy goose: *Chloephaga rubidiceps* and Brahmani duck: *Tadorna ferruginea*), Nandimukhas, Pigeons (*Ducula aenea and Columba livia domestica*), Gelâmas (red-crested pochard: *Rhodonessa rufina* and pink-headed duck: *Rhodonessa cayophyllace*), Peacock (*Pavo cristatus*).

Suka (parrots) and Sârikâ (Maina)

Suka and starling are classed in medical works pratudas i.e birds that pick up their foods. Pratudas itself is a sub group of the group of animals known as *jânghala* (living in high ground and in jungle). These two birds are said to be the faculty of human speech. śuka and the śâri named together in Ath. sam.

The Suka is described as harimdâGaA or yellow in the Zg-saṇhitâ. The bird is included in the list of sacreificial victims at the aśvamedha (horse sacrifice) in the yajurveda samhitas. The flesh of parrot is said to be astringent, acid, not oily and cooling when cooked, useful in consumption, cough, anaemia and diarrhoea, light and appetizer.

Fig (a): Śuka (parrots)

Fig (b): Sārikā (Maina)

Sârikâ is a small bird, also known as maina and member of starling family. This bird is mentioned in Hindu tales. The sârikâ or maina bird is found innurable times in Sanskrit literature, mainly as favourite cage bird. The form sârikâ is found in the Vasiṣṭha Dharma-sûtras. In the Meghduta Kavya, this bird is mentioned as a favourite bird of the wife of Yaksha. Both the Śuka and the śâri had been taught to speak like man from very old times (śâdrih svetâ puruśa-vâksarasvate śukah śvetah puruṣa-vâgâ).

The śuka is often taken to be the male of śâri; but according to Bûhler, this is a mistake. That the śâris belonged to a different genus was known in India of old, as the following quotation from the Jâtakas amply shows:

Suvo va suviṁkâmcyya sâlika pana sāLikam.

Suvassa sLlikâya ca saṁvâso hoti kldiso ti

Though medicinally included in the diet, the flesh of the parrot and the starling had ceased to be used as ordinary food from a very long time. In the Dharma-sûtras they are not found among permissible meats.

Aruna -Chakravâka (Ruddy goose and Brahmani ducks)

Aruna (ruddy) may be an adjective going with Chakravâka. Chakravâkas are ruddy goose, commonly called the brahmani duck or goose. Chakravâkas are placed in the class vâri-cârinḳḥ or ambu-cârinaḥ. Chakravâka birds are always seen to fly in pairs during the day but are supposed to remain separate during the night. The ruddy goose is known from the earliest times for their conjugal love. In Rksamhitâ, they are compared to Aśvins; in the Atharva-saṁhhitâ they are considered models of conjugal love.

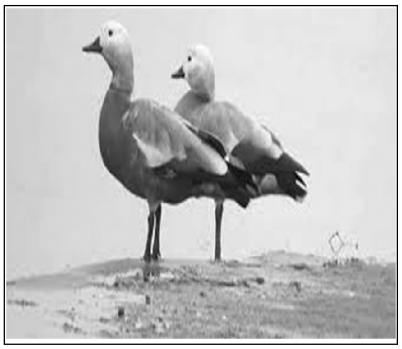

Fig. (C): Male Brahmani duck

Fig. (D): Female Brahmani duck

Chakravâka birds are reborn lovers who had committed the "sin" of disturbing sages at their meditation in their former life. The sages cursed the lovers to turn into ducks: worse, the pair had to separate after sundown and was therefore, reduced to calling one another piteously through the night.

The male has large orange-brown duck with paler head and neck and a faint black collar at its base. Wings white, black and glistening green. Tail black. Female similar, but lacking the black collar with much paler (almost whitish) head.

In the time of the Dharma-sûtras the Brahmani duck had ceased to be among the permissible foods. The eating of its flesh is specially forbidden and involved penances.

Nandimukhas

Nandimukha is quoted from the bhâvaprakâsa by Monier Williams in the sense of "a kind of water-bird". The etymological meaning of the name, "drum-mouth, drum-break". Probably it is comb duck. It is a largest species of duck. Adults have a white head freckled with dark spots, and a pure white neck and under parts. The upperparts are glossy blue-black with bluish and greenish iridescence especially prominent on the secondaries (lower arm feathers). The male is much larger than the female, and has a large black knob on the bill.

If seen at a distance, immature comb ducks can also be mistaken for a fulvous whistling duck (*Dendrocygna bicolor*). However, knob-billed ducks in immature plumage are rarely seen without adults nearby and thus they are usually easily identified too.

This duck feeds on vegetation by grazing or dabbling and to a lesser extent on small fish, invertebrates, and seeds. It can become a problem to rice farmers. Knob-billed ducks often perch in trees. They are typically seen in flocks, small in the wet season, up to 100 in the dry season. Sometimes they separate according to sex.

Fig. (e): Nandimukha

Pigeons (Village pigeon, forest pigeon and white pigeon)

Pigeon is described as the messenger of the god of destruction. The eating of pigeon's flesh has not been permitted in any of the Dharma-sûtras, old or late. It's eating involved penance. But that it was eaten in the old days is evident from the Jâtakas. Setakapota is "white pigeon" whereas gâmakapota is "village pigeon".

Caraka draws a distinction between the village pigeons and forest pigeons, and says that the flesh of the village pigeon is astringent, sweet, cool, good for blood and liver, and sweet (to eat) when cooked; while the flesh of the forest pigeon is said to be somewhat lighter, cool, constipating and gentle (in action).

White pigeon is also called as rock pigeon or domestic pigeon. The rock pigeon is the world's oldest domesticated bird. Domestic pigeons reproduce in a similar way to the wild rock pigeon.

Fig. (g): Village pigeon

Fig. (f): Forest pigeon

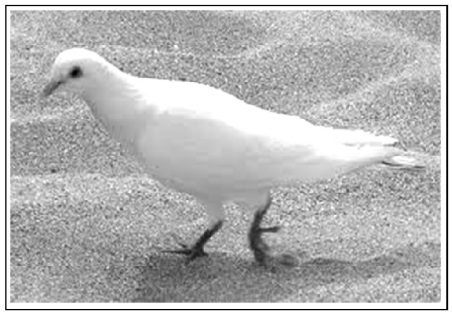

Fig. (h): White pigeon

Gelâta

According to Manomohan Chakrabarty, it may be a variant of animal named goltikkâ.

K.R. Narman states that "It is compared by turner with Lahnda gerṛâ, whereas dove is identified by Bloch, but since the majority of birds in this list seem to be aquatic birds, it would seem preferable to adopt Charpentier's view that is to compare the word with duck". Although this suggestion was rejected by turner because of the very doubtful equation. If this is acceptable then gela can be derived from gaira which would mean "mountain duck". It might be possible to see some connection with the vernacular form gairi "the common teal" mentioned by Johnston. Alternatively, since

the Brâhmi symbol for e is an incompleted o, it would be possible to regard gelâta as a mistake for golâta. If golâta is the correct reading it would mean reddish duck which could be red-crested pochard (black body, white flanks, mop-like crest rich chestnut and golden orange, with bright crimson bill) or pink-headed duck (blackish brown above and below with a pinkish buff speculum prominent in flight).

Fig. (i) Red-Crested pochard

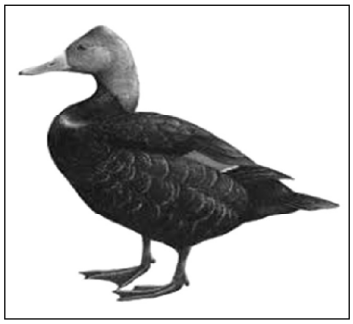

Fig. (j) Pink-headed duck

Peacock

The peacock (also known as peafowl) is a medium sized bird most closely related to the pheasant. Unlike it's common pheasant cousin that inhabits areas of the Northern Hemisphere, the peacock is found in warmer climate of the Southern Hemisphere, with the peacock being most commonly found in India.

Peacock is known since the earliest times and at present it is the sacred bird. In the Jâtaks, the common form is mora. The other forms are mayûra and mayura. The peacock killing is forbidden specially in Râjaputânâ, but we see from the old days that its flesh was a permissible food. Yama says, the peacock, the partridge, lâvaka, vâddhriṇasa and the varattka are always eatable. Gradually the idea has changed and according to Dharma-sûtras, the killing of peacock involved a penance, through a

small nature. The Mahâbhârata also prohibited the eating of its flesh. According to Suśruta, the flesh of peacock should always be taken. According to Caraka, Sûtra, the peacock flesh is most beneficial for the sight, hearing, mental power, age, appetite, colour, voice and the life. The eggs of peacock are good in scanty semen, cough, heart diseases and ulcer.

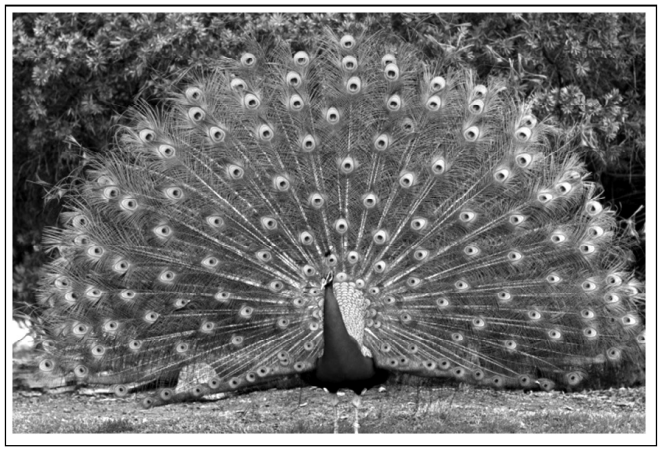

Fig. (k): Peacock

Conclusion

All birds have important roles in the ecosystem. There seems to be an ecological balance between the birds and nature. King Aśoka expressed concern about birds being killed for meal or sport. His intention was to end such killing. He therefore stopped the killing of birds and abstained himself from eating of birds and animals.

Bibliography

Ahir , D.C. Aœoka the Great. Delhi 1995.

Ali, Salim. The Book of Indian Birds. Thirteenth edition 2002.

Banic, B. Krishna Mainamati. Sanskrit Inscriptional and Archaeological Study. New Delhi 2009.

Barua, B.M, ed. Asoka and Inscriptions, Part-I & Part – II, 2nd edn. Calcutta 1955.

Bhandarkar , D.R, ed. Aśoka. Calcutta 1925 & 1955.

Bhattacharya , Vidhushekhar. Buddhist Text (Aœoka). Calcutta 1948.

Bhandarkar , R.G. The wilson Philological Lecture on Sanskrit and Derived Languages. Bombay 1914.

Bhatta, Pandurang. Buddhism in India and Abroad. Mumbai 1996.

Chauhan , Gain Chand . Origin and Ggrowth of Feudalism in Early India . Delhi 2014.

Chaurasia, Radheyshyam . " History of Ancient India : Earliest time to 1000 A.D " India 2002 .

Dhammika, Bikku S. The Edict of King Aśoka. Singapore 2004.

Dutta, R.C. The History of Ancient India. New Delhi 2009.

Gokhale, Balkrishna Govind. Buddhism and Aśoka, Corpus Inscription Indicarum. Vol.1

Mookerji , B.M. Aśoka-2300 years. Calcutta 1996.

Twist Ending in O'Henry's Stories (selected) : An Exploration into Aesthetic and Technical Implications

Subham Mallick

Abstract : This is an endeavour to debunk those snobbish readers and critics who discard the 'surprise inversion technique' in literature as casual entertainment and therefore label the stories incorporating such technique as 'low class literature'. O' Henry whose stories abound in twist-endings, is selected here for critical discussion with a view to pointing out the literary traits which adorn his stories, making them fit for being regarded as 'first rate literature'.

William Sidney Porter, popularly known under the pseudonym of O'Henry, is ever remembered as the unusual short story writer who excels in unique literary devices that have earned him immense popularity among readers of all generations all over the world. The height of popularity he is crowned with, is evident from the setting up of the famous O'Henry Hotel, in Greensboro, North Carolina, which is undoubtedly named after the popular author and native of Greensboro. On a more serious note, the prestigious literary reward 'O'Henry Award' funded by the 'Society of Arts and Sciences' and offered annually to the rising short story writers of America, confirms his literary strength in addition to popularity and acclamation.

The literary technique that O'Henry employs in his short stories is known as twist ending or surprise ending. Unexpected turn of events in

the course of his story also characterises his style. This technique, apart from winning him popularity, has led a section of readers to hurl such harsh criticism as that the stories have little or no literary significance. According to Wilton Eckley "These stories have been widely read and enjoyed throughout the world, and even though in the eyes of some they may not be considered first rate literature..." (1994)

In this paper I have endeavoured, through an in-depth analysis of a few of O'Henry's stories, to conciliate the dispute cropping up surrounding the literary values of the twist endings or surprise endings or unexpected turns in the stories. Are these twist endings or unexpected turns only for the sake of the readers' entertainment or do they have literary significance— this is the topic of discussion on which I shall focus my attention.

A plot-twist is a sudden, unexpected reversal in the sequence of events delineated in the plot of a story or of a work of fiction that go contrary to readers' expectation resulting in their uninterrupted, rapt attention, curiosity and consequently in the ecstasy of thrills of experiencing a series of surprises or wonders. I shall now scrutinize, to serve the purpose of having detailed analysis with a view to establishing my opinion, the following four stories by O'Henry, *The Last Leaf, A Retrieved Reformation, After Twenty Years, The Gift of the Magi*.

The Last Leaf is the story of two young women artists— Johnsy and Sue who got together in a rented room of three-storeyed building in Old Greenwich village. At one point of the story, Johnsy, pneumonia-afflicted, lying bed-ridden, would look out of the window to stare at an ivy-vine which, owing to cold autumnal weather, shook off leaves and in turn gave rise to her such thoughts of morbidity as that she would die with the fall of the last ivy leaf.

The twist of the plot does not come when the last ivy leaf survived tenaciously enduring the beating rain and fierce gusts of wind for two consecutive nights. It, however, started to revive Johnsy: "Something has

made that last leaf stay there to show me how wicked I was. It was a sin to want to die." (O'Henry 147) The readers already surprised by the strange survival of the ivy leaf finds relief to hear Johnsy say: "Sudie, someday I hope to paint the Bay of Naples". (O'Henry 147) The shocking piece of information forming the real twist of the plot comes out from Sue's tongue: "I have something to tell you, white mouse... Ah, darling, it's Behrman's masterpiece— he painted it the night that the last leaf fell". (O'Henry 148) Actually it was Behrman, the old artist who painted the last ivy leaf enduring the icy cold weather throughout the night, consequently, getting attacked with pneumonia died in the hospital.

The author has taken considerable pains to keep Behrman the old artist's sacrifice away from the reader's knowledge prior to the end of the story only to take them by surprise. What they have been figuring out, like the falling of the leaf or Johnsy's death, appears to go counter to the actual happening in reality and thus the entire story, apart from providing a sense of suspense mingled with delight, provokes deeper thought on human sacrifice, unselfish love, that men cherish for their race.

In fact, the ending of the story which comes as a twist to the plot, communicates the message of the author- the spirit of compassion, fellow feeling and creation of art even at the cost of one's life. It is, as if, the older generation's paving the way for the younger generation.

Without the twist-ending the conclusion of the story would have remained incomplete. For the sake of argument; let us take it for granted that the author has delineated, before Johnsy's revival, the graphic details of how Behrman painted his masterpiece.

In that case the readers would have known beforehand the mystery behind the clinging of the last leaf despite inclement weather, and the degree of curiosity and uninterrupted attention would have been lessened, making the entire story less interesting. Without Johnsy's information at the end, the entire story would have been left message-less and lost literary

significance— the last leaf has saved Johnsy's life, and the twist has saved the entire story.

The themes of love, reformation, and determination are deftly dealt with in *A Retrieved Reformation with* typical O'Henry style. It is the story of a safe-cracker who ultimately reforms himself as soon as he comes in touch with love. Jimmy Valentine, the safe-cracker, on his release from the prison, entangled himself in committing consecutive bank robberies amounting to a huge loss of money and consequently became the cynosure of the eminent detective like Ben Price who firmly resolved to arrest him at any cost. In the mean time, Jimmy, with a view to hiding himself, fled to the town of Elmore where he, discarding safe-cracking fell in love with Miss Annabel, the daughter of a banker and prospered as an honest, upright shoe-businessman. He, towards the end of the story, risking the exposure of his past career of crime, rescued a five year old girl who got locked inside the vault of a safe, in the presence of all concerned including Ben Price who had been covertly witnessing the whole incident.

The signal twist in the story, approaches of course, when Ben Price in spite of coming so close to Jimmy, does not arrest him and lets him escape: "Guess you're mistaken, Mr. Spencer", he said. "Don't believe I recognize you. Your buggy's waiting for you, ain't, it?" (O'Henry 49) This decision by Ben surprises as much the readers as Jimmy himself, on the other hand, this twist prompts the readers to think about the unique characteristic traits in Ben's personality. Besides spying and remaining committed to the law of the country, he is essentially human. The existing prison administration has failed to reform Jimmy; Annabel's love is able to do that— Ben realizes it. So, it is through this twist, that O'Henry raises a question regarding the reformative power of the contemporary prison administration, thereby breaks the traditional ideology that criminals must be put in prison with disregard to the humanistic ground, and consequently levels up his story to a true artistic perfection.

Situational irony, consisting of elements of surprise, is so prominently perceived in the story *After Twenty Years*, that when readers finish reading the story, they feel compelled to look back to the story from an entirely new angle. The situation presented is simply and clearly defined: a policeman while patrolling the street in a business block of New York, came across a stranger, made acquaintance with him to know that the stranger, Bob by name, had been waiting there in accordance with a twenty-years-ago-made promise that he would meet his friend Jimmy exactly in the same place and time, after the lapse of that period. The policeman departed, and a 'new arrival', initially mistaken for Jimmy, while taking Bob to somewhere, was identified in the light emanating from a drug-store, by Bob as a person other than Jimmy. The man then, after showing him a letter from the real Jimmy, arrested Bob who was actually a wanted criminal.

The story thrills the readers three times with unexpected shocks, as in the apparent level, there are three big twists all of which work towards the end of the story. The first twist that readers come across is when Bob realizes that the man with whom he is walking along, is one other than his friend Jimmy. Though this is an element of twist, smart readers who are familiar with O'Henry's style can anticipate such twist much before finishing the story. Instead of calling the police officer in disguise by name, the author refers to him as the 'new arrival'. Even Bob himself is sceptical: "You've changed lots Jimmy. I never thought you were so tall by two or three inches". ("After Twenty years", 3-4)

The second twist follows the first one as soon as the plain clothed police officer declares: "You've been under arrest for ten minutes, 'Silky' Bob". ("After Twenty Years", 4) This twist comes as a bigger surprise as it has been deftly played by the author. The author has been hiding the information from the readers by not telling them anything about Bob's criminal past. As a consequence, they get a rude shock to know that the man who has been talking most of the time, and been the centre of attention so far, is actually a wanted criminal.

The third twist that completes the story is the revelation that the policeman introduced at the initial stage of the story is none other than Jimmy. Jimmy communicates with his friend Bob by a letter in which he reveals the moral dilemma that prevents him from arresting his dear friend.

These three twists combined together take readers' suspense to such height as that they are overwhelmed with shocking surprise. A new light is shed on the plot of the story and individual traits of the three characters. There can be no denying the fact that these twists contribute a lot to arresting readers' attention and finally leaving them with aesthetic delight as well.

The familiar themes of friendship and trust (represented by Bob), loyalty, duty and responsibility (represented by Jimmy), moral dilemma involving emotional attachment (represented by Jimmy) that are dealt with in the story are served through the twists: however, the biggest twist being Bob's criminal career, fails to explore the psychological complexity which leads a criminal like Bob to travel over one thousand miles just to keep an appointment made twenty years earlier— is it Bob's loyalty, or pride or psychological repression of his guilt? Unlike an artistic story, which provides ample scope for concluding such doubts, this story leaves such psychological queries unanswered

The deep passionate love that instigates unselfish sacrifice finds superb artistic articulation in O'Henry's story *The Gift of the Magi*. The setting of the story takes us to the penurious condition of a couple— Jim and Della who lived in an eight-dollar-flat, the dilapidated condition of which reflected their poverty: "It did not exactly beggar description, but it certainly had that word on the lookout for the mendicancy squad". (Smith, 150)

It was on the eve of Christmas; Della had a long cherished desire for presenting her husband Jim with nice Christmas gift that would bear the marks of her dedicated love for him. She had not enough savings in her

hand, but her wish was irrepressible. Indomitable desire led her sacrifice her invaluable possession— her beautiful long hair that could make even the queen of Sheba envious. She bought a platinum fob chain for her husband's gold watch which he had inherited from his ancestors. Now, Della her hair being cropped, apprehended that her beauty would diminish and ultimately cause Jimmy's repulsion.

When Jim arrived, glanced at Della, he wore a peculiar expression in his face: "It was not anger, nor surprise, nor disapproval, nor horror, nor any of the sentiments that she had been prepared for". (Smith, 153) The twist of the story that hits the readers with a shocking surprise comes when Jim requested Della to unpack the cover of the Christmas gift that he had bought for her, in exchange of his own gold watch, the object in which he would take pride and which would arouse King Solomon's jealousy. Actually it was a beautiful set of combs, pure tortoise shell with jewelled rims. The irony is that the Christmas gifts of each of them turned out to be useless, though they had bought the gifts in sacrifice of their own valuable possessions.

From the material viewpoint, they may seem foolish or unwise, but in terms of spiritual attachment of depth of love, they are really the magi: "Of all who give and receive gifts, such as they are wisest. Everywhere they are wisest. They are the magi". (Smith, 155) This is undoubtedly the author's message which the twist ending clarifies. The nobility of sacrifice which Della starts by selling her hair comes to a satisfactory finish with Jim's pawning his gold watch beautifully conveyed towards the end of the story, that appears as a twist— without which the whole story would have lost track of the message, that it wishes to convey.

Let us presume for argument's sake, that the twist ending is not incorporated in the story with the result that Jim does not sell his gold watch. In that case, though Della's sacrifice would have been established from her selling of hair, genuineness of Jim's love would have been put in

question; simultaneously he would have lost acceptability as a 'magi'. As a consequence, the whole story would be projected as an ordinary story, its literary significance having been lessened.

Having recognised the indispensable relevance of the twist endings, or surprise endings to the plot of the stories, I now venture to probe deep into other traits of these trick endings that combined together, produce a uniform effect to crown the stories with literary success. In fact the twists-in-tale are not abrupt interpolations imported just to satisfy the caprice of the pleasure-seekers or to create a gimmick for their fascination. It is a twist ending that adds force to the whole structure of the story or brings to light the forces at play in the narrative .The antithetic forces that form the very basis of the story's structure and give it a definite shape, are divulged through the gateway of twist ending.

The surprise ending in addition to augmenting emotion of the story, brings out the justification for the foregoing action. One can hardly resist being emotional to hear such declaration from Sue "Mr Behrman died of Pneumonia today in the hospital. He was ill only two days." (Smith, 148) His death justifies his own actions-creating a masterpiece of art amidst contrary weather side by side with Johnsy's revival from morbidity. The same kind of emotion overwhelms us to see Della's immediate reaction, after she is presented with a nice set of combs by Jim when she has no hair on her head: "And then Della leaped up like a little singed cat and cried, 'oh, oh !" (Smith, 154)

The fact is that such powerful emotional effect is not abruptly imposed at the end of a story-it originates from the antithetic forces, perceived in the structure of the story, that makes us aware of the radical opposition of the two contradictory worlds, irreconcilably juxtaposed. The close, minute review reveals the two opposite forces in the shape of Death VS *Art in The Last Leaf*, Poverty VS Love's sacrifice in *The Gift Of the Magi*, Law VS Reformed soul under the influence of love in *A Retrieved Reformation*

and Dutifulness VS Friendship in *After Twenty Years*. This clash of two forces is prominently perceptible in Anton Chekhov's 'Toska' (Misery) where a bereaved sleigh-driver, after being refused a crumb of sympathy from everyone including a hunchbacked person , finally decides to confide his sorrowful tale to a horse standing in the straw. The miserable world of the sleigh-driver soaked in bereavement is in sharp contrast with the indifferent world of the onlookers.

Guy De Maupassant's often discussed story 'La Parure'(The Necklace) that has earned considerable credit for its 'surprise inversion' also represents the same kind of contradiction between two opposites, poles apart from each other. Motilda Loisel's and her husband's world of strenuous labour and hardship , typical of the working class people and the lucrative world of comfort , luxury, affluence presented in Mrs. Loisel's dream or in the actual life of her friend , constantly clash with each other never coming to reconciliation. In all the cases, the twist endings bring the two opposites face to face making the readers conversant with the unrelenting co-existing of paradoxical forces.

Like all other great stories with twist endings most of O'Henry's stories constrain the readers into retro-reading i.e. cast in the light shed by the ending, reading the entire text from a new angle. This is particularly applicable to *After Twenty Years*. Towards the end of the story when the culmination of the readers' surprise is reached with their receiving the information for the first time that Bob has had some sort of association with heinous crime deserving him to get arrested or that the policemen on watch at the outset of the story was none other than Bob's friend Jimmy, they cannot help re-reading the story with a fresh knowledge about all the secrets of the characters in the narrative. The reading of the story, as it were, completes in two stages. In the first stage of reading readers are likely to underestimate if not overlooked some trivial discordances, like "a tall man in a long over coat" (3) being Bob's friend Jimmy or 'the new

arrival' (3) working "having a position in one of the city department" (4) — which should have roused readers' suspicion regarding the real identities of the men concerned, but do not do so, owing to the author's narrative style. As soon as the first stage of reading is finished, and readers begin re-reading the story, they easily find association of Bob's "handsome watch, the lids of it set with small diamonds" (2) with his criminal past, the only reason being they now become cautious of all such trivialities. The similar cases found in Chekhov's Poprygun'ya ("The Grasshopper") where Olga Ivarovna so passionate about artistry of the 'great men' surrounding her, is gradually disillusioned towards the end of the story and complete bafflement mingled with corroding frustration overcomes her at the moment of revelation of the scientific genius of her dead husband whom she had been ignoring so far. The trick ending here unveils the antithetic tension prevailing in the story and retro reading presents Olga in her true character— one taken in by deceptive coruscation by the mediocre artists.

O'Henry's short stories with trick ending generally leaves no unanswered ambiguity and the antithetic tension gets cleared away, one force having won over other. As for example, the tension prominent in *After Twenty years* is between 'loyalty', 'friendship', and 'law', 'dutifulness'. Bob's genuine friendship that has prompted him to travel over a long distance to keep the promise made long twenty years ago, still remains intact: "I dined here at 'Big Joe, Brady's with Jimmy Wells, my best chum and the finest chap in the world". (2) Such robust faith in the friendship confronts inevitably with the dutifulness of the policeman Jimmy, the maintainer of law and order, when the trick ending consisting of Jimmy's letter, reveals his identity: "when you struck the match to the light of your cigar I saw it was the face of the man wanted in Chicago. Somehow I could not do it myself, so I went around and got a plan-clothed man to do the job". (4) Dutifulness and unflinching loyalty to law of the country is thereby crowned champion. The same kind of paradoxical tension between poverty

and the spirit of love and sacrifice dominating the story *The Gift of the Magi* resolves when poverty- stricken couple Jim and Della each sacrifices his or her only prized possession, but still accepts the uselessness of their sacrifice in a casual mood laughing away their so called foolishness "Dell's said he, 'let's put our Christmas presents away and keep them a while'. They are too nice to use at present... And supposed you put the chops on". (Smith, 155) That the conspicuous victory of love over poverty is the theme round which the entire story revolves, is beyond doubt.

What distinguishes modern fantastic stories from O'Henry's stories with surprise-ending trick is that unlike the stories by O'Henry, in these modern stories ambiguity is retained till the end where everything remains hazy and not clear and definite, leaving the readers in a state of restlessness or uneasiness. Surprise endings in such stories only intensify that effect. For example, in Maupassant's story Sur L'eau ("On the River") all the strange visions of a fisherman whose boat gets suddenly stranded in the middle of a river at night remains ambiguous because when he, with the help of another two boatmen, is raising the anchor, it is blocked by the dead body of an old woman. This, apart from adding supernatural effect to the situation, leaves the readers with two interpretations of the incident—pragmatic and supernatural, each of which being acceptable, gets super imposed on the other and thereby generates equivocality.

Another characteristic feature of O'Henry's stories is that they are closed ended stories as distinguished from modern open-ended stories. Keeping this in view, O'Henry's story should not be construed as lacking in thought provoking elements or sublime rationality on humanity or deep, penetrating insight into the enigma of existence; rather they are free from ambiguity and can provide, besides creating powerful emotional effect, a definite and straight forward answer with regard to the author's intention—the message or principle that he wishes to convey to the readers.

The prominent and unanimously acknowledged similarities, in the eyes of the readers of short stories, between Guy de Maupassant and O'Henry leaving aside the dispute as to who imitated the other, is that their stories end with surprise or twists— which is the result of the surprised inversion technique and which earned them high credit in their respective countries. However, there are some readers who are more inclined to underrate such twist ending stories in comparison with modern stories of Katherine Mansfield's, Henry James, or Anton Chekhov. Supporting the theories engraved in Frank kermode's *The Sense of an Ending* critics like David Sheridan, John Gerlach, or Susan Lohafer believe that ending of a story is of prime importance. In this context, Edgar Allan Poe, in his *Philosophy of Composition* observes "it is only with the denouement constantly in view that we can give a plot its indispensible air of consequence or causation, by making the incidents and especially the tone at all points tend to the development of the intention". (1)

The ground on the basis of which the snobbish readers tend to underview the stories of O'Henry or Maupassant seems to be that the endings (marked by twists or surprises or abrupt terms) in their stories are contrived and locked in, thereby leave nothing with the readers to draw conclusions; whereas the stories of Chekhov or Mansfield are marked by open endings that are natural, not contrived and therefore, provide ample scope for the readers to draw conclusions or explore the psychological complexities involved in the stories. These prejudiced, one sided views are bound to be incorrect, as the snobs, blinded by partiality, far from acknowledging the variety in the range of literary genre, do not perceive the positive traits that the stories with twist ending display. What Iain Reid in his I'm Thinking of Ending Things in the context of ending relevance has observed, is worth noting here: "I'm thinking of ending things. Once this thought arrives, it stays. It sticks. It Lingers... It's always there. Always". (1) The ending is a concept that stays with the reader because it makes the maximum impact after the story has been completely read and understood.

Frank Kermode in *The Sense of an Ending*, states that when the readers look forward to, in any literary work , their expectations regarding the sequence of events, to reverse ironically, it implies that they wish to reach discovery or final realisation in an unexpected route. The more daring the reversal of our expectations, called peripeteia in literary terms, becomes , the more certain we feel about the realistic touch of that literary composition. In Kermode's words "the more daring the peripeteia, the more we may feel that the work respects our sense of reality; and the more certainly we shall feel that the fiction under consideration is one of those which, by upsetting the ordinary balance of our naive expectations, is finding something out for us, something real". (18) This theory of Kermode corroborates the unexpected turns of events or twist endings in O' Henry or Maupassant's stories .Above all that life's course is full of unexpected twists or surprises is beyond doubt-which, in turn, reflects the realistic touches in the stories that end in twists.

To sum up the elaborate critical analysis, I convey the view that those who regard the typical O' Henry endings that characterise situation -reversal or surprise-twists in the story, as contrived, cursorily done, entirely for the sake of entertainment are ridiculously mistaken in having such a prejudiced, unjustified view. On the contrary, by incorporating such a tricky literary style, O' Henry is successful in providing almost in all his short stories a majestic blend of artistic perfection and aesthetic entertainment.

Works Cited

Eckley, Wilton. Reference Guide to Short Fiction, ed. By Noelle Watson, St. James Press, 1994. <https://www.orrt.org> o'henry>criticism accessed on 20/02/2018, 04:30 p.m.

Kermode, Frank. The Sense of an Ending. New York: OUP, 2000. Print.

O'Henry, After Twenty Years, http://www.newagepublishers.com/samplechapter/000558.pdf. accessed on 07/03/2018, 6.00 p.m.

Poe, Allan Edgar, The Philosophy of Composition, "The new Short Story Theories" Chap. Poe on Short Fiction, ed. by Charles E. May Athens), OH; Ohio University, Press, 1994.

Reid, Ian. I'M THINKING OF ENDING THINGS, New York: Scout Press,2016. Print.

Smith, C. Alphonso, Selected stories from O'Henry, New York: The Odyssey Press, Web: https://archive.org/details/selectedstoriesf00henr.pdf. accessed on 21/02/2018, 8.00 a.m.

Train to Pakistan : An Indo-Anglian partition novel

Amir Hossain Khan

Abstract : Khushwant Singh's Train to Pakistan is a memorable partition novel of International repute. It reaches up to the rank of the all-time classics for its relevance of theme, superb art of characterisation and a narrative art that touches the borderlines of that of Dickens, Hardy and even Shakespeare in his famous tragedies. Juggut Singh, Nooran, Hukum Chand, Iqbal Singh, etc., are real human characters of flesh and blood like ourselves. The martyrdom of Jugga raises him to the levels of the greatest martyrs of love of all times: Farhad, Romeo, Leander, etc. But the ending of the tragic novel is perhaps the most sensational. The question put before us by the author has no reply. Countries may be parted, but love? The question is put before the conscience of the world.

Key Words : Independence, Pakistan, Partition, Trauma, Boundary, Train, Love, Separation.

Introduction : The English came to India, ruled it for about two centuries and they left the country in a huff when there was a great public upsurge beyond their power to control against their colonial rule, but before leaving, they divided India into two parts: the Hindu Hindustan and the Muslim Pakistan. The division, in course of time, turned into a violent and bloody man-made disaster, so much so that the Indian sub-continent, even after seventy years of the bifurcation is witnessing a crisis, of which there does

not appear to be any solution whatsoever. Khushwant Singh's Train to Pakistan is a realistic record of such a move made by the British colonisers in the middle of the last century in the wake of the two great Wars.

The News of Partition : India became free in 1947. Khushwant Singh's *Train to Pakistan* was published in 1956. Mr. Singh, being a resident of the bordering state of the Hindu Hindustan, could feel the heat that was gradually increasing with the passage of time. He must have seen the course of events with his own eyes and must be very sad at heart at the suffering of the displaced persons on both the lands on both the sides of the border. His narration of the suffering of the people is superb. He has given the details of the pathos of the situation, but has not romanticised the matter. The novel is thoroughly steeped in humanism calling to mind that of Mulk Raj Anand, the famous Indo-Anglian novelist of the pre-Independence era and his English Victorian counterpart, Charles Dickens. The story is set in an imaginary village called the Mano Majra somewhere in the Hindu Hindustan near the border. Mano Majra is said to be a non-descript sleepy village seemingly with no connection with the world and even with the rest of India itself. People are too simple to realise the meaning of Independence. When they are told of it, they are astonished and look at one another with an air of disbelief. The ordinary villagers want to know from any person whom they consider educated and wise. But nobody who visits the village or its outskirts seems to know the meaning of Independence and the name of Pakistan. Some have of course heard the name of Gandhi, but nobody has heard the name of Mohammad Ali Jinnah. The people could not dream that the wave of the Independence and the partition of the country would soon reach them and throw them in to the midst of an unprecedented turmoil robbing them of the peace and tranquillity in which they were living so long.

The Village : Khuswant Singh, like Raja Rao, another Indian stalwart of Indo-Anglian novel, has given a graphic and picturesque description of

the village Mano Majra at the very beginning. Raja Rao did the same in the depiction of the village, Kanthapura, in his famous Indo-Anglian novel written with the same name, almost a decade before the Independence and the partition. Singh has written that Mano Majra is a village where mostly poor people live in perfect amity. It has never witnessed any communal riot, not even a petty skirmish involving members of different communities. All except three houses in the village are mud-built houses or ramshackle cottages. One of the large brick-built houses is that of Lala Ram Lal, the cruel usurer, who exploits the poor villagers to his heart's content. Other two stone-built houses are the Muslims' masjid and the Sikhs' gurudwara, where the devotees worship their respective gods and there has been no bad-blood or a petty quarrel on any matter. But the silence of ages was broken suddenly and everywhere there were daggers in every eye.

The People : The people of Mano Majra are on good terms with one another. Imam Bakhs leads the Muslim prayer in the mosque five times a day and before them he shouts the azan standing on a stone near the gate of the masjid. People, who come to pray in the mosque, ask him what is the meaning of Independence and they also want to know if India has really become free. If it is free at all, what will come of the freedom. People has to suffer all the same. Before the Independence, they were exploited by the British, and now that the British has gone away, the big guns of the society will exploit the poor. The poor and the down-trodden have nowhere to go. They are destined to suffer and die wallowing in poverty. They must, therefore, go on living in the dark without trying to know the meaning of Independence and the merits and demerits of Independence.

The Art of Characterisation : Khushwant Singh is a deft artist of the description of the setting; and he is no less expert in the matter of characterisation. Almost every character in the novel is real, a human being of flesh and blood. Their simple reactions to any great event is of our own. Side by side with good characters, Khushwant Singh has also

presented the evil ones. It is natural for antisocial elements to launch their sway among the simple folk. Both the notorious dacoits: Milla Singh and Juggut Singh are the terror of the Mano Majra village and the station Mano Majra by the side of the village. Khuswant Singh's art of characterisation brings to our mind that of Shakespeare who lived and wrote almost four centuries ago and whose art of characterisation is considered the testament of this literary art cutting across the boundaries of time and place.

The Representation of Characters : No other author of Indian English writing is such full of varieties as Khushwant Singh. Mr. Singh has chosen representative characters from every walk of life. There are people from the predominant Sikh community, the Muslim and the lone Hindu family living in the village. There are also robbers and dacoits and other anti-social elements that are the natural byproducts of expanding human civilisation. Both men and women represent their respective sexes. Some are young and the others are old. Even children are not excluded from the narration. Singh has taken care to incorporate animals, domestic and wild, into the narration of his story. In all, it is a realistic microcosm of real India in transition from colonisation to freedom. But, in the middle of the historical change, he has showcased the trauma of the people, in its most pathetic colours.

The Classical Design : The shadow of Shakespeare's plot-construction is noticeable in the narration of Khushwant Singh's *Train to Pakistan*. Yet the point-of-view does not become pessimistic like that of Thomas Hardy. Mr. Singh has called a spade a spade, never wanting to be sensational in his writing for the sake of cheap popularity. The plot has a classical design. It follows the course of the established norms of dramatization. From the exposition and complication the action of the novel reaches its sorrowful climax and, after that ends with a brief denouement. The ending is the most effective. The death of the villain-hero amply catharsises the emotions of

our pity and fear leaving us in a calm of mind, all passions spent.

The Tragic Hero : Khushwant Singh in the writing of his Train to Pakistan seems to have followed the principle of Shakespeare making a villain the hero of the novel as Shakespeare did in his Macbeth. Juggut Singh (Jugga) is a notorious dacoit and a terror of Mano Majra. People tremble to hear his name. At present he dominates the scene of crime in the region. But he has not become a criminal overnight. Before becoming a robber of such prowess, he was in the gang of Milla Singh, where he gained his expertise in the field of crime under the patronage of Milla Singh. But, after some petty quarrel with Milla, he left the gang and has built his own party of young dacoits. He was doing well his work as a green-horn in the field of crime with unhampered enthusiasm, but the arrival of a young girl seemed to change the direction of his life and thought.

Nooran : Nooran, a young Muslim girl, is the second most important character in the novel. She is whole-heartedly in love with Jugga. She is ready to give up everything for him. Her love is mostly unconditional except the fact that she wants her lover to mend his ways and be worthy to get her love. Acting under his promise given to her, Jugga appears to be changing and may soon emerge as a good human being. But, his love with Nooran lands him into an unforeseen turmoil, which ultimately lands him in the net of police and finally to the prison. While Jugga is in jail, the situation outside it changed totally. The English left India and before leaving they made the division of the country. The Muslims in India were to go to Pakistan and the Hindus and Sikhs living in Pakistan had to come to India. The change of the situation threw Nooran into the middle of the crisis. She must not go to Pakistan with the other members of her community, because her lover is in jail and she now is carrying his baby into her womb. Having no other option before her, she gathers courage to visit Jugga's mother with the fond hope that she would not turn her away. But, the old Sikh woman would not agree to the marriage of her son with a girl who

belongs to the Muslim community. When Nooran bursts into tears and clutches the feet of Jugga's mother, the later ultimately experiences an epiphany and she agrees to the marriage of her son with his pregnant fiancée, though she may belong to another community. But Nooran's love with Jugga does not reach a fruitful ending, because the novel ends apparently with a notion that Nooran with other Muslims seated on the roof of the goods-train sped through the bridge where lay the dead body of Juggat Singh cut into pieces on the railway tracks. Khushwant Singh has left Nooran's fate to our imagination. Nobody knows what happened to her. But everybody knows that Jugga Singh became the martyr of love.

Hukum Chand-Haseena Sub-plot : Third in the rank of the hierarchy of the characterization comes Hukum Chand, the City Magistrate. We may consider his affair with Haseena, the Muslim prostitute, as sub-plot of the tragic novel. He has his share to contribute into the tragic pattern of the novel. He is a very powerful Government official, but he has a soft corner in his heart. He had Haseena for some casual entertainment, but his association with her in course of time built a bond of human relationship although there was a very big distance between Haseena and him both in respect of religion and age. Haseena is junior to his daughter. Here we see that the mutual attraction between Hukum Chand and Haseena has also share in the tragedy of the novel. When Hukum Chand comes to know that his Haseena is sent to Pakistan seated on the roof of the goods-train from the refugee camp, he orders the release of Jugga not knowing that the latter might jump into the fray to stop the death of his Nooran with the other members of her Muslim community. In short, the Hukum Chand-Haseena sub-plot is an important ingredient of Khushwant Singh's idea of human tragedy.

Iqbal Singh : Iqbal singh has no direct participation in the action of the novel but he certainly acts as a catalyst to it. He is an educated Indian Sikh and the people of Mano Majra want to know from him if India has really

become free and the Englishmen left the country. His arrival to Mano Majra is significant because the local people consider him as a wise man who is in a position to come out with the real significance of Independence. Though he has no love affairs of his own, but he becomes the target of the suspicion of the people and the Government officials. The Muslims know him as a Sikh, and the Sikhs doubt him to be a Muslim. His name, physique and his air give rise to the suspicion breeding both among the Muslims and Hindus about his credential. He has to parade his private parts to the suspecting policemen including Hukum Chand in order to prove that he is a Sikh, not a Muslim. He has to explain the reason of his circumcision saying that it was the outcome of a surgical operation to get rid from an infection in his genitals. Iqbal Singh here is a reminder of Diggorry Venn, the Reddleman, in The Return of the Native written by Thomas Hardy, the illustrious Victorian novelist, who is considered by popular opinion as the prince of pessimism.

Minor Characters : Barring the major characters of Juggat Singh, Nooran, Hukum Chand, Iqbal Singh and Haseena, there are also some very important minor characters who move about in groups calling to mind of the rustic philosophers of Thomas Hardy's Victorian novels, particularly his *Far From the Madding Crowd, The Return of the Native, The Mayor of Casterbridge and The Tess of the D'Urbervilles*, etc. Milla Singh is the gang-man of his group of dacoits, but his power has dwindled in course of time giving rise to the ascent of Juggut Singh, who at present dominates the scene of crime in Mano Majra. Lala Ram Lal is the only Hindu rich money-lender, but he has a small role to play in the novel. His role may be brief, but it is significant, because his murder brings about the complication in the action of the novel. He was murdered by the people of Milla Singh, but Juggut Singh was supposed to be his murderer, as he was not found present at his house as promised by him to the City Magistrate, and was busy making love with his girl-friend, Nooran, with the bushes in the

outskirts of Mano Majra. His absence at his home landed him into the prison resulting into his separation from his love, Nooran. Thus, Lala Ram Lal has a brief but significant role to play in the tragic pattern of Khushwant Singh's philosophy of human life.

The Literary Value : Characters are the vehicles of the idea of the theme which the author insists to convey. The central theme of Khushwant Singh's Train to Pakistan is the depiction of the trauma and the tragedy of partition and he has done the job excellently. For making the climax such sensational, Singh has used such literary elements that are both conventional and historical. The present novel is a historical fiction not deviating from the tracks of reality. The opening of the novel is such striking that once the reader begins to read it, it becomes difficult to give it up. So engaging is the theme and the narration of the novel! The fiction is written in Indian English, but it is in no way inferior to the standard Queen's English used as the medium of literature in England. Even Englishmen, free from their national prejudice, must be impressed by this Indian English historical novel. Credit must go to Khushwant Singh for creating such a gem of literature remaining within the boundaries of the classical norms of literary style.

Conclusion : Khushwant Singh's Train to Pakistan is the most sensational artistic creation of the present times. It even surpasses the popularity of G. B. Shaw, W. B. Yeats and T. S. Eliot, in the merits of its literary value. The beginning is as engaging as is the ending impressive and memorable. The total impression, in a word, is superb. Such an impressive writing is not much there to be had in the treasure-trove of the modern English literature. Mr. Singh's Train to Pakistan has raised the value of Indian English writing in the estimation of the world to a great extent. The modern readers of Indo-Anglian literature and the scholars and critics alike are impressed beyond limit by the impression created by Khushwant Singh's Train to Pakistan. It is not only a train running between India and Pakistan but one

loaded with helpless humanity running direct into the conscience of the humanistic element of the mankind throughout the world.

References

1. Iyengar Srinivasa K R, Indian Writing in English, Bombay: Asia Publishing House, 1961. Print
2. Train to Pakistan, New Delhi: Orient Longman Pvt. Ltd. 2005. Print
3. Giridhar V.T. "Historical Text, Human Context: A study of Train to Pakistan". Khushwant Singh: The Man and the Writer. Ed. Dhawan, R K, New Delhi: Prestige Books, 2001. Print
4. French Warren. "Khushwant Singh". Contemporary Novelists. Ed. Henderson, Lesley. Chicago: St. James Press.1991. Print
5. Dhawan, R.K. Commonwealth Fiction, Delhi: Classical Publishing Company, 1988 Print

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 11. May, 2019

Fissures in 'Masculinized' memory: British Women in the First World War

Srirupa Mahalanabis

"They're going to keep their end up
Till the khaki soldier boys come marching back"
(Jessie Pope War Girls)

"O damn the shibboleth
Of sex! God knows we've equal personality.
Why should men face the dark while women stay
To live and laugh and meet the sun each day?"
(Nora Bomford's Drafts)

The year 2019 marks the centennial year of the end of the First World War and the suffrage of women in Britain. Suffrage is not only the right to vote but it is also recognition of all the other imperatives associated with the nation state and one's role therein. The First World War brought mixed reactions in England. The Public however was supportive of the Government decision. Nationalistic fervour rose and war was considered an opportunity for the 'test of manhood' (Howard 27). Many saw in the War an aspect of liberation from an outworn regime. Intellectuals and ruling classes participated willingly and found in it an opportunity to display their leadership. Workers in the industries and in the urban environment s got a respite from their tedious jobs. The powers had not contemplated for a long war. British military head Kitchner understood

well in time that the war would be a long one and would need a huge band. As such, it was essential to provision for man-power well in advance. He got an immediate response and by the end of 1914, more than a million men joined. This was more than what had been asked for, and far more than the number that could be equipped and armed. Compulsory enrolment in military service had been condemned by the Liberal Government. But as war progressed, requisition increased until in May 1916, conscription was made mandatory for all men in the age group 18 to 41.

In the Industrial urbanity there arose a sudden lack of workers to work in the factories demanding a sudden "feeling- in" of position. Land was left to be cultivated by women. For the first time, women were forced to give up the comfort of their homes and take the place of their male partners in the factories and fields. Women had already been organizing themselves for the 'suffragette' movement to demand the vote and these organizations merged headlong into the war effort. Women gradually became an indispensible and a reliable alternative, not only in the nursing and welfare services but also in the offices, factories and agriculture thereby being involved and participating in all the activities of the welfare state. Jessie Pope's poem War Girls lists the various jobs that women took up -

There's the girl who clips your ticket for the train
And the girl who speeds the lift from floor to floor
There's the girl who does milk –round in the rain,
And the girl who calls for orders at your door.
Strong, sensible and fit,
They're out to show their grit
And tackle jobs with energy and knack.

By 1915, 256,000 women were employed in the metal and engineering industries that were closely linked with productions of war equipments and ammunitions and hence taken by some to be their participation in the 'war'. It only became natural to recognize these participations. The

Government forced itself to open the gates for women in 1918 through the new Representation of the People Act which gave voting rights to women above the age of 30. As a byproduct of the war, therefore, the condition of women improved and Britain progressed. To quote Simkins, Jukes and Hickey " …the First World War was a powerful catalyst of the social change which was to lead to an era in which women now share the highest political(but not military) offices with men"(10)

However, the war was seen as a 'male domain' and women had nothing to do with it. As women did not fight, they were necessarily excluded from the experience of war. It was a mixed response to the role that women played. Apart from the crisis that almost every English household suddenly plunged into hollowness as women lost their husbands, sons, fathers, brothers and children grew up without fathers , it included the vast arrangement that was required to send an individual to war and for ordinary women the struggle to maintain the household in the absence of their male counterparts. The private, at once, became public and confrontational as accusations of ill decorum and conduct against women became rampant. Women were maligned and their reputations disrespected at many occasions. Many women were thrown out of jobs after the return of their male counterparts. Sharon Ouditt raises important questions "Did the war change things for women? Were they better or worse off as a result of the war? Was the war fulfilling or a debilitating experience? Was it responsible for their being given the vote?" As said earlier, the War brought mixed reaction. While it was responsible to some extent for the re-evaluation in suffrage policies, the condition of women remained more or less the same.

Women responded and wrote literature of their own experience. Maria C. Grey's *The Physical Force Objection to Women's Suffrage* published by the Central Society for women's suffrage ,1901 is a book about the crucial development of the suffragist, pacifist movement. B.L. Hutchers *Conflicting Ideals of Woman's Work* provides a vital context of the debates surrounding women and work. Ellen Key's War, Peace and the Future: A

consideration of Nationalism and Internationalism and of the Relation of Women to War presents a Swedish woman's view of the relationship between war and women and how education is the only way to curb the menacing arrangements that lead to war -"How can we then expect that "this man made world' will be regenerated through women's vote , if women, by her personal share in the war sanctions those means of settling national misunderstanding that she has claimed to wish to combat with her vote." (Ouditt 70). Tierl Thompson edited Dear Girl: The Diaries and Letters of Two Working women in London is a testimony of those who took part in some of the major suffrage rallies. Vera Britian's autobiography Testament of Youth is considered the best record of the war time period. Books were also written by women on the social and cultural history such as Sarah Boston's Women Workers and the Trade Unions covers the period of Trade Union history from 1874 to 1986. Gall Braybon's Women Workers in the First World War: the British Experience is an account of the public debate surrounding working class employment during the period.

Women, during this time wrote abundantly. However, this has found little or no interest until recently. Literature written by women of this period became visible only after the 1980s. Claire Buck points out that Brian Gardner's "*Up the Line to Death: The War Poets 1914 -1918* contained no work by women. Stories written by women were woven around the themes of espionage, stories of love broken by a sudden declaration of hostilities between nations, the horrors of a German attack on a Belgian setting, stories of loss, bereavement and death, the moral and psychological courage with which women tried to rebuild their life after death sometimes through dignity of work or involved in other liaisons. There were again the novels on the liberation movement and how war destroyed the genteel, feminine ideals or how war gave a sudden freedom soon to be destroyed. But these gave no experience of trench and combat. Women lost husbands, brothers, sons, security; were displaced, dispossessed, threatened but did not lose their lives in combat. Their patriotic fervour at crossing the

liminal space and moving to the public domain to keep the supply intact was not patriotic enough and therefore called for no recognition or appreciation. To quote Buck "The equation of women with a civilian homefront that could never successfully comprehend the war experience of the soldier set up a significant obstacle for feminist critics attempting to restore women's writing to visibility and to explain its value."(87) Therefore, while women wrote and confronted their situation at home, their 'absence of presence' continued uninterrupted.

This is an interesting area of research which definitely needs further exploration. Encouraging the study of women's literature of the period will open newer avenues which will confidently place women's contribution on a firmer ground and help to negotiate her position in a pre-dominantly 'man's area'. This is not to eclipse or better man's contribution which stands exclusively but only a humble attempt to locate the women of the period.

Bibliography

1. Bourke, Joanne . Working –Class Cultures in Britain (1890-1960) Gender, Class and Ethnicity. London: Routledge, 1994. Print.
2. Clayton, Brian. Women's Poetry of World War I. English Association First World War Bookmarks. < www2.le.ac.uk >
3. Howard, Michael. The First World War, A verys short introduction. United States : Oxford University Press, 2002. Print.
4. Ouditt, Sharon. Women writers of the First World War, An Annotated Bibliography. United Kingdom : Routledge, 2000. Print.
5. Fighting Forces, Writing Women. Identity and Ideology in the First World War. United Kingdom: Routledge, 1994. Print.
6. Sherry, Vincent Edited. The Cambridge Companion to the Literature of the First World War. United Kingdom : Cambridge University Press, 2005. Print
7. Simkins, Peter, Geoffrey Jukes and Michael Hickey. The First World War – The War to End all Wars. United Kingdom:Osprey Publishing Limited, 2003. Print.

Tussle against Stereotype Gender Role: Women in Salman Rushdie's Midnight's Children

Susmita De

Abstract : The 1981 publication of the omniscient writer Salman Rushdie's Midnight's Children was a watershed in the post-independence development of the Indian English novel. Midnight's Children is overwhelmed at the level of ideas by history and historicity and also covered by the magical realism. However Rushdie's fiction has often been criticised for its representation of women. And Midnight's Children is a harsh critique of gender related power struggles of post colonial Indian society. Rushdie's women characters are stronger and more grounded than the typical Indian women. Countless years in the domestic spheres has branded women as weak, demure and dependant on man. This masochistic society exploits women. Therefore the discussion below aims to scrutinize Rushdie's presentation of those women and their struggle against these traditional gender stereotypes as well as double standard morality.

Introduction

"One is not born a woman, but rather becomes one."

(Simon de Beauvoir)

"The emotional, sexual and psychological stereotyping of females begins when the doctor says, 'it's a girl'."

(Congresswoman Shirley Chisholm)

Gender is a socially and culturally constructed term that describes the social interpretation regarding the identity of man or woman; "gender stereotypes are beliefs shared by people in a given society about how man and woman differ or should differ" (Larson & Buss, 2008). Gender stereotyping is a psychological thought process that constructs a set of beliefs of an individual about the characteristics of a man and woman. Gender inequality is a social phenomenon in a society basically in our Indian society. After the birth of a child, society decides the child as a boy or girl. If he is a boy then he is superior, on the other hand if she is a girl she is inferior. Society constructs an ideology in the minds of the people that a man with his masculine power can do everything and a woman with her feminine weakness can do nothing. In the eyes of a society what an independent woman can't do, an economically dependent man can do. For this kind of double standard morality the women are being often called as 'second sex'. In this patriarchal society always men prove themselves superior in every respect. This masochistic society exploits women. This exploitation of women has often been a central theme of many novels.

But Rushdie's representation of women is quite different. He portrays the development of women characters and their quest for identity in this hostile world. In Midnight's Children the representation of women shows how they struggle to break the stereotypical idea of traditional gender role in post-independence India. These women can be described as superior and defendable. And they are often caught between position and power. However, Rushdie wants to present his women characters as new Indian women.

Discussion

"Women have always been the ones to change my life" (MC, P-266) .

This confession of Saleem's is one of the excellent examples to authenticate the approach of this paper. This paper divided into three parts. First part deals with a brief introduction; second part contains

discussion which goes directly with the textual reference from Midnight's Children; and third part deals with conclusion.

Saleem is the narrator of this Booker of booker's winning novel Midnight's Children. This paper will show Rushdie's portrayal of women characters into three generations. Despite of new freedom, the women were still treated like second class citizen in this society. 'Purdah' was a central aspect of the women's question. In this novel the struggle to break the gender identity begins with the character of Naseem. Thiara says,

> "The text's portrayal of Naseem serves the purpose of resisting a neat resolution of an individual women's entry into the national role which was constructed and propagated by nationalist discourse"(Nicole Weickgennant Thiara, p-61)

Naseem Aziz, Saleem's grandmother who is known as 'Reverend Mother' throughout the novel is too conservative to be reformed. She is first introduced in the novel as a patient of Adam Aziz(grandfather of Saleem) and he was permitted to see only afflicted part of her body through a perforated sheet.

> "You European returned chappies forget certain things. Doctor Sahib, my daughter is a decent girl, it goes without saying…I have required her to be positioned behind that sheet."(MC,P-23).

But changes occurred after her marriage with Adam Aziz. He tries to change her character and tries to transform her into a modern Indian woman. But after a long time, it was difficult to Naseem to be a modern. And for that, gradually she has developed into 'Reverend Mother'. Though she has not achieved modernity but she was giving teaching non-secularism to her children. And she also started to dominate the domestic realm with a strong hand;

> "Yet she refuse to be the victim and turns into a domestic tyrant, and the text does not punish her for her 'unwifely' behaviour but

allows her to develop her dominance to an alarming degree"(Thiara, p-63).

Dr. Aziz's mother was also a strong woman. It is seen at very first that, after the death of Dr. Aziz's father, his mother took over the jewellery business to take responsibilities of her family. Another moment is when Dr. Aziz's mother ripped off her veil after the death of her husband and was happy as she was now free from the rules and regulations of her husband.

"In 1918, Doctor Aziz's father, deprived of his birds, died in his sleep; and at once his mother, who had been able to sell the gemstone business thanks to the success of Aziz's practice, and who now saw her husband's death as a merciful release for her from a life filled with responsibilities…"(MC,P-30).

Mumtaz or Amina Sinai, daughter of Naseem and mother of Saleem, is the second generation woman in this novel. As comparison to her mother Amina is little modern and liberal minded. According to Thiara, "In stark contrast to Naseem, Rushdie created with Mumtaz/Amina a woman who strives desperately hard to be the quintessentially dutiful wife but nevertheless falls short of the expectations associated with that role"(Thiara, p-66). She loves and marries Nadir Khan, a rhyme less poet who fled from assassins. She marries Nadir against her mother and their marriage was secret. Instead of her family no one knew about their marriage. After marriage Amina started living a double lifestyle, one in public and other private. But, two years later when they came to know about Nadir Khan's impotency, Naseem insisted her to leave him and remarry. But Amina was willing to overlook Nadir's impotency. But under pressure of her family she compelled to leave Nadir and remarried Ahamed Sinai. But she still loves Nadir. However she tries to her best to love Ahamed and start a new life. Amina desperately struggles against traditional gender role. When Ahamed Sinai's failed business attempt made them destitute and when their family broke, a very pregnant Amina desperately tries to

earn money. She even does not hesitate to play gamble to earn extra money. While her husband sinks deeper into alcoholism and depression, Amina fights her husband's fight and saves her family, dismantling the idea that a man has to be the head of the household. Amina is not put behind "perforated sheet" as her mother. She struggles to live independently in this society. Amina possess the protective quality of the motherland as she saves life of Lifafa Das from a group of tempted Muslims in Delhi. She makes a public announcement of her pregnancy even before her husband's knowledge.

Rushdie presents Amina as the dream of unified India. He portrays Amina in such a way where she posses all the similarities to mother India. When Ahamed Sinai remained inactive Amina appears the savior of the family. In all respects Amina is as strong as any male in the society. Apart from Amina, Alia and Emarald, two sisters of Amina, are also in the same category. They repeatedly struggle against the traditional gender role.

Rushdie's women are often seen between positions of power. Saleem's aunt Pia Aziz plays a beautiful role in this. She wanted to get rid of her boring life with her husband and therefore she stands against the fact of being treated like a subjugated, ordinary woman. She decided to act on the screen. Actually she wanted to become an independent woman.

Saleem's sister, Jamila Singer who was known as 'Brass Monkey' before her transformation into a singer. When perforated sheet syndrome reoccurs in Jamila's life, she strongly protests against this. Apart from her, Evelyn, an Americal girl on whom Saleem has a crush during his stay at Methwold Estate, is also important. "Her extraordinary ability to perform high-risk but spectacular stunts on a bicycle is quite unbecoming of a normal girl's nature"(Khomdram Shyamsundara Singh,p-56).

Parvati, Saleem's legal wife, is also plays a beautiful role. She was known as 'Parvati, the witch'. Her name suggests that she is portrayed as an embodiment of courage and guile. Once she saves Saleem's life and in

a way she helps him to escape from East Pakistan is too daring for a normal woman. Her dominating personality is also observed in Shiva's life. Shiva who used to lead a reckless life, when Parvati comes his life, she persuades him to maintain a steady, conjugal life. But when she is ill-treated by Shiva, she leaves him instead of her pregnancy.

Padma is another character whom Rushdie presents in a little different way. She is the female audience to whom the entire narrative of the novel is address. D.C.R.A Goonetilleke interprets,

> "From one perspective, Midnight's Children is a fiction about fiction, an allegory about writing, a deconstruction of the text. Saleem is writing his novel and he relates it to Padma. She is not a reader but a listener, an audience. She is a pickle maker (at Mary Pereira's Braganza pickle factory where Saleem is presently the supervisor), and such a woman, in an Indian context, would be illiterate, at least in regard to reading in English" (Salman Rushdie,P-41).

Padma is not only an audience, she is a co-creator. Saleem always needs Padma's support. "I am, perhaps, hiding behind all these questions. Yes, perhaps that's right. I should speak plainly, without the cloak of a question-mark: our Padma has gone, and I miss her. Yes, that's it"(MC,P-207). She is also portrays as a caring wife. Though she is a girl with a Hindu background, she never hesitates to accept Saleem as her husband who belongs to a Muslim community. Jannatul Farhana says, "Padma is the representation of regeneration as she is a completely healthy woman where Saleem represents infertility-impotency. From this point of view Padma is more qualified than Saleem and she, perhaps, also becomes the cause of Saleem's inferiority complex" (P-32).

This is one of the striking features of the novel in which Rushdie deals with one of the greatest political figure of the country namely Mrs. Indira Gandhi, former prime minister of India. Mr. khomdram Shyamsundara

Singh interprets, " She is projected as the mother of the Emergency and is repeatedly referred to as Widow, with capital 'W', and it is nothing but an appellation signifying inhuman qualities, like cruelty, harshness, and to crown it all, an uncontrolled power over the household, due to the drying up of emotions"(Modern Research Studies, P-58). The sufferings and self-sacrifice of the Indian widows, especially the high-caste Hindu widows portray in a way that they are supposed to born for selfless service for others. But the character of Indira Gandhi as a widow appears almost monstrous to Saleem. At one point Saleem says,

> "Women have made me; and also unmade. From Reverend Mother to the Widow, and even beyond, I have been at the mercy of the so-called (erroneously, in my opinion!) gentler sex. It is, perhaps, a matter of connection: is not Mother India, Bharat-Mata, commonly thought of as female? And, as you know, there's no escape from her."(MC, P-565)

Conclusion

The women characters, both the major and minor, plays an important role that brings a novelty in the novel, Midnight's Children, in post-independent India. Many of them have qualities which merits respects and admiration. They are projected as equal to men.

Indian woman has passed through many upheavals of Indian history. From the Vedic period to the modern period she has been a helping hand to man. The role of Indian woman in the Midnight's Children is stronger and more grounded than the traditional Indian woman. Woman also seems to be the backbone of the family, and to a certain extent, they have the power. However, Rushdie portrays female characters and their power sometimes in form of mentioned love and sometimes in form of monstrosity. He has criticised the castes and male superiority in different walks of Indian life and presents the struggle of women in a patriarchal society. His description of Indira Gandhi shows a strong woman in modern India. The

use of legends and imagery in the novel are also important. Thus the novel provides so many example of gender related power struggle.

Throughout the novel it is seen that how women characters struggles for their identity, they fights against imperialism, colonialism as well as patriarchy. They do not want to remain in the typical ideology, a stereotype belief. They want to be modern. So, on the whole, it is proved that, in the novel Midnight's Children Rushdie's portrayal of women characters and their struggle against traditional gender role impressed many readers.

Works Cited

- Nicole Weickgenannt Thiara. "Salman Rushdie and Indian Historiography". 2009; Palgrave Macmillan.
- D.C.R.A. Goonetilleke. "Salman Rushdie". 1998; Macmillan Pressed LTD, Houndmils, Basingtoke, Hampshire RG21 6XS and London company
- Harold Bloom. "Salman Rushdie". 2003; Chelsea House Publishers, A Haights Cross Communication and Company.
- Andrew Teverson. "Salman Rushdie". 2007; Manchester University Press, Manchester and New York.
- Salman Rushdie. Midnight's Children. 1995; Vintage Books, London.
- Timothy Brennan. "Sakman Rushdie and Third World". 1989;Palgrave Macmillan.
- Nicole Weickgenannt. "The Nation's Monstrous Woman: Wives, Widows and Witches in Salman Rushdie's Midnight's Children". The Journal of Commonwealth Literature. http://jcl.sagepub.com/content/43/2/65.
- Rajesh S. Nitanware and Dr. Ulka S. Wadekar . "Plight of Padma in Midnight's Children". Pune Research: An International Journal in English. www.pumeresearch.com/english.
- Khomdram Shyamsundara Singh. "Misogynist Undertones in Salman Rushdie's Midnight's Children". An International Journal of Humanities and Social Science. www.modernresearch.in.

Sport and Globalization

Soma Rani Karan

Globalization refers to the growing network of interdependencies , political, economic, cultural and social which bind human beings together. It has shaped the world sport in five-fold ways. The first point to consider is the people's involvement. Globalization has increased the number of spectators of sport. Secondly the technological movement between countries in the field of machinery for the production of sport equipments by corporations and government agencies has contributed to the emergence of global economy entering on sport. Thirdly the repaid flow of money around the world through e-commerce and e-banking leads to a multi-million dollar business in the world of sport. Fourthly, the popularity of sport is getting increased by electronic media like Internet. It allows the spectators to access the latest of competition at every moment. Last comes the ideological dimension. Sport is presently a part of transnational culture. In many ways globalization is beneficial for sport. It spreads the importance sport throughout the world.

The relationship between sport and globalisation encompasses the economic, political and ideological fields. Modern sport originated in the mid nineteenth century in Great Britain and the United states along with American University football mixed with the revival of the Olympic Games have been increasingly globalized through the economic , political and

ideological channels. Sport has an element of competition; its popularity depends on the spectators and the winners' performance in the competition. With the advent of electronic and satellite media the popularity of sport is getting increased day by day crossing the national boundaries. Herein lies the element of globalization. We may discuss the relation through some perspectives.

The Meaning of Globalization

Globalization is a worldwide movement-a restructuring of economic, political and ideological levels in a broader outlook. The concept refers to the growing network of interdependencies political, economic, cultural and social , which bind human beings together. The economic level is characterized by an acceleration of global production process with the presence of a new international division of labour and international marketing strategies. Capital accumulation with a greater profit motive results in disparities of income worldwide. These changes have been getting accelerated with the help of internet. On the political level the governments have abolished Keynesian policies and adopted neo-liberalism which subordinates the national sovereignty to the international treaties such as GATT, and the organization like IMF and the world Bank. The Transnational Corporations and Transnational Banks have been increasingly more powerful than national economies. On the ideological level this neo-liberalism has contributed to free –market dominance throughout the world.

Sport and Globalization

The globalization has shaped the world sport in five-fold ways. The first point to consider regarding the relationship between sport and globalization is the scope of people's involvement. Here people imply to tourists, migrants, exiles and guest workers and the distant spectators. Migration of elite talents, sport scientists, coaches and administrators is a decisive feature in different societies. People across the globe regularly view satellite

broadcasts of English League and European Championship League match. The FIFA World Cup is the most popular sport in the world with an average viewership of 3.5 Billion people worldwide. Innumerable people go to sponsored countries to watch the sports physically. They use hotels, lodges and do maximum shopping. The consumption of Oakland Raiders jackets and Jose Sharks jerseys and Nike Air Jordan's shoes and garments are being worn by young people all over the world. One may argue that these international changes in sport are an example of Americanization rather than Globalization. Because American cultural forms and products are getting imposed on other cultures at the expense and form of domestic culture. This American cultural hegemony mat not be viewed as a dark spot on the world's population but an impact of globalization.

Then comes the economical side of globalization. Jean Harvey and Genevieve Rail state that the modern sport has always operated in the global economy. The players use equipments-boots, ball and uniforms that are designed in the West, financed by multinational corporations such as Adidas and Nike and hand-stitched in Asia using child-labour. These equipments are sold at significant profit to the global market. Sport is increasingly important to the globalization process as a means to promote commodity consumption. Brian Stoddart reports that in 1933 the four major professional leagues in the United States sold $9 billion worth of franchised goods; while the three major television networks generated $2.2 billion in sports related advertising and the cable networks generated $800 million. Furthermore, when the Japanese J-League football games were put on commercial television that same year, that programming generated $300 million worth of sales for Sony Creative Products and one million new depositors for Fuji Bank. Following this several transnational corporations are involved in the production and consumption. Some of them own the media channels and earn extreme profit through advertising and broadcasting. The flow of finance in global sports arena has come to centre on international trade in recent decades.

Secondly, the technological movement between countries in the field of machinery for the production of sport equipments by corporations and government agencies has contributed to the emergence of global economy centring on the sport. A multitude of transnational or global technological exchanges are continuously restructuring the world of sport. The movement of technology and the manufacture of clothing, footwear and equipment is a world-wide industry that wealthier nations are able to access to a far greater degree than their poorer counterparts.

Thirdly, the economic dimension encompasses the rapid flow of money around the world through e-commerce and e-banking. From the core countries like Great Britain and the United States to the peripheral countries like Saudi Arab and Afghanistan and Pakistan that flow is running giving an impetus to the core countries in the field of decision-making dominance over the others. The semi- peripheral countries like South Korea also involved in this exchange. But the flow of money is unidirectional i.e. from the peripheral and semi-peripheral countries to the core countries. As a result the globalization of sport helps the Western countries keep the sport within their own grip.

Fourthly, the advent of electronic media like the internet is now a significant medium for sport coverage. It allows the fans to access the latest news of competition, view the flow of images through the world. Web1.0, Web 2.0 and the social websites are used for the interaction of the spectators and fans throughout the world. The popularity of the sport is getting increased day by day; on this high-level popularity depend the economic and political development of the sport.

Fifthly, Comes the ideological dimension. The opening and closing ceremonies of the Athens games reflect the cultural values and ideological features before the spectators. At the level of ideology global sports festivals such as the Olympics have come to serve as vehicles for the expression of ideologies that are transnational in character. In this way a

transnational culture and global ideology have been developed and nurtured centring on the sport. Sport is presently a part of this transnational culture or global culture. This leads to a shift from the ethnic to a supranational culture that increases the national esteem of a participating country before the public.

Conclusion

In many ways globalization has been beneficial for sport. First, the spread of sports throughout the world is remarkable. Second, the diversity in athletes 'origins participating in many of the professional leagues around the world,(e.g. the Ladies professional Golf Associassion, the Women's tennis association) is an evidence. Also noteworthy is the increasing number of countries participating in international sport events. In addition, an increasing number of athletes are participating in diverse range of sports often crossing the gender and religious lines and climate barriers. For example, Muslim women are participating in sport such as rugby and football, the participation of Jamaican athletes in bobsleigh at the 1988 Olympic Winter games in Calgary.

Modern sport has become media led and bound up in an interdependency chain. The factors of uneven power relations, satellite broadcasts and profit motive have made sport more commercial. The players are engaged in earning money; the suppliers are engaged in earning income; the media is also trying to earn more during sport through advertising and broadcasting. A global migration of sports personnel has been an important factor in recent decades. Modern sport now has been a receptacle of multi- billion dollar business and the studies of sport give emphasis to the interconnected political, economic and cultural patterns that contour and shape the modern sport. Modern technologies enable people, images, ideas and money to cross the globe with rapidity. Modern people know well that their lives and place of living are part of the globe with a multiplicity of linkages.

But time has not yet come to have an idea that everything is bad or getting worse. Firstly, coaches, sports scientists and technology. Secondly, due to broadcasting developments the performers have the tendencies to show their talents before the globe and represent the nation with pride. The patriotic sentiment grows within them. It reinforces their national esteem. Their national emblems are engrafted on their uniforms and they represent the nation before the global spectators. A rising enthusiasm and spirit works in them in their performance. The emergence of sports-heroes is the natural outcome. Thirdly, the hegemonic control and racial aggression in sport are getting increasingly lesser due to globalization. The peripheral countries have got the chances to show their talents and are globally broadcasted. It enhances their national identification and prestige. The non-core leagues are broadcasted and bound up in a chain of dependency relationship with the core- European countries. They can face the challenges and become successful. The relative decline of Great Britain on the sport field is an instance of that. The identification and development of non- core countries in modern sport is certainly a great achievement.

References

1. Toby Miller,Geoffrey Lawrence, Jim Mckay & David Rowe(2001); Globalization and Sport: playing the world, SAGE publications Ltd.
2. Maguire, J(1999); Global Sport, Identities, Societies, Civilizations, Polity Press, Cambridge.
3. Guttman A(1994); Games and Empires: Modern Sports and Cultural Imperialism, New York, Columbia University Press.
4. Maguire, J(2005), Power and Global Sport: Zones of Prestige, Emulation and Resistance, Routledge, London.

Disaster Management in India: An Insight Look

Dr. Malay Kumar Ghosh

Abstract

India, situated in South Asia, is one of the most disaster-prone countries in the world. Natural disasters like floods, droughts, cyclones etc occur almost every year in different regions. Earthquake also happens at intervals. In addition to these, man-made hazards also occur sometimes such as riot, war, terror attacks, road/train accidents, sinking of boats, epidemic disaster etc. All of these hazards cause huge loss of lives and properties which seriously affect and hinder the overall development of the country. To cope with these casualties, disaster management agencies have been formed in central, state and district levels also. But these are not so successful due to lack of precise plans and sufficient resources. Taking all of these into consideration, this paper deliberately attempts to give emphasis on a more strong, equipped and responsible disaster management system in India which can be more forceful and effective to combat with the disasters.

Key words : Disaster, Hazard, Casualties, Management, Resource.

Introduction

Man, with other living being in the world, is nothing but a mere toy in the hands of whimsical nature and that is why he becomes perplexed and feels helpless when a disaster occurs with all its frightful outcome. But man himself also is not less responsible for these unwanted occurrences. He is

exploiting the nature to the maximum to satisfy his own gradual rising enticement by eradicating forest, excavating deep hollow for maximum lifting up mineral wealth and so on triggering to some disorder in nature. Keeping aside these, to maintain livelihood, man is adopting a series of dishonest and inhuman means like lying, stealing, cheating, hypocrisy, disrespect, negligence, rudeness, torture, even murder for a trifling matter and so on. Thus, it has been a buzzword that being enraged with the haughty attitude of mankind in average, nature also is prepared to take revenge upon mankind in the shape of bringing dreadful calamities resulting colossal loss of lives and properties. But truly speaking, though it seems to be emotional, there lies a scientific background also especially when we see the maximum exploitation of nature, deforestation etc which are undoubtedly the causes of confused situation of nature to some extent. Then, these are not the only reasons for occurrence of the disasters. A unique geo-climatic condition has made India especially vulnerable to natural disasters like recurrent floods, droughts, cyclones, earthquakes, landslides and so on. Different natural disasters occur in different region of India because of vastness of the country and accordingly, the peninsular region of South India is mostly affected by cyclones during rainy season, while during summer season, states of West India confront with severe drought.

Objectives of the Study

1. To have idea of various terms relating to disaster management.
2. To highlight some of the major natural disasters/hazards occurred in India.
3. To mention disaster management scenario in India.
4. To identify the hindrances against disaster management in India.
5. To offer some suggestions for proper implementation of disaster management.

Research Methodology

This study is descriptive as well as conceptual in nature and is mainly based on secondary data available in various journals, articles and web resources.

Concept of Some Related Terms

Disaster : Disaster is a sudden, serious disruption and calamitous event disturbing vigorously the normal pattern of life and ecosystem of a community and society which causes colossal loss of human, livestock, wild lives as well as loss or damage of private and public properties that is beyond the abilities of the sufferers to combat with using their own materials. Such catastrophic condition comes from the occurrences like earthquake, flood, drought, cyclone, volcanic eruption, epidemic diseases and so on.

Hazard : Hazard is a warning of danger to people, structures, public and private properties etc created by a phenomena which may also cause a disaster.

Risk : Risk is a function of measuring the supposed losses due to a hazardous happening in a definite area. The following factors are to be considered to determine the level of risk:

i) Nature of the hazard

ii) Vulnerability of the elements which are affected

iii) Economic value of these elements.

Vulnerability : Vulnerability may be determined as the scope or size of a loss, damage or disruption of a community, structure, geographic area etc regarding their nature, construction and vicinity to a hazardous terrain or a disaster-prone area, caused by the effect of a particular hazard.

The amount of damage, disruption and loss may be different in different happenings according to their greatness or size.

Disaster Risk = Hazard + Vulnerability (Shah, A.J. 2011).

Disaster Management : Disaster management can be explained as the organisation and management of resources and responsibilities with a view to mitigate the effect of calamities caused by a disaster with the help of necessary emergencies, particularly preparedness, response and recovery (https://www.google.com). It is a continuous process of minimizing the effect of the hazards which needs to be accomplished by collective and coordinative efforts. A lot of emergencies are to be taken in the event of a disaster such as co-ordination, paramedical teams, drinking water, foods materials, temporary shelters and so on.

Types of Disasters

Disasters may be segregated into two main categories- Natural Disaster and Man-made or Human-instigated Disaster. These two main divisions again may be grouped into major and minor.

Natural Disaster : These calamitous events occur due to some sudden disorderliness in regular disciplined routine of nature. Some of the major disasters are earthquake, volcanic eruption, tsunami, hurricane, cyclone, flood, drought etc and some of the minor natural disasters are cold wave, heat wave, storm, landslide, thunder storm etc.

Man-made or Human-instigated Disaster : These hazardous events happen because of carelessness, lack of forbearance, lack of foresight etc of the people. Some of the major man-made disasters are fires, deforestation, chemical pollution, wars, riots, epidemic diseases, nuclear explosion, terrorist attack etc and some of the minor human-instigated disasters are road/train accident, food poison, environmental pollution, industrial disaster/crisis etc.

All of the above disasters may also be shown in the following way:

- Geophysical (e.g. Earthquake, Landslide, Tsunamis, and Volcanic Activity)
- Hydrological (e.g. Avalanches and Floods)

- Climatological (e.g. Extreme Temperatures , Droughts and Wildfires)
- Meteorological (e.g. Cyclones and Storms/ Wave Surges)
- Biological (e.g. Disease Epidemics and Insect/Animal Plagues)

(https://www.google.com)

Major Natural Disasters in India

India has been counted as one of the most disaster prone countries in the world where overall 85% of Indian land and 50 million people are affected. According to the statistics, drought-prone area of India's land is 68%, earthquake-prone 60%, flood prone 12% and cyclone-prone 8% (https://www.google.com).The arid, semi-arid and sub-humid areas of the country are the most drought-prone areas. The Himalayan & Sub-Himalayan regions and Andaman & Nicobar Islands are the most vulnerable to earthquake. The Ganga-Brahmaputra-Meghna basin carrying 60% of total river flow of the country is the main reason of flood. The Easter Coastline hit by 80% of total cyclones in the region is the most vulnerable to cyclones (Sharma, Vinod.K. 2011)

India has confronted with various devastating disasters during 2001-2019 which are listed below:

Name of the Event	**Affected Area**	**Year**
Cyclone 'Fani'	Orissa, Andhra Pradesh	2019
Cyclone 'Titli'	Orissa, Andhra Pradesh	2018
Cyclone 'Gaja'	Tamil Nadu, Kerala, Coastal Puduchery	2018
Cyclone' Phethai'	Bay of Bengal	2018
Cyclone 'Ockhi'	Tamil Nadu, Kerala, Gujarat	2017
Uttarakhand Earthquake	Uttarakhand	2017
Tripura Earthquake	Tripura	2017

Cyclone 'Vardha'	Chennai (Tamil Nadu), Andaman & Nicobar Islands	2016
Cyclone 'Kyant'	Orissa	2016
Imphal Earthquake	Manipur	2016
India/ Nepal Earthquake	Some parts of India	2015
Floods	J & K	2014
Cyclone 'Hud Hud'	Andhra Pradesh, Orissa	2014
Cyclone 'Nilofar'	Gujarat	2014
Orissa Floods	Orissa	2013
Cyclone 'Phailin'	Orissa, Andhra Pradesh	2013
Floods and Landslides	Uttarakhand & Himachal Pradesh	2013
Cyclone 'Mahasen'	Tamil Nadu	2013
Cyclone 'Helen'	Andhra Pradesh	2013
Cyclone 'Madi'	Tamil Nadu	2013
Cyclone 'Lehar'	Andhra Pradesh	2013
Cyclone ' Nilam'	Tamil Nadu	2012
Uttarakhand Floods	Uttarkashi, Uttarakhand & Baageshwar	2012
Assam Floods	Assam	2012
Cyclone 'Thane'	Tamil Nadu	2011
Sikkim Earthquake	Sikkim, West Bengal & Bihar	2011
Cloudburst	Leh & Ladakh	2010
Drought	More than 10 States	2009
Kosi Floods	North Bihar	2008
Maharashtra Floods	Maharashtra	2005
Kashmir Earthquake	J & K	2005

Tsunami (Indian Ocean Earthquake)	Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Pondicherry, Andaman & Nicobar Islands	2004
Bhuj Earthquake	Gujarat	2001

(Sources: https://www.goole.com; https://www.walkthroughindia.com)

Disaster Management Agencies in India

As per the Disaster Management Act, 2005, a number of agencies are formed in central, state as well as district level to mitigate the effect of disasters. Some of these are listed below:

- Notational Disaster Response Force (NDRF)
- National Disaster Management Authority (NDMA)
- National Institute of Disaster Management (NIDM)
- National Remote Sensing Centre (NRSC)
- Central Water Commission (CWC)
- International Strategy for Disaster Reduction
- Indian Council of Medical Research (ICMR)
- State Disaster Management Authority (SDMA)
- District Disaster Management Authority (DDMA) etc.

Disaster Management Plan in India

A plan for disaster management comprises the following contents.

- Institutional and policy framework
- Early warning system
- Disaster prevention and mitigation
- Preparedness

Study Centre for Disaster Management in India

Recently some educational institutes like Anna University, Roorkee University, Indira Ganghi National Open University (IGNOU), Jamia Millia Islamia and Indian Institute of Public Administration are offering courses relating to disaster management (Sharma, Vinod.K. 2011).

Budget Allocation for Disaster Management in India

In the Union Budget 2019-20, an amount of Rs. 119025 crore, which is Rs. 5858 crore more than the last fiscal, has been allocated by the Ministry of Home Affairs, Govt. of India with special attention on disaster management, cyber crime infrastructure and freedom fighters' pension. For Indian Cyber Crime Coordination Centre, an amount of Rs. 100 crore has been allocated. Further Rs. 577.93 crore have been earmarked for disaster management which is 293.11 crore more compared to last year. Out of this fund, Rs. 296.19 crore has been allocated for National Cyclone Risk Mitigation which is a huge jump from Rs. 3.03 crore in last year (https://www.google.com).

Problems of Disaster Management in India

The Government of India as well as state governments of different states have installed some agencies to cope with the disasters. But we could not reach the goal i.e. we could not achieve expectable progress regarding management of disasters due to some problems which are as follows:

1. Lack of awareness of the people in general, particularly, people of the affected area.
2. Lack of co-ordination between the central, state & district level agencies.
3. Shortage of co-operation of the society with disaster management agencies regarding making efforts.
4. Scarcity of preparedness and rescue operations with sufficient resources and equipments from all concerns.
5. Lack of foresight and endurance in case of some human-instigated mishaps.

6. Unconsciousness or less consciousness of the industrialists about the bylaws of environment triggering exploitations of the nature recklessly only for the interest of their own.
7. Illiteracy, ignorance and poverty of a notable portion of Indian people.
8. Deforestation, causing global warming and pollution.
9. Less use of modern technology for prior information of disaster.
10. Lack of related studies on disaster management.

Findings of the Study

1. Among the most disaster-prone countries in the world, India is one of them.
2. During 2001-2019, cyclones hit India more than earthquake, flood etc.
3. A number of agencies are functioning to mitigate the effects of disasters in central, state and district levels.
4. Some institutions are offering courses related to disaster management in recent times.
5. Allotment of fund in the Union Budget 2019-20 for disaster management has been increased from the last Union Budget.
6. Disaster management in India confronts with enormous problems.

Suggestions

1. To organise public awareness programmes at intervals by all agencies, society as well as the local bodies.
2. To establish strong co-ordination among the agencies for smooth running of the concerned activities.
3. To have co-operation from the society along with full strength and energy towards the agencies in making efforts to cope with the hazards.
4. To take more initiative for offering courses relating to disaster management in the regular syllabus in educational institutions.

5. To arrange mutual understanding between impatient conflicting parties to avoid riots, wars etc.
6. To instigate industries not to exploit nature unlimitedly and thoughtlessly.
7. To take initiative from the government side to remove illiteracy and poverty of the people.
8. To incite the public not to sever trees rather to organise programmes for new forestation.
9. To utilise the latest technology in predicting disaster, seismic studies, meteorological studies, flood warming networks, satellite warming systems etc.
10. To make emergent arrangements like moving people/property to safe place, food, shelters, medicines etc.

Conclusion

Natural disasters cannot be avoided. These can only be mitigated i.e. hazardous impacts of the disasters like sufferings of human, plant and animals while man-made disaster can be prevented to a certain limit. Though, various agencies are functioning to a great extent in reducing the impacts of hazardous events, they should be more equipped with the latest technologies so that the colossal damages can be minimized. We also in our turn as public should be watchful, vigilant and prepared enough to survive from the current and the forthcoming disasters as we know that we cannot rule the nature, we can only lessen the damages and sufferings.

References

1. Dheri, S.K. (2011), "Managing Disaster in Urban Areas", Disaster Mitigation: Experiences and Reflections, ISBN:978-81-203-1914-1, pp.31-38, PHI Learning Private Limited, New Delhi.110001.

2. Patil, Pramod (2012), "Disaster Management in India", Indian Streams Research Journal, Vol 2, Issue 1/Feb; 12 pp.1-4.
3. Rangachari, R. (2011), "Disaster Preparedness and Mitigation in Flood Management: Cooperation and Networking among Countries", Disaster Mitigation: Experiences and Reflections, ISBN: 978-81-203-1914-1, pp.55-66, PHI Learning Private Limited, New Delhi.110001.
4. Shah, A.J. (2011), "An overview of disaster management in India", WIT Transactions on the Built Environment, Vol. 119, ISSN (Online): 1743-3509, pp.73-83, WIT Press. Available on https://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/.../DMAN11008FU1.pdf
5. Sharma, Vinod K. (2011), "Managing Disaster in the New Millennium", Disaster Mitigation: Experiences and Reflections, ISBN: 978-81-203-1914-1, pp.15-21, PHI Learning Private Limited, New Delhi.110001.
6. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.physio-pedia.com/Disaster Management&ved=2ahUKEwiL9MfZ3
7. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disaster
8. https://www.worldfocus.in/magazine/disaster-management-in-india/&ved=2ahWKEW
9. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Special:Mobile Menu
10. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&ret=j&url=https://www.gktoday.in/gk/disaster-management-agencies.
11. https://www.google.com/url?sa=t&sourced=web&rct=j&url=https://www.thehindu.com/business/budget/budget-2019-20-big-boost
12. https://www.indiacelebrating.com/essay/disaster-management-in-india-essay/
13. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https:/m.dailyhunt.in/news/india/english/news24%2Benglish-epaper
14. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mapsofindia.com/maps/india/cyclone-prone-areas.html&ved=2ahUKEw15.https://www.walkthroughindia.com/walkthroughs/top-15-most-devastating-earthquakes-in-india/

16. https:www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://en.m.wikipedia.org/wiki/2016_Imphal_earthquake&ved=2ahUKEwjlisbumP
17. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.worldvision.org/disaster-relief-news-stories/2015-nepal 18.https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://mobile.abc.net.an/news/2014-12-24/boxing 19.https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://en.m.wikipedia.org/wiki/2001_Gujarat_earthquake&ved=2ahUKEwizyKczn 20.https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.indiatvnews.com/amp/fyi/news-all-you-need-to-know-about-cyclones 21.https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cyclone_Gaja&ved=2ah.UKEwjRjva8iP
22. https://en.wikipedia.org>wiki>Disaster_management_Act_2005

The Prism ISSN 2229-7537 Vol. 11. May, 2019

Patterns Of Government Expenditure On Education In West Bengal

Partha Pratim Roy

Abstract : The present paper examines patterns and growth of government expenditure on education during 1990-91 to 2014-15 in West Bengal. The growth rate of public expenditure on education is estimated with the semi-logarithmic stochastic regression model. Other relevant data and different indices (as developed by U-DISE and AISHE) are used to assess the relative educational performance of West Bengal vis-a-vis All India. The share of developmental expenditure on "Education, Art & Culture" in West Bengal is significantly high of 34.2 per cent as compared to other sectors like Medical (7.8%), Rural employment (11.5%), Housing & urban development (6.5%), Social security and welfare (9.4%), and Road transport (1.2%). The growth rate of public expenditure on education is also significantly 12.3 per cent per year during 1990-91 to 2014-15. General education shares about 98 per cent of total public expenditure on education and the share of technical education on public expenditure is only 1.66 per cent in 2014-15. The increasing cost of education, excessive dependence on private coaching and part-time teachers, poor infrastructure and equipment facilities, low access to computer and internet facilities, poor performance in higher education, and Kolkata-centric educational institutions are identified as the important issues in the education system of West Bengal. In West Bengal, girls' education is increasing significantly in rural areas and there is an indication of convergence in the intensity of educational institutions.

Keywords : Education, Human Capital, Public Expenditure, Returns to Education.

JEL Classifications : H52, I24, I26, E24.

Introduction

Education is an important development priority for the government. The development expenditure of the government on education is a crucial determinant for the expansion of education. Expenditure on education is also considered as investment in human capital. An appropriate decision or proper plan of expenditure creates an opportunity to increase the expected returns to education. Education is considered as the heart of social and economic development. Education plays a stimulating role to accelerate economic growth. Education increases human capital, labour productivity, innovative capacity of the economy. It creates new knowledge, new technology, new products, and new processes that promote economic growth. Education also facilitates diffusion and transmission of new information and knowledge to accelerate economic growth. Knowledge is one of the key dimensions of human development. Investment in education and training promotes economic development through the enhancement of aggregate human capital which increases total productivity and earnings. Human capital is important for economic growth as it increases real earnings per worker and reduces poverty. In India, the average expenditure on education out of total household expenditure is different for different sectors viz. rural and urban households respectively. Education is considered as an important input for economic growth and human development. But duality in such input structure leads to duality in output structure resulting in disparities in wages and earnings, gender disparity, social disparity, inequality, unfavourable inclusion-exclusion, and rural-urban gaps. There is an increasing demand for technical and vocational education as compared to general education after the

globalisation due to the well-paid labour market outcomes of vocational and technical education. In the existing literature of the subject, several attempts have been made to estimate returns to education at a macro level. There is no study to analyse patterns and growth of public expenditure on education in West Bengal during the reforms era. The present study is a modest attempt to fill up the gaps in the existing literature.

Database and Methodology

The study is based on dis-aggregated and aggregated secondary data collected from different sources and the major sources are: (i) Unified District Information System for Education (U-DISE), NIEPA data for school education and All India Survey on Higher Education (AISHE), MHRD, GOI data for higher education to examine performance of West Bengal vis-à-vis India with different indicators in school education and Higher education respectively, (ii) Regarding the analysis of financial resource allocation on different types and levels of education we have resorted to Statistical Abstract (2015), Bureau of Applied Economics and Statistics (BAES), Government of West Bengal. We have also used (iv) NSS Report No. 575, Education in India, and NSS KI (71/25.2): Key Indicators of Social Consumption in India: Education to understand the extent of private expenditure per students at different levels of education, extent of private coaching and access to Computer and Internet facilities in West Bengal vis-a-vis India.

Some of the important indicators to analyse data to infer results of the study are: Intensity of institutes, Literacy rate, Gross enrolment ratio (GER), Gender parity index, Pupil-teacher ratio, Financial Resource allocation (% share) to different types and levels of education, Physical infrastructure & equipment facilities in schools, and Average private expenditure per student by types and levels of education.

We have calculated the annual average compound growth rate of relevant variables by using the semi-logarithmic stochastic regression equation.

Patterns and Growth of Public expenditure on education

The total developmental expenditure of the state of West Bengal on different heads including 'Education, Art, and Culture' is increased from Rs. 34563 million in 1990-91 to Rs. 603125 million in 2014-15 with an impressive average compound growth of 12.7 per cent per year. Table 2 shows the growth and structural distribution of such developmental expenditures of the state of West Bengal on different heads during 1990-91 to 2014-15. It is observed that the percentage share of developmental expenditure of the state on 'Education, Art and Culture' is significantly high compared to the expenditure on other heads but such share is decreased from 39.8 per cent in 1990-91 to 34.2% in 2014-15. The growth rate of public expenditure on education, art and culture in West Bengal is estimated at 12.3% per year during 1990-91 to 2014-15.

Table 1 Growth and Distribution (%) of Developmental Expenditure of the State of West Bengal on Education & other Heads

Heads	**1990-1991**	**2000-2001**	**2010-2011**	**2014-2015**	**Growth Rate(%)**
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	12.7
Education, Art and Culture	39.8	37.5	40.4	34.2	12.3
Agricultural Research and Education	0.4	0.5	0.3	0.2	9.1
Medical	9.3	8.6	8.1	7.8	11.7
Family Planning, Public Health, Sanitation and Water Supply	5.3	6.0	2.8	3.2	8.6
Labour and Employment	0.8	0.5	0.4	0.5	9.6
Rural Employment	6.0	1.3	1.5	11.5	8.6
Special Programme for Rural Development	1.0	0.1	0.8	0.5	13.9

Special Areas Programme	1.7	3.0	2.2	2.4	13.8
Roads and Bridges	2.7	2.9	1.3	1.1	8.3
Road Transport	1.3	1.7	1.5	1.2	11.3
Energy	1.0	1.2	0.8	0.6	13.7
Housing and Urban Development	5.6	6.7	8.8	6.5	15.1
Social Security and Welfare	2.5	3.3	11.8	9.4	22.1
Others	22.7	26.7	19.3	20.8	

Source: Annual Financial Statements of the Government of West Bengal.Note: Annual average compound Growth rate of expenditure during 1990-91 to 2014-15

The growth rate of development expenditure on the social sector and welfare is very significant of 22.1% in West Bengal; the share of this sector also increases from 2.5% in 1990-91 to 9.4% in 2014-15. The share of developmental expenditure on agricultural research and education, medical, family planning, public health, sanitation and water supply, labour and employment decrease during this period. The growth rates of expenditure on infrastructure development like road transport, energy, housing and urban development, rural development, special area programme in West Bengal are found to be significantly high during 1990-91 to 2014-15.

Component-wise analysis of developmental expenditure on 'Education, Art and Culture' reveals that the share of such expenditure on general education is the highest of 98.18 % followed by technical education (1.66%), Art and Culture (0.11%) and Sports and youth services (0.04%) in West Bengal during 2014-15 (Table 2). Further, within general education, the share of public expenditure on secondary education is the highest of 45.95% followed by elementary education (41.25%), higher education (11.43%) in 2014-15 (Table 3). The growth of expenditure on general education is found to be 12.3 per cent per year and the growth of expenditure on elementary education is 13.2% per year in West Bengal during 1990-91

to 2014-15. The annual growth rate of public expenditure on technical education in West Bengal is estimated at a significantly high of 12.8% during 1990-91 to 2014-15.

Table 2 Distribution (%) of Expenditure on Education, Art and Culture in West Bengal

Types of education	**1990-1991**	**2000-2001**	**2010-2011**	**2014-2015**	**Growth**
General Education	96.55	96.57	97.41	98.18	12.3
Technical Education	1.83	1.73	1.96	1.66	12.8
Sports and Youth Services	1.16	1.44	0.53	0.04	2.2
Art and Culture	0.47	0.27	0.10	0.11	4.2
Gross Total (%)	100	100	100	100	
Gross Total (Rs. in Million)	1374.8	1956.9	4564.3	6938.1	12.2

Source: Statistical Abstract, 2015, Govt. of West Bengal.

Table 3 Distribution (%) of Expenditure on General Education by the levels of education in West Bengal

Levels of General Education	**1990-1991**	**2000-2001**	**2010-2011**	**2014-2015**	**Growth**
Elementary Education	36.58	33.54	40.39	41.25	13.2
Secondary Education	47.08	47.20	46.03	45.95	11.9
University and Other					
Higher Education	13.66	15.33	12.10	11.43	11.2
Adult Education	0.56	0.28	0.05	0.09	1.8
Language Development	0.37	0.29	0.26	0.24	11.1
Others	1.76	3.36	1.16	1.04	9.5
Total	100	100	100	100	12.3

Source: Statistical Abstract, 2015, Govt. of West Bengal.

Major Issues in Education System in West Bengal

The increasing cost of education

Private expenditure on education refers to the payments of course fees including tuition fee examination fees and other compulsory payments, purchase of books, stationery and uniforms, expenses on conveyance, private coaching, etc. An analysis of NSS data reveals that average private expenditure per student on education varies greatly by types of education (general, technical and vocational) in West Bengal as well as India (Figure 1). Private expenditure per student in technical education in West Bengal (India) is 8.7 times (9.3 times) higher than that of in general education in 2014; the corresponding figure in 2007-08 was 11 times in West Bengal and 13 times in India. Private expenditure per student in general education is increased at the rate of 25% per year in India and 19% per year in West Bengal during 2007-08 to 2014; the corresponding growth rate of private expenditure on technical education is 12% in West Bengal and 14% in India. Further, private expenditure per student increases with the levels of general education (Figure 2). In West Bengal (India), Post Graduate course is 4.1 times (3.5 times) more costly than the expenditure on primary education. Private expenditure on education also varies significantly across rural-urban areas. The average expenditure per student in primary education is Rs. 8670 in the urban area and Rs. 2159 in a rural area during academic session 2013-14 in West Bengal.

The different components of technical and professional education are medical, engineering, law, management, information technology, vocational courses, and other courses. There are three types of institutions which are government (State and Central), private aided and private unaided. As far as the medical stream is concerned, the expenditure per student pursuing in this stream is lower in West Bengal compared with all India level for all types of institutions whether it is government or private. On the other hand, the expenditure per student on engineering education

is higher in West Bengal compared to all India in each type of institution in 2013-14 (Figure 3). Thus, there is a possibility of outward movements of students from West Bengal to other states for engineering education and inflows of students from other states to West Bengal for medical education.

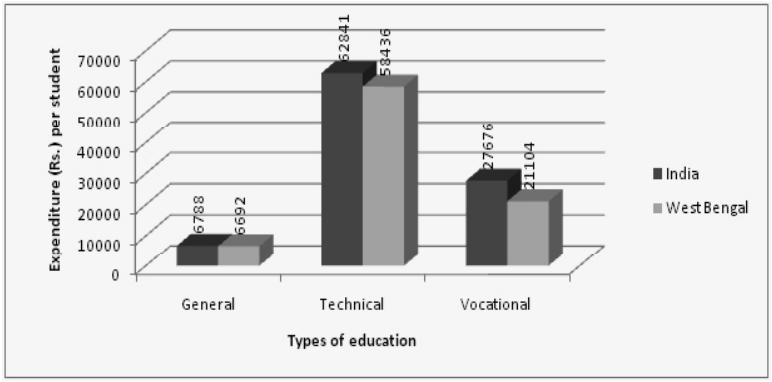

Figure 1 Expenditure (Rs.) per student by types of education in West Bengal vis-à-vis India, 2014

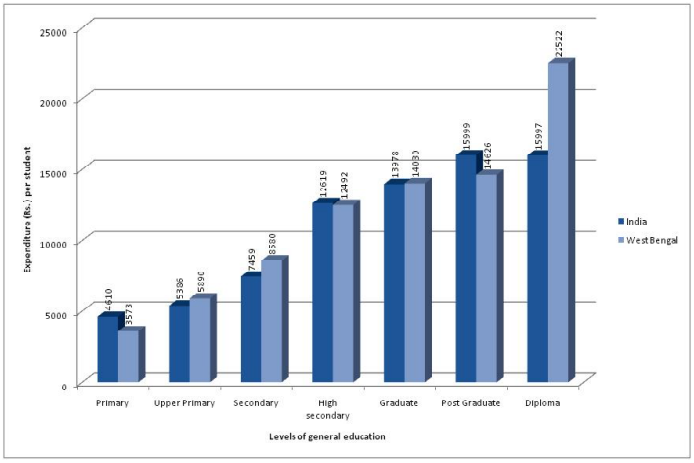

Figure 2 Average Expenditure (in Rs.) per student pursuing general education in West Bengal & India, 2013-14

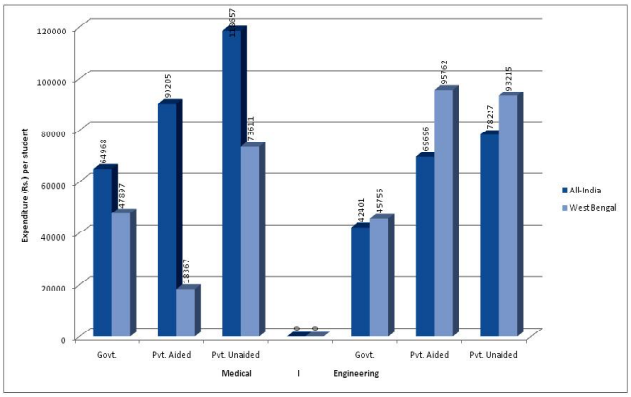

Figure 3 Average Expenditure (in Rs.) per student pursuing Medical and Engineering education in West Bengal & India, 2013-14

Excessive dependence on private coaching

Private coaching is an important issue in the education system of West Bengal. The proportion of students who are taking private coaching in school and higher education is 78.4% in West Bengal and 25.9% in India. In West Bengal, students are taking private coaching even at higher levels of education also (Figure 4). In school education, as the level of education increases the dependence on private coaching is also increases (Figure 5).

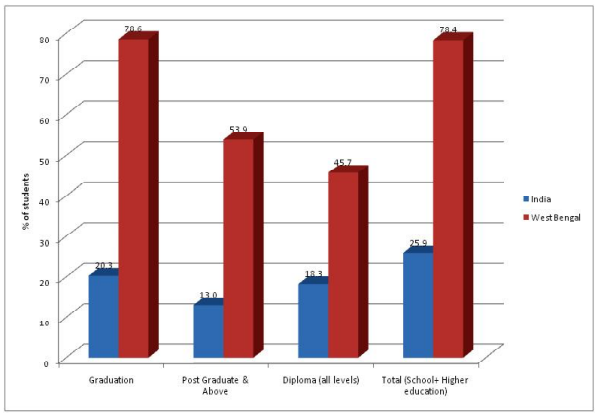

Figure 4 Percentage of students taking private coaching in levels of Higher education

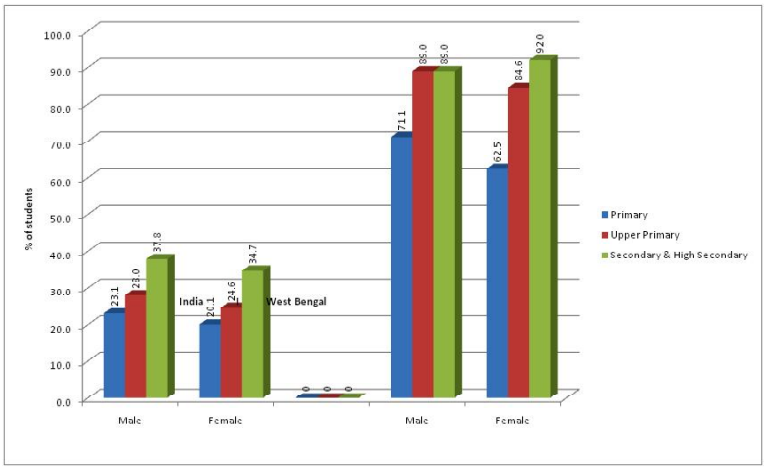

Figure 5 Percentage of students taking private coaching in levels of school education

Poor physical infrastructure facilities

Table 4 depicts school infrastructure (physical facilities and equipment) in West Bengal vis-a-vis India. The performance of West Bengal in respect of the percentage of schools with a separate room for Head Master, schools with playground facilities, library facilities, and computer facilities, etc. is observed to be lower as compared to those of the national average. Only 2.66% of schools have a Librarian in West Bengal. Today, a computer is essential in school education. The percentage of schools with the computer in working conditions is only 6.38 in West Bengal and 14.11 in India.

Table 4 School Infrastructure: physical facilities and equipment in West Bengal vis-a-vis India, 2016-17

Indicators	**West Bengal**	**India**
Percentage of Schools with:	(%)	(%)
school building	99.19	98.32
separate room for Head Master or principal	24.68	55.31
with ramp	58.30	61.31

Toilet facilities	98.42	91.34
playground facilities	40.87	61.98
Electric connection	79.13	60.81
library facilities	77.05	82.96
Librarian	2.66	5.02
Computer in working conditions	6.38	14.11

Source: U-DISE, Flash Statistics, NIEPA, 2016-17

Low access to computer and internet facilities

An analysis of NSS data (71st Round) on education survey reveals that 6.1% of rural households in India possessed a computer and the said figure for West Bengal is only 3.1% in 2014. The proportion of households having access to internet facility is 16.1% in rural India and 8.1% in rural West Bengal. Among the persons of the age group of 14-29 years, only 13.5% can operate the computer in West Bengal as against the national average of 18.3% in rural areas. Appropriate action is to be taken urgently to improve school infrastructure and use of equipment facilities especially to improve the ability to use computer and internet facilities in education West Bengal.

Poor performance in Higher Education

An analysis of the All India Survey on Higher Education (AISHE) data reveals that West Bengal shares 7.7 per cent population in the age group of 18-23 years in India. But the contribution of West Bengal to the number of a higher education institution is 4.8% of Indian universities and 3.4% of colleges. The number of colleges per lakh population (18-23 years) is 12 in West Bengal and 28 in India during 2017-18; it was 9 in West Bengal 25 in India during 2012-13. Pupil-Teacher ratio is 33 in West Bengal and 25 in India during 2017-18. The percentage of part-time teachers in the total

number of teachers is quite high of 18.77% as compared to an All-India average of 7.37% in 2017-18.

Gross Enrolment Ratio (GER) in Higher Education in West Bengal is 18.7% in 2017-18 which is lower than that of All India (25.8%). GER in higher education for scheduled castes (SC) and scheduled tribes (ST) in West Bengal is also very low; GER for SC is 13.8% and for ST it is only 9.9%. Male GER is greater than female GER. but it is interesting to note that Gender Parity Index in West Bengal (India) increases from 0.76 (0.88) in 2012-13 to 0.88 (0.97) in 2017-18 with an annual growth rate of 2.14% (1.53%) during 2012-13 to 2017-18. The annual average compound growth rate of female enrolment in Under Graduate course through regular mode (which is the major component of Higher Education) during 2012-13 to 2017-18 is 5.9% in West Bengal and 4.8% in India as compared to growth rate of male enrolment of 0.4% in West Bengal and 2.9% in India. Female enrolment in Ph.D. is increased at the rate of 17.7% per year from 2012-13 to 2017-18 in West Bengal.

Regarding Out-turn/Pass-Out in Higher Education in West Bengal it is observed that a total of 385507 students pass- out at various levels of higher education (from certificate course to Ph.D. level) in West Bengal during 2017-18; UG shares 73.11% in total pass-out students followed by PG students (16.84%) and Diploma (8.29%). Job creation for such a huge number of (general) educated persons is not an easy task to the Government.

Kolkata-centric intensity of schools

School education comprises of different levels of education: Primary, Junior high, High and Higher Secondary. The total number of schools in West Bengal is 64970 (excluding SSKs/MSKs and Private Schools) in 2014-15. The number of schools varies across districts. The average number of schools per sq. km in West Bengal is increased from 0.71 in 2011-12 to 0.73 in 2014-15. The number of schools per sq km is a maximum of 11.37 in

Kolkata followed by Howrah (1.88), Hooghly (1.24), North 24 Parganas (1.18), Purba Medinipur (0.90), and Nadia (0.85) in 2014-15. The growth rate of the number of schools in West Bengal is estimated at 3.3 per cent during 2011-12 to 2014-15. The backward districts like Purulia, West Medinipur, Koch Behar, Dakshin Dinajpur, Malda, and Murshidabad remain above the state average growth rate of the number of schools. The correlation coefficient between the number of schools per sq. km of the geographical area of the district in 2011-12 and the growth rate of the number of schools during 2011-12 to 2014-15 is significant of -0.57 which implies that there is a palpable indication of convergence in the intensity of school education in West Bengal.

Conclusions and policy prescriptions

Education is an important development priority for the government. The impact of education on earnings is positive and real wage income is increasing significantly. The rate of returns to education on earnings is increasing with an increase in levels of education. On average, the rate of returns to education is estimated at 6.2 per cent per year. The share of public expenditure on education in West Bengal is significantly high compared to other sectors. There is an impressive growth of public expenditure on education (12.3 per cent per year) but the share of developmental expenditure on education is declined from about 40 per cent in 1990-91 to 34 per cent in 2014-15 in West Bengal. General education dominates the system of education. General education shares 98.18% of public expenditure on education and the share of such expenditure on technical education is only 1.66% in 2014-15 in West Bengal. The study identifies some major issues in the education system of West Bengal such as increasing cost of education, excessive dependence on private coaching and part-time teachers, poor infrastructure and equipment facilities, low access to computer and internet facilities, poor performance in higher education and Kolkata-centric educational institutions. Positive aspects

are the female participation in education is increasing significantly in rural areas in West Bengal and there is an indication of convergence in education across districts in West Bengal.

Policy prescriptions

1. There is an urgent need for reforms in the education system in West Bengal toward the expansion of quality education and skill development. The development of physical infrastructure and equipment facilities and human resources management should be the priority agenda. Appropriate strategies should be taken to reduce dependence on private coaching.
2. The share of public development expenditure on technical and professional education should be increased. Some Job –oriented professional courses and training courses may be incorporated in general education institutes. Emphasis should also be given on the effective use of existing infrastructure facilities and resources.
3. Special attention should be given on enrolment in higher education among the backward community living in backward districts especially in Jungle Mahal districts.
4. Access to computer and internet facilities should be improved. Emphasis should also be given on reading, writing and speaking English.

References

1. Agrawal, T. Returns to Education in India: Some Evidence. Available from http://www.igidr.ac.in/pdf/publication/WP-2011-017.pdf.
2. Ahuja, A. K. Economics of Education. New Delhi: Authors Press, 2007, 1-64.
3. Becker, G. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. Chicago (3rd ed): The University of Chicago Press, 1993.

4. Bloom, D. E., Canning, D., & Chan, K. Higher Education and Economic Development in Africa, Washington, D.C., World Bank, 2006.
5. Chandrasekhar, S., Rani, P. G., & Sahoo, S. Household Expenditure on Higher Education in India: What do you know & what do recent data have to say? Mumbai: Indira Gandhi Institute of Development Research, 2016.
6. Duraisamy, M & Duraisamy, P. Returns to Scientific and Technical Education in India. Margin, 1993; 7(1), 396-406.
7. Mincer, J. Schooling, Experience and Earnings. New York: National Bureau of Economic Research.1974.
8. Nandi, A. K., & Basu, D. The Contribution of General Education to Economic Inclusion of Weak Citizens. in S. K. Maiti (Ed.), Inclusive Growth: Emerging Scenario in India. Kolkata: Law point Publications; 2012, 115-120.
9. Schultz, T.W. Investment in human capital. American Economic Review. 1961; 51(1), 1-17.
10. Singhari, S., & Madheswaran, S. The Changing Rates of Return to Education in India: Evidence from NSS Data. Bangalore: The Institute for Social and Economic Change; 2016, WP-358.
11. Wooldridge, J. M. Introductory Econometrics: A Modern Approach (5th ed.). SOUTH-WESTERN, CENGAGE Learning, 2013.

Corporate Social Responsibility in India : A Review

Dr. Malay Kumar Ghosh & KoushikTalukdar

Abstract

Present corporate world is much concerned about getting recognition from the people, government and business community. It is a responsibility of business to be accountable to all of its stakeholders and to achieve sustainable development - economically, socially and environmentally. This paper brings together some serious thinking in the field of Corporate Social Responsibility through focusing on contemporary business trends and practices and how companies are focusing on the delicate issues on social responsibility and further how they undulate their role to become a responsible corporate.

Key words : CSR, Stakeholders, Society, Environment, Governance.

Introduction

In ancient time, the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) was in force. The Ancient Greece, the Vedic Philosophy of India gave references relating to the practices and development of CSR. But due to emphasis on civilization and industrialization, wealth accumulation and profit maximization were given more importance resulting negligence of CSR practices. After the world wars, CSR practices have revived (Muniapan,

B., Dass, M. 2008) and reached to the present day scenario with much more significance through various processes. India has enacted CSR Act to follow CSR mandate.

Objectives of the Study

1. To highlight the basic concept of CSR.
2. To study the objectives of CSR.
3. To mention various activities of CSR.
4. To throw light on CSR trend in India.
5. To suggest some measures in this regard.

Methodology of the Study

This study is purely based on secondary data and the data are collected from various sources like journals, articles, web resources etc.

Review of Literature

Heli WANG, Li TONG, Rikki TAKEUCHI Hong and Gerard GEORGE (2016)

The article, entitled "Corporate Social Responsibility: An Overview and New Research Directions", mentions that CSR has variety of options for corporate culture enrichment in mainstream society and local communities. Corporations have already created dedicated organizational units to effectively manage their social duties. There is commensurate growth in super specialized organizations operating at national and global levels also and usually targeting short-term projects or long-term sustained community-level programs.

Sarma, P. V. S. and Jena, L. K. (2006)

The article, entitled "Corporate Social Responsibility: An Indispensable Tool for Corporate Growth and Survival", expresses that corporate profits are the main factors for longer life but they also maintain social needs. The idea that firms have profit with social responsibility is known as Corporate

Social Responsibility. Basically, the idea of CSR on business operations of companies that have direct or indirect effects on business environment can bear responsibility for these effects.

Rath, Debjit and Thomas, Benz (2006)

The article, entitled "Corporate Social Responsibility: An Indian Perspective", states that previously, company was measured only by its financial activities. But now essay communication tools help the stakeholders for more information and more awareness of what is happening around them. Standing view shows an increased pressure from all the stakeholders, be it debtors, creditors or an employee for the company concerned to consider various other matters like social and environmental issues when making business decisions for long-term objective.

Basic Concept of CSR

Now a day, Corporate Social Responsibility (CSR) also known as Corporate Responsibility, Corporate Citizenship, Responsible Business and Corporate Social Opportunity (Saluja, Dr. Rajni. Kapoor, Sangam. 2017), is a far more challenging phenomenon. The World Business Council for Sustainable Development explains CSR as the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large (Muniapan, B., Dass, M. 2008). Specifically, it is a company's commitment to all of its stakeholders as well as environment in all its activities to try and achieve sustainable development: economically, socially and environmentally in all parts. Stakeholders include everyone from shareholders and employees to customers, suppliers, communities and even the government & its regulatory agencies also. CSR emphasizes more on the issues relating to society, environment and sustainability than morality. To satisfy the legislation, CSR obligation goes beyond the statuary obligation of an organization to make a balance between the necessity of stakeholders and that of making profit and

rewarding shareholders sufficiently. Good CSR should not be seen as a burden, it should enable to bring benefits to both business and community. The key is to see it as an investment in a strategic asset, rather than as an expense. To a specific point of view, Corporate Social Responsibility is the character of a company. Its ethics are the measures by which it will be increasingly judged. Corporate Social Responsibility is the sense of compulsion on the part of companies to build certain social criteria and manage the business.

In India, CSR Rule is the outcome of the Companies Act, 2013 and it has become into force on 1st April, 2014. CSR is mandatory U/S 135 of the new Companies Act for companies- public or private or otherwise subject to fulfillment of any one or more of three conditions: a) Net worth of Rs. 500 crore or more b) Annual turnover of Rs. 1000 crore or more and c) Net profit of Rs. 5 crore or more. As per this rule, companies are required to spend on CSR, at least 2% of average net profit of preceding three years. To implement CSR mandates, CSR Committee, comprising at least 3 directors of whom 1 independent director appointed in company's board meeting, must be formed. A report mentioning the composition of CSR Committee, activities and amount of CSR, inability to spend the said amount with reasons must be included in the annual report of the company.

Objectives of Corporate Social Responsibility

From the view point of Company :

- To make employees more obedient and faithful and to create favourable atmosphere to bring long life of the companies.
- To enable the companies to act ethically.
- To provide both short and long run stable stock market.
- To strengthen the Brand Value of the companies through spreading of their goodwill among the public.

- To minimize government's intervention in the activities of the companies.
- To make the companies more lawful
- To have more share in the market.
- To enable the companies interactive with their stakeholders to realize their interest.
- To ensure acceptability and honour of the society for the companies etc.

From the view point of the Stakeholder :

- To upgrade the standard of living of the people.
- To make the society more healthy and wealthy.
- To enable the environment clean and green.
- To ensure a sound ecosystem.
- To promote education, employment, gender equality, sports, old age homes etc.
- To eradicate hunger and poverty.
- To protect weaker section of the society etc.

CSR Activities

CSR activities are listed in Schedule VII of the Companies Act, 2013. Apart from Schedule VII, there are also some other social programmes which are left to the discretion of the company. Schedule VII mentions CSR activities as follows.

Promoting gender equality, women empowerment, hostels for women and orphans, old age homes, day care, environmental sustainability, eradicating hunger and poverty, protection of flora and fauna, contributions to PM relief fund, measures to benefit armed forces veterans, war widows and dependents, promotion of sports and rural development projects (Kumar, Saurabh 2018)

CSR trend in India

Corporate Social Responsibility is mandatory from 2014 in India. Corporate is spending in India that has increased significantly. In 2018, companies spent 47 percent higher as compared to the amount in 2014-15, contributing INR 7,536 CR. (US $1 billion) to CSR initiatives. According to different surveys, the listed companies in India spent INR 10,000 CR (US$1.4 billion) in different activities like elementary education, societal up gradation, managing healthcare and took positive challenges for environment conservation, while the Prime Minister's Relief Fund saw an increase of 139 percent in CSR contribution over last one year. The education sector received the maximum funding (38 percent of the total) followed by hunger, poverty and healthcare up gradation (25 percent), environmental sustainability (12 percent), rural sanitary development (11 percent). Programs such as use of modern technology, sports etc are reducing inequalities in society. If we look at the present amendments to CSR provisions, industry research estimates to improve Corporate Social Responsibility ranging between 97 to 98 percent by FY 2019-20.

Findings of the Study

- In India, from 2014, CSR is compulsory and an upward trend in spending in CSR by corporate is noticed.
- It is recognized that to measure Corporate Social Responsibility is not only difficult but also time taking issue. Basically, transnational corporations don't have huge time to develop methodology to judge the issue. For consequences it lacks transparency.
- At an initial stage of product development, CSR creates numerous problems.
- Different sectors have their own different social problems.
- Whatever the methods used to identify for taking CSR's performance review are not up to the mark.

Suggestions

New idea would come when new policies take place. Now the whole world is thriving for better results than other ones. Some suggestions are offered below in the light of findings of the study.

- Proper measurement of CSR and development of methodology for fruitful judgement of the issue are pivotal.
- Suitable method should be developed and used for reviewing the performance of CSR.
- Problems created by CSR at the initial stage of product development should be properly identified and then eliminated.
- The arbitrary concept should be improved and maintained as an origin based concept for making CSR more effective.
- The government should take right decision for monitoring CSR and its fund allocation procedure.
- CSR Act needs to be amended time to time to meet the need of the hour and also to be simple and easy to understand.
- CSR should be considered as one type of advertisement so that the corporations would get better market response soon as marketing is a back bone of any business organization. (Abraham Lincoln)

Conclusion

Developing country like India confronts with societal as well as environmental problems like illiteracy, poverty, malnutrition, inequality, injustice, pollution etc. The government extends its hands to remove these problems. The corporate governance is further an attempt to protect the interest of shareholders and other stakeholders also. But these endeavours are not sufficient to combat with these issues. As a result, CSR practice, as an ongoing process, has been getting more importance. For sustainable growth and development of the society, environment and as a whole, CSR

policies and projects are undertaken by eligible corporate institutions which will help India to ride on a paramount position in coming days.

References

1. David Grayson Adrian Hodges (2006), "Reference Making Corporate Social Responsibility (CSR) Operable: How Companies Translate Stakeholder Dialogue into Practice" retrieved from Business and Society Review 111:2, p137–163.
2. Heli WANG, Li TONG, Rikki TAKEUCHI Hong and Gerard GEORGE (2016), "Corporate Social Responsibility: An Overview and New Research Directions:" retrieved from https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/amj.2016.5001
3. Kumar Saurabh (2018) "Corporate Responsibility under Corporate Act", CSR laws in India-Provision under the Companies Act, 2013- iPleaders retrieved from https:// blog.ipleaders.in/csr-laws-india/
4. Moon-Kyung Cha1, Youjae Yi1, and Richard P. Bagozzi2 (2015), "Effects of Customer Participation in Corporate Social Responsibility (CSR) Programs on the CSR-Brand Fit and Brand Loyalty" retrieved from https://www.researchgate.net/publication/288683286_Effects_of_Customer_Participation_in_Corporate_Social_Responsibility_CSR_Programs_on_the_CSR Brand_Fit_and_Brand
5. Muniapan, Balakrishnan. Dass, Mohan. (2008), "Corporate Social Responsibility: a philosophical approach from an ancient Indian perspective", Int. J. Indian Culture & Business Management, Vol. 1, No. 4, pp. 408-420.
6. OLEG V. PETRENKO, 1 FEDERICO AIME, 1 * JASON RIDGE, 2 and AARON HILL (2016): "CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OR CEO NARCISSISM? CSR MOTIVATIONS AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE", Strategic Management Journal 37(2),pp 262-279 retrieved from scholar.google.co.in

7. Rath, Debjit and Thomas, Benz (2006), "Corporate Social Responsibility : An Indian Perspective", retrieved from https://mafiadoc.com/corporate-social-opportunity_598ba4941723ddce69c5c3a1.html
8. Saluja, Dr. Rajni. Kapoor, Sangam (2017), "Corporate Social Responsibility-Evolution", International Research Journal Management Sociology & Humanity (IRJMSH), Vol. 8, Issue 11, ISSN-2277-9809 (Online), 2348-9359 (Print), pp. 158-167.
9. Sarma, P. V. S and Jena, L. K (2006) The article entitled "Corporate Social Responsibility : An Indispensable Tool for Corporate Growth and Survival" retrieved from https://www.academia.edu/33385849/CORPORATE_ SOCIAL_ RESPONSIBILITY
10. http://www.conecomm.com/research-blog/2015-cone-communications-ebiquity-global-csr-study
11. https://www.investopedia.com/terms/c/corp-social-responsibility.asp
12. https://www.investopedia.com/ask/answers/041015/why-social-responsibility-important-business.asp
13. http://www.fiinovation.co.in/corporate-social-responsibility/
14. https://www.google.com/search?source=hp&ei= 1g2TXaTgGpr5rQ HUobQAw&q=percentage+of+csr+in+india&oq= Perc+of+csr+in+india &gs_l=psyab.
15. http://archive.gbchealth.org/asset/india-mandates-corporate-social-responsibility-the-2-percent-bill

The notion of Duty: a critical study in the Vyasa Gita

Bapi Mondal

The son of Parasara, the great sage Vyasadeva was the speaker of Vyasa Gita. It is used to say that, Vyasadeva being the speaker of this particular Gita it is known as Vyasa Gita. After knowing the Isvara Gita, Sounaka muni (a sage who is well known for being an active listener of Mahabharata which was narrated by sage Suta.) asked that after born in the world we have a close relation with action, as well as our whole life is full of action. But the question is by which type of action we would be able to get pleasure in this world and by which type of action we would be able to realize the supreme pleasure in the heaven? This Gita is full of advices about karma by Vyasa, it is a list of so many rules entirely for the life of brahmacarya, house holder, and vanaprasthya. In this particular Gita there are so many principles which are considered to be a duty for being a Brahmana and as well as to become a proper house holder in the society. For becoming free from the bondage of the pain of samsara we should be going through the dharma as it has been mentioned in it.

"The dharma is the one and only way through which we can be free from the bondage. And it is the God."[1] Here it must be mentioned that the word 'dharma' is similar with 'duty' not with the concept of 'religion'. According to Vyasadeva if someone can perform all these actions perfectly as he has described in this Gita one can be able to reach to the heaven.

For having a peaceful and good society he described this whole Gita

to Sounaka muni. According to him there are four kinds of Varna in this society these are Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. "Where always Brahmana will be saluted by these all three other castes."[2]

And those, "who are Brahmana never will salute to the others three castes. Not even if, someone from the non - Brahmin who have a good knowledge in scripture and is a well behaved person. Only the Brahmana can bless to all these three"[3] says Vyasa Deva. "Those people (Brahman) who read the Veda every day, will respect to the Yajnapavito (one bundle of cotton which is used by Brahmana), always speak truth and can become angry less, they would be able to realize the brahma."[4]

"The guru of Brahmana is the fire (Agni). And the Brahmana is the guru of these other three (Kshatriya, Vaishya, and Shudra)."[5] And in further conversation for house holder he says, "always the house holder accustomed them self to the three purusartha Dharma, artha, kama."[6] "Having been as a house hold those who can be detached from angry, greed, fear, passion and always can respect to their parents, guru, to a Brahmana, and be involved in Savitrijapa would be able to be free from the pain of samsara."[7]

From the above conversation it is being said that, the conversation between the sage Vyasa and the Sounaka Muni first of all is about the four Varna, and how they will behave to each other in the society. But here one question may be asked, what will be the quality for being a Brahmana? As clearly it has been explained in this Gita that, "those who have the quality of forgiveness, kindness, science, truthfulness, dominating power, and spirituality is called Brahman. And this type of Brahman always will be respected in the society."[8]

But, one question will be raised that what would be the qualities of others three for being a Kshatriya, Vaisya, and Shudra, which is not described in this Gita. The moment we are talking about the duty according to Vyasa Gita, one of the significant question will be raised that, is the duty

of all these four Varna are defined by their quality (sattva, raja, and tama) and action or it is genetic. And from the other side one more relevant question also will be raised that all the duty whatever has said by Vyasa Gita are implementable in the present society?

Regarding these all questions of duty in Vyasa Gita first of all it can be said the word 'duty' inherently related to four Varna which is an important part of the society. But as we know any society is not peaceful if there is a discrimination between the members of society on the basis of Varna. Because, after born a child does not know, to which Varna he is going to belongs and which duty he will have to perform in future. If his duty will be decided only on the basis of his Varna then he will have to perform his duty for his whole life as his father was doing, which creates a genetic distinction in the society. But if this child will be free to choose his duty on the basis of his quality as it present in him then he would be able to perform his duty according to his quality.

Secondly, when the duty is being discussed, automatically the notion of rights also will come. Because "Rights and duties are correlative to each other." [9] Man in the society is a social being as we know and the, "society concedes to its members certain moral rights for the common good. The individual members enjoy the rights which are protected by society. Their right can't be infringed by others. Their rights ought to be respected by others."[10] And regarding the issue of rights in respect of the Vyasa Gita it can be said that, the people won't be considered as a Brahmana, if they do not have the quality to know 'Brahma' which has been mentioned in this particular Gita for being a Brahmana. Apart from this statement it can be argued that, no one is to be considered as a Kshatriya or Vaishya or a Shudra if they don't have their own quality to get their own identity. And the society is very much concern about the rights of each and every person, that is why some time we are called for Judgment if we overcome our rights. So now we can say, our life and our society as well would be

peaceful, if we can perform our duty according to our rights and own quality.

Conclusion : So, it is being stated that the four Varna will be acceptable if it is based on the quality of man but not on the basis of born. For this reason all these prescribed duties whatever has been explained in the Vyasa Gita easily can be implemented in the society. The life and the society of us as well, would be very peaceful when we are free to choose our duty on the basis of our own quality.

References

1. धर्म ही भगवान् देवो गतिः सबेषु जन्तुषु।। Vyasa Gita. 4.40
2. ब्राह्मणः क्षत्रियादौश्च शअरीकामैः सादरं सहा ।। Vyasa Gita. 1.45
3. नाभिवादासु विप्रेन्द्रैः क्षत्रियाद्याः कथस्चन
   ज्ञानकर्मगुपोपेता यद्यपेते वहुश्रुता।। ।। Vyasa Gita 1.45
4. नित्यस्वाध्यायशीलः स्यात्रित्यंयजोपवीतवान्।
   सत्यवादी चितक्रो धोव्रहम शुयायकल्पते ।। Ibid. 4.21
5. गुरुरश्मिद्विजातीनां वर्णनां व्राह्मणोगुरुः ।। Ibid 1.48
6. त्रिवनसिवी सततं देवतानाञ्च पुजनम् ।। Ibid 4.25
7. वीनराना भय क्रोधो लोभमोहविवर्जितः
   सावित्रि जापनिरतः श्राद्धकृन्मुच्यते गृही ।। Ibid. 4.23
8. क्षमादयाचविज्ञनंसत्यञ्चैवदेमः शामः।
   अध्यात्मनिरतज्ञानमए तदब्राह्मणलक्षचाम् ।। Ibid 2.27
9. Sinha Jadunath, A manual of ethics, 2006, p. 38.
10. Ibid.

Bibliography

1. Bilimoria Purushottama, Prabhu Joseph, and Sharma Renuka, Indian Ethics, Delhi: Oxford University press, 2008.
2. Datta Manisha, Thesis paper- Philosophy of action: with special reference to Sartre, Tagore and Vivekananda, Bolpur: Visva–Bharati University, 1999.

3. Ghosal Chttaranjan, Gita sangraha, Kolkata: GranthikPrakashan, 2011.
4. Mackenzie, J S. A manual of ethics, New York: University tutorial Press,1897.
5. Nayak G C, Philosphical Reflections, Delhi: ICPR, 2002.
6. Padhi N.C and Panigrahi S.c, Ethics Indian and Western. Cuttack: Ananya Publications, 2010.
7. S Radhakrishnan, The philosophy of Rabindranath Tagore, London: Macmillan and company Ltd, 1919.
8. Sanyal Jagadiswar, Guide to Ethics, Calcutta: Shribhumi Publishing Company, 1999.
9. Sinha Jadunath, A manual of ethics, Kolkata: New central book agency (p) Ltd., 2006.
10. Sturt Henry, International Journal of Ethics, Vol. 7, No. 3, Chicago: The University of Chicago Press, (Apr.1897).

Homing Activity And Roosting Ecology Of The Bats Pteropus giganteus (Brunnich, 1782) At Purulia And Paschim Medinipur District

Susanta Mallick, Asif Hossain

Abstract : Roosting habit of *Pteropus* is an unique character that found in few Bengal trees like silk Flower tree (*Albizia lebbeck*), *Bambusa arundinacea, Borassus flabellifer Terminalia arjuna, Mangifera indica and tamarindus indica*. They are confined to tropical countries like Bangladesh, Bhutan, India, China, Maldives, Myanmar, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. The main shelters for roosting are of leafy broad branches of trees and craves. Courtship behaviour, crawling, hibernation, rearing young and grooming etc homing activities are possible for Roosting nature of these bats. There are three roosting sites viz., 1. Simla village at Kashipur block, Purulia 2. Joteghanashyam village at Sonakhali block, Paschim Medinipur 3.Perua village at Sabang block in Paschim Medinipur. Roost house is an ambient leafy branches and it not only protects them from temperature, humidity and desiccation but also plays an important role in bat ecology and evolution. Thermoregulation in summer, save guard, hibernation activity and so many homing activities occurred by roost nature of the bats. Roosting strategy help to assemble and colonize the Pteropus family. The God gifted Roost phenomenon are achievable for their adhesive discs of feet and highly improved claws. They are also careful in selecting the roosting trees having suitable canopy configuration

so as to minimise the penetration of direct sunlight, at least to avoid the exposure of the direct sunlight. It is to be mentioned here that during the study years the atmospheric temperature sometimes raised up to 480C.As a result many of them are died beneath the trees. It is over and done with that the bat populations in tropical country are at the verge of extinction perhaps with the gradual rising of atmospheric temperature in spite of suitable roosting site and glowing canopy configuration of trees may be due to the effect of the global warming.

Key Words : congenital mimicry, Roosting habit, courtship behaviour, ecology and evolution, homing activity, save guard, Pteropus family, adhesive discs

Introduction

The Indian Flying Fox (*Pteropus giganteus* – Brunich, 1782) is the species of dwindling population of pteropodidate family. This is mainly Frugivorous, big bat occurs in tropical region of South Asia, from Pakisthan to China and the Maldives' Islands (Nowak, 1999). Ecologically Pteropodidae , old world fruit bats are highly conspicuous and important species as they are one the best and effective pollinator and seed dispersers (Fleming and Estrada1993; Banack1998;Shiltonet al 1991;Godinez-Alvarez et al. 2002;Fujita & Tuttle 1991).They are unique group of mammals that has developed true or sustained flight. My present pioneer work point out on Indian Flying Fox in Paschim Medinipur and Purulia District where rich *P. giganteus* assemblages have been found at selective Bengal Trees. They are strictly vegetarian (Nowak, 1999). Their sensitive olfactory system and sight develop effectively and important to foraging for fruits, nectar and pollen. IUCN Red List of Threatened Species they are classified as Least Concerned (Venkatesan, 2007). *Pteropus* is dark brown black body colour with contrasting yellowish mantle. They are endothermic and heterothermic and their bilateral symmetrical body maintain body

temperature between 33 and 37 C. Human are most potential predator in some regions and may hunt Indian Flying Fox for protein source and medicinal purpose (Marimuthu, 1998). They are also eaten by snakes and raptors (Marimuthu, 1998). They also carried away by mongoose (*Herpestes sp.*) into its burrow (Mallick and Raut, May25, 2009).

Chiroptera order is divided into two suborders, the Megachiroptera and the Microchiroptera (Koopman, 1993). On the other hand Corbet and Hill (1992) mentioned that they have not documented any subspecies of Pteropus giganteus (Brunnich). But Sinha (1999) recognized the specimens of Indian flying foxes as *Pteropus giganteus giganteus* (Brunnich). Smith (1977) talked that megachiroptera is represented by only one kin, the Pteropodidae. The genus *Pteropus* was coined by Brisson, 1762.

These populations are going to Least Concerned (IUCN) due to urbanization, infrastructure development and industrialization.

Study Area

The present study area was undertaken at Simla village (Coorrdination-23.44200N, 86.47020E) (fig-7), under Kashipur Block of Purulia district was selected as site -01 roosting area. *Tamarindus indica* (fig-6) is main dwelling place of bat at Simla. Joteghanashyam ((Roosting site 02, fig- 4) village (Coorrdination-22.51610N, 87.84020E) of Paschim Medinipur district, on the side of Goura- Shamguange village road and about 26km from Kolaghat Railway Station , and 10 km from Ghatal–Panskura road, SH-4. The Fruit Bats are mainly roost in Silk Flower Tree- *Albizia lebbeck* (fig-5), *Terminalia arjuna* and palm tree etc. Perua (Roosting Site -03, fig-3) village (Coorrdination-22.20070N, 87.65070E) of Paschim Medinipur district near Sobong Block was selected as third study area. Here the roosting tree is *T. arjuna* and Bamboo tree. All these three study sites close to vicinity of water body (Dey & Chattopadhyay 2011; Dey et al. 2013) where stands of trees fringe areas beauty (fig- 8).

Fig5: Homing behaviour at *Tamarindus indica*, Simla of Purulia

Fig 6: Homing behaviour at *Albizia lebbeck*, Simla of Purulia

Methodology

Taking my students a regular diurnal survey were systematically performed on a monthly basis during the study period. The survey was going on from 2008. It is completed on September, 2018. By the help of Nikon Aculon A211 12*50 Binocular and DSLR camera, primary data were collected on

the basis of colony size, roost tree and daytime behaviour of Indian Flying Fox. The present study represents homing activities depending on roosting strategy as well as habitat selection, and movement pattern of wild life- *Pteropus giganteus* (brunich, 1782). I also take a step to enrich the research activity, a well being questionnaire surveys were done within the aged villagers.

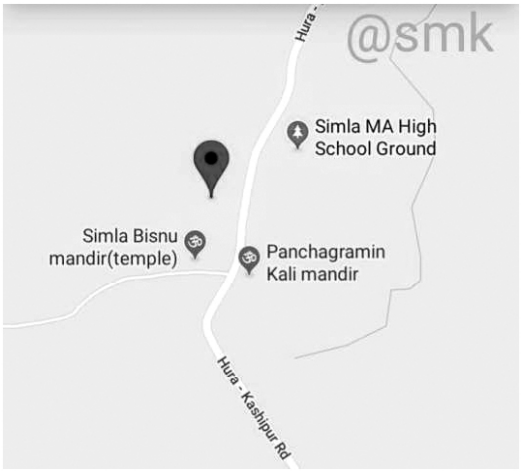

Fig-7 : Location of roost site at Simla of Purulia

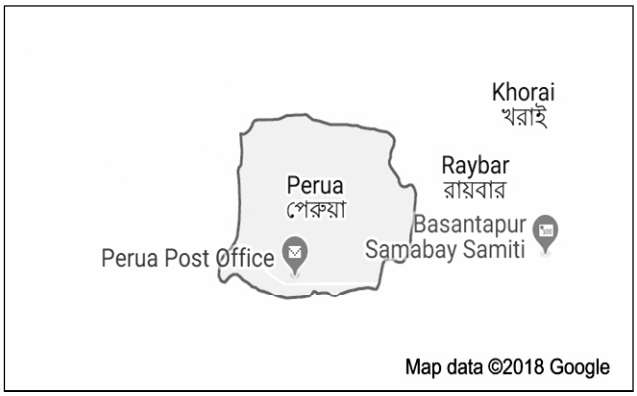

Fig 3- Map of Perua Village

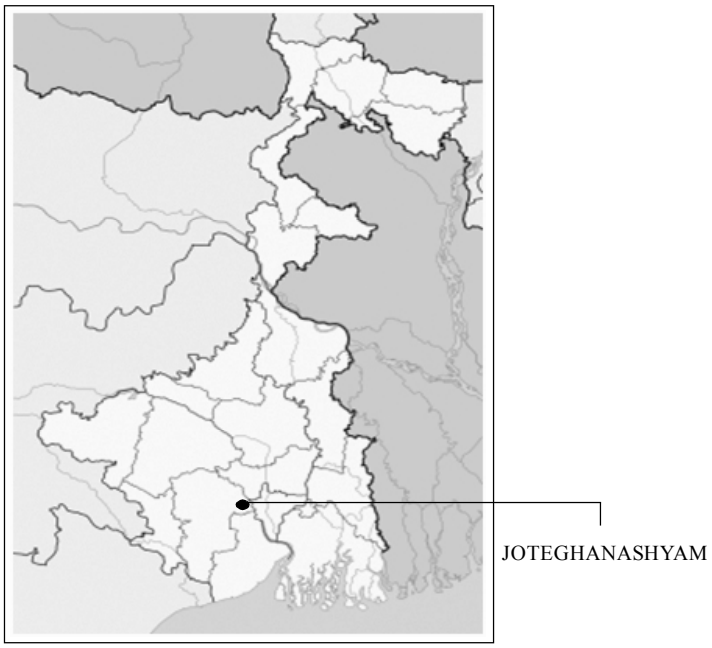

Fig 4- Map of Joteghanashyam village, Location in West Bengal, India Coordinates: 22°312 10.03 N 87°502 19.23 E

Population Counting

The nocturnal dwindling (Mildenstein et al. 2005; Stier & Mildenstein 2005) bat population roost in Bengal trees was counted with naked eyes followed by Direct Sampling Method and Nikon Aculon Binocular from all possible directions. The Indian Flying Foxes, True Flying Mammal were found to camp on 27 trees at Joteghanashyam area. Major individuals were present on *Albizia lebbeck* – a Silk Flower Tree which was inhibited about 800 *P.giganteus* individuals. The Silk Flower Tree was well branching pattern and 42 m tall with a canopy of 12 m diameter. At Perua there are 500 *P.giganteus* are inhibited at *Terminalia arjuna*. And at Simla, 300 individuals are lived in *Tamarindus indica* (fig-1).

Table- 01 Showing Main roost Tree and Inhibiting Bat Population at Three Study Site:

Sl No	Study Area	Main Roost Tree	Inhibiting Bat Population
01	Joteghanashyam	*Albizia lebbeck*	800
02	Perua	*Terminalia arjuna*	500
03	Simla	*Tamarindus indica*	300

Fig -8 : Vicinity of Water body near Simla Roost Site

Roosting habit of *Pteropus* is a congenital mimicry. Roost is consigning where bat lives freely. There are many type of roost are found in pteropodidae family like that maternity roosts ,hibernation roosts ,roosts in tree and roosts in building etc. In the view of my observation, they generally like to select aged tree with wide range of ambient leafy branches for roost. They also prefer holes, crevices of trees and often hanging from ridge of a broad branch. They hang usually from canopy with wrapped

wings around the body of Indian flying fox. Bat are unable to manufacture the nest, for this reason they rely entirely on existing cracks, hollow place of a old broad branches of a tree, crevices for shelter. Depending on climate like temperature and humidity *Pteropus* choice, suitable roosting sites as well as they like safety and lack of prolong disturbance. Immature individuals use several location of a tree for homing activity. During summer, few species gather into groups and take a broad area. As flying mammal, roosting of bat is more important for daylight to express their normal phenomena like crawling, copulation, grooming etc. The signification of roosting has a pivotal role in ecology of Indian flying fox as well as phylogenetic evolution. Roosting house provides hibernation, mating and rearing young to the roosting bat individuals. The whole tree is used as a playground and a place for social interaction among the bat individuals.

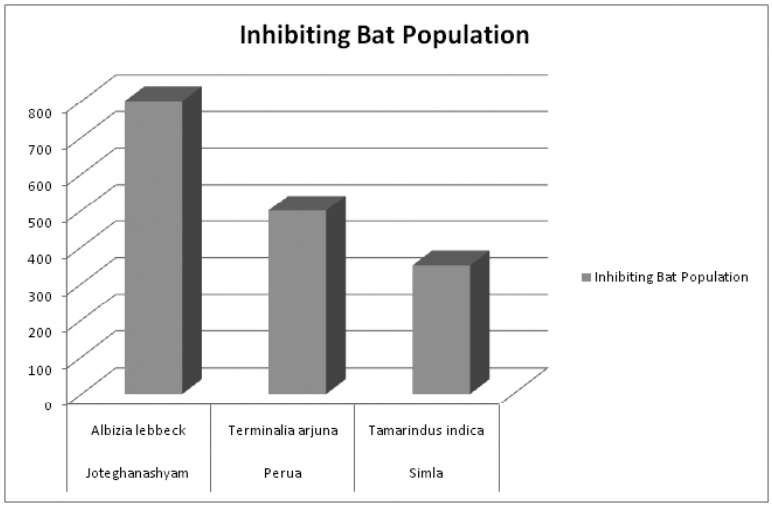

Fig-1 A diagram showing inhibiting *P. giganteus*

Table-02 : Roosting Shelter

Sl. No.	Name of the Roost house		Housing position
	Common Name	**Scientific Name**	
01	Silk Flower tree	*Albizia lebbeck*	Ambient leafy branches, hole, crevices, cracks
02	Arjun tree	*Terminalia arjuna*	Branches, hole, crevices, cracks
03	Tamarind tree	*tamarindus indica*	Ambient leafy branches, hole, crevices, cracks
04	Palm Tree	*Borassus flabellifer*	hole, crevices, cracks
05	Bamboo Tree	*Bambusa arundinacea*	Different Branches
06	Mango Tree	*Mangifera indica*	Ambient leafy branches, hole, crevices, cracks

Roosting place give them protection, thermoregulation, desiccation and predation. This trait is not only a best save guard but also increased the survivility of bat. This feature is also responsible for changing of their morphological behaviour and physiological character etc. For roosting strategy assemble nature and my dear students and I observe colonization phenomena in giganteus family. I and my brothers observed from 2008 to 2018 day roosting behaviour of *Pteropus* at different area in West Bengal in a silk Flower tree, *Terminalia*, tamarind tree etc. We viewed their non-hibernation sleeping mode at that time. Foraging strategy and a long-term relationship are well developed by them day to day during roosting. Roosting is possible for their adaption of adhesive discs of feet and highly

increased claw. This is a good opportunity for wide range of roost. Different shape and size of a tree serves as roost sites for them. Branching leafy pattern of Bengal tree roosts protect them from thermoregulation.

Table-03 : Roosting nature homing position in different site

Sl. No.	Name of the Roosting Trees	Roosting position			
		Leafy branches	Non-leafy branches	hole, crevices, cracks	Palm leaf, hole, crevices
01	*Albizia lebbeck*	45%	35%	20%	-
02	*Terminalia arjuna*	40%	40%	20%	-
03	*Tamarindus indica*	65%	25%	10%	-
04	*Borassus flabellifer*	-	-	-	100%
05	*Bambusa arundinacea*	-	98%	2%	-
06	*Mangifera indica*	35%	35%	30%	-

Statement of the Problem

Roosting Site Destruction

Field interviews indicate that the population of *Pteropus giganteus* is declined due to deforestation. Roosting sites of India are affected for cutting of trees and human interventions (Mistry, 1997).

Anthropogenic Activity

Some anthropogenic activities like hunting, cutting of trees, urbanization and others cruel works affect the bat population.

Urbanization

Now a day's urbanization is a big problem for the existence of such timid nocturnal flying mammals.

Tribal Myth

The tribal people of Simla area belief that the bone of living bat can cure some diseases of baby, but scientifically there is no such evidence.

Atmospheric Hazards

Scorching heat, thunder storm and severe hail extremely affect the bat individuals at study site.

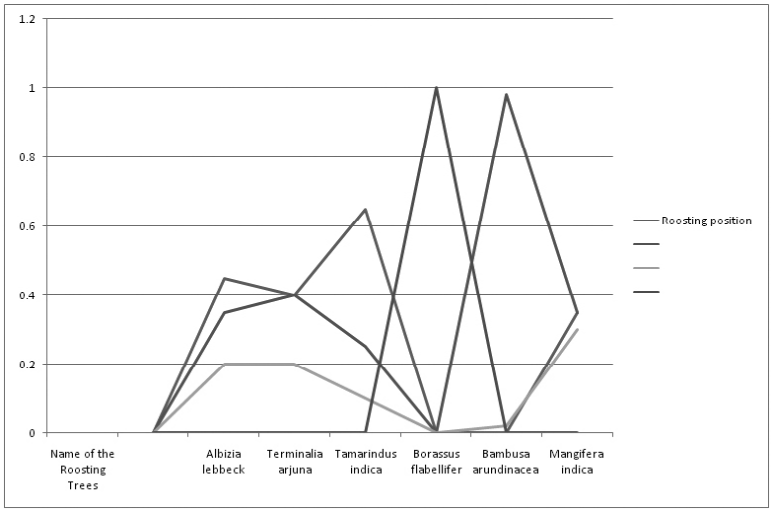

Fig 02- Showing Roosting shelter at different position of camp tree

Significance of The Topic

As *P. giganteus* is a threatened species effective management strategy is essential to conserve this species. Moreover existence of *P. giganteus* is inevitable to maintain floral and faunal diversity of the localities concerned.

The Mishra Brahamon family safe the pteropodidae family as sacred God at Simla spots for a long time, three hundred years. As a result sacred God protect them from the disturbance of cruel human beings (Marimuthu, 1988). And the bat colony will be remained safe.

Acknowledgement

I thank to my brothers who are always help and support me for all time. I greatly grateful to my guide Dr. S.K. Raut, ex-professor of Ballygunge Science college, Depertment of ecology and ethology for his proper guideline and inmenes support. I also greatly grateful to my colleague, Dr. M.K. Das, Department of Education, Mahatma Gandhi College,Lalpur, Purulia . I express thanks to the local villager of Simla, Joteghanashyam and Perua for their unrestricted assist and cooperation.

References Cited

- Bradbury, J.W. 1977. Social organization and communication. In W.A. Wimsatt. Biology of bats,Volume 3. New York, Academic Press.
- Brisson, A.D. (1762). RegnumAnimalein Classes ix distributumsive synopsis methodica. Lugduni Batavorum: ApudTheodorum Haak ,1762. pp. 153- 155.
- Diurnal reproductive behaviour of Indian Flying Fox, *Pteropus giganteus*.
- Fleming, T. H. 1981. Fecundity, Fruiting pattern and seed dispersal in *Piper amalago* (Piperaceae), a bat-dispersed tropical shrub. Oecologia 51: 42 - 46.
- Fujita, M.S. (1988): Flying foxes and economics, Bats 6(1): 4-9.
- Fujita, M.S. and M.D. Tuttle (1991): Flying foxes (Chiroptera Pteropodidae): Threatened animals of key ecological and economic importance. Cons. Biol. 5(4): 455-463.
- Hahn et al. (2014). Roosting behaviour and habitat selection of *P.g.* reveals potential links to Nipah virus epidemiology.J. Appl. Ecol. 2014, 511 (2): 376- 387.

- Halpin K, Hyatt AD, Plowright RK, Epstein JH, Daszak P, Field HE, et al. Emerging viruses: coming in on a wrinkled wing and a prayer. Clinical Infectious Diseases. 2007;44:711–717.
- Hasan, M.K., M.M. Feeros A.K. DATTA, A. Saha, and T. Ahmed (2014) Indian Flying Fox, (*Pteropus giganteus*) roosts in North Bengal of Bangladesh.
- Hollar, L.J., Springer, M.S., 1997. Old World fruitbat phylogeny: evidence for
- Holmes, M., Hutson, A.M., Morris, J.M., 1994. The Maldives Archipelago, Indian
- Hutson, A.M., Mickleburgh, S.P., and Racey, P.A. 2001. Microchiropteran Bats: Global Status Survey and Conservation Action Plan. IUCN/SSC Chiroptera Specialist Group. IUCN, Gland, Switzerland, and Cambridge, UK.
- Iudica.C.A. and F.J.Bonaccorso 2003.Anecdotal observations of sea water ingestion by Flying Foxes of the genus Pteropus (Chiroptera: Pteropodidae). mammalia. 67(3):455-458.

  Iudica.C.A., F.J.Bonaccorso and G. Richard, 1994,Sea water ingestion in *Pteropus hypomelanus*. Bat Research News. 35(4):102(Abstr:).
- Khan, M.A.R.,2001. Status and distribution of bats in Bangladesh with notes on their ecology. Zoos Print Journal,16:479-483
- Konju, N.and Chalise, M.K. (2011). Population Pattern of Flying Fox (*Pteropus giganteus*) in Sallaghari,Bhaltapur,Nepal. Special issue on the occation of 16th Wild life Week, 2068, DNPWC/Govt. of Nepal, 1-5 p.
- Koopman, K.F (1993) Chiroptera. In: Mammalian Species of the World (Eds. Wilson D.E. and Reeder, D.M). 2nd edition. Smithsonian Institution Press,Washington. pp. 137-241.
- Kumar R., Elagovan, V. and Prasad, D.N. (2017). An update on distribution of Indian Flying Fox, *Pteropus giganteus* in Uttar Pradesh, India. Trends in Biosciences 10 37, 7794-7801.
- Luby SP, Gurley ES, Hossain MJ. Transmission of human infection with Nipah virus. Clinical Infectious Diseases. 2009a;49:1743–1748.

- Luby SP, Hossain MJ, Gurley ES, Ahmed BN, Banu S, Khan SU, et al. Recurrent zoonotic transmission of Nipah virus into humans, Bangladesh, 2001-2007. Emerging Infectious Diseases. 2009b;15:1229–1235.
  Ocean: A report on an Investigation of Fruit Bats and Birds, November 1993. TheBat Conservation Trust, UK
- Population pattern of Flying fox (*Pteropus giganteus*) in Sillaghari, Bhaktapur, Nepal—Narayan p.,Koju and Mukesh k. Chalise, Ph.d.
- Racey, P.A. & Entwistle, A.C. 2000. Life history and reproductive strategies of bats. In E.G. Crighton and P.H. Krutzsch, eds. Reproductive biology of bats, pp. 363-414. New York,Academic Press
- Social Behaviors of Captive Fruit Bat Species—Jake Schwartzman & Jamie McNellis

THE PRISM
Vol. 11 May, 2019

Journal of Mahatma Gandhi College
Lalpur, Daldali, Purulia- 723 130
West Bengal, India
Contact : + 91 94342 46198
E-mail : prismmgc@gmail.com

Cover Design : Prof. Rahul Chakrabarti

Publisher : Teachers' Council
Mahatma Gandhi College, Lalpur, Purulia

Printed at : Kabitika, Midnapore. Mob : +91 98321 30048

Price : 250.00 $ 12

THE PRISM
2229- 7537